শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা

নীরদবরণ

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী

১৯৬৪

পকাশক :

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম

পণ্ডিচেরী

প্রথম সংস্করণ : ১৫ই আগষ্ট, ১৯৬৩

দ্বিতীয় সংস্করণ : ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪

মুদ্রক :

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস

পণ্ডিচেরী

ভূমিকা

১৯৩৮ সালের দুর্ঘটনার জন্যে যখন শ্রীঅরবিন্দের নির্জনবাসে বাধা পড়ে, আমাদের কয়েকজনের উপর তাঁর সেবাশুশ্রূষার ভার ন্যস্ত হয়। তখন থেকে তিনি আমাদের সাথে যে সমস্ত কথাবার্তা বলতেন, আমরা কেউ কেউ তার রেকর্ড রাখি। অবশ্য তিনি সে সব রেকর্ড দেখেননি, আমরা কোনদিন ভাবিনি যে সেগুলো ছাপা হবে কোনকালে।

সেসব আলাপের প্রথম ভাগের এগুলো হল বাংলা তর্জমা। শ্রীযুত পুরাণী তাঁর রেকর্ডের কিয়দংশ ইংরাজীতে **Evening Talks** নাম দিয়ে ছাপিয়েছেন বলে আমি বাংলাতেই বের করতে মনস্থ করি। অনেকের অনুরোধের এখন Mother Indiaতে আলাপগুলি ইংরাজীতেও প্রকাশ হচ্ছে, কিন্তু সেটা স্থির হয়েছে বহু পরে। শ্রীঅরবিন্দের কথা হুবহু নোট করা অসম্ভব, তবে সাধ্যমত তার ভাব বজায় রাখতে চেষ্টা করা হয়েছে। যদি কোন ভুল বা দোষ থাকে, তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব লেখকের।

দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রথম দিকের অনেকগুলি আলাপ লিখে রাখিনি। তখন শোনার নেশায় এত মশগুল ছিলাম যে নোট করার কথা মাথায় আসেনি। তাছাড়া কে ভেবেছিল যে এসব দুর্লভ কথা একদিন প্রকাশ হবে? হঠাৎ মনে হল লিখে রাখলে অন্ততঃ নিজের কাজে আসবে। তখন কাজের স্বল্প অবসরে সহকর্মীদের সাহায্যে যথাসম্ভব লিখে রেখেছি।

সাধারণতঃ এই বৈঠকগুলি চলত সন্ধ্যাকালে, এই সময় মাও শ্রীঅরবিন্দের ঘরে আসতেন এবং মাঝে মাঝে যোগ দিতেন, কখনও বা কিছুক্ষণ ধ্যান করে চলে যেতেন। আবার আমাদের কথা চলত।

শ্রীঅরবিন্দের সাথে এরকম মজলিশি আলাপ আমাদের ধারণারও অতীত। আমার বিশ্বাস, তাঁর সেবার প্রতিদানস্বরূপ বন্ধুর মত এই আলাপগুলি তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন। আমরাও পুরোমাত্রায় সে সুযোগ নিয়েছি। তিনি স্বয়ং যেখানে উদ্যোক্তা ও দাতা, তখন আমাদের কি ভয়, কি সঙ্কোচ?

এই বই ছাপাবার প্রধান উদ্দেশ্য হল এই যে এখানে আমরা ঘরোয়া-ভাবে শ্রীঅরবিন্দের বহুমুখী ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাই। আধ্যাত্মিক কি জাগতিক এমন কম বিষয়ই আছে যা আমাদের আলোচনাভুক্ত হয়নি: ধর্ম, সমাজ, জাতি, দেশ, রাজনীতি, সংস্কৃতি, আর্ট, ইতিহাস, বিজ্ঞান, যুদ্ধবিদ্যা, ডাক্তারী—কি নয়? সর্বোপরি রয়েছে তাঁর জীবনের নানা প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত ঘটনাবলী যা রসমণ্ডিত হয়ে সমস্ত বিষয়ের উপর ছড়িয়ে দিয়েছে রামধনুর স্নিগ্ধ আভা।

বক্তাদের নাম: ডাক্তার মণিলাল, ডাক্তার বেচারলাল, পুরাণী, সত্যেন্দ্র, চম্পকলাল, নীরদ, মূলশঙ্কর এবং দু'একজন অতিথি।

*
**

দ্বিতীয় সংস্করণ

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে একবছরের মাঝে প্রথম সংস্করণ শেষ হল। দ্বিতীয় সংস্করণে কিছু নূতন আলাপ যোগ করা হল। আশা করি বাংলাদেশ বইটি সমান আদরে গ্রহণ করবে। পৃথিবীর ও দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে মা ও শ্রীঅরবিন্দই একমাত্র পথ, পাথেয় ও লক্ষ্য।

ইতি

নীরদবরণ



Sri Aurobindo
(*Pondicherry: 1915 - 1919*)

শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা

১০।১২।৩৮

সময় সন্ধ্যা, আন্দাজ ৭টা। শ্রীঅরবিন্দ বিছানায় শুয়ে; তার ডান পায়ে splint বাঁধা। আমরা—মণিলাল, পুরাণী, চম্পকলাল বেচাবলাল, সত্যেন্দ্র, মূলশঙ্কর ও আমি—মাঝে মাঝে দু' একজন আগন্তুক —প্রায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে তাঁর খাটের বামপাশে মেঝের উপর বসে। শ্রীঅরবিন্দের গলার স্বর খুব মৃদু, কাছে না বসলে শোনা মুস্কিল।

ডাক্তার মণিলাল: পণ্ডিচেরীকে আপনার সাধনপীঠ হিসাবে বেছে নিলেন কেন?

শ্রীঅরবিন্দ: এখানে আসবার জন্যে 'আদেশ' পাই ব'লে। বোম্বাই হতে কলকাতা ফিরবার পথে আমি লেলের কাছে সাধনা সম্বন্ধে যখন কিছু উপদেশ চাইলাম, তখন তিনি কিছুক্ষণ নীরব থেকে (বোধ হয় ভিতর থেকে কোন বাণী শুনবার অপেক্ষায় ছিলেন) উত্তর দিলেন, "ঠিক একই সময়ে রোজ ধ্যান করো এবং অন্তর থেকে বাণী শুনতে চেষ্টা করো।"

আমি তাই অভ্যাস করতে লাগলাম, কিন্তু অন্তর থেকে কোন বাণী না শুনে শুনলাম আলাদা বাণী। ধ্যানও ছেড়ে দিলাম, সব সময়ই ধ্যানাবস্থা থাকত বলে। পরে যখন লেলের সাথে দেখা হল, তিনি সব শুনে বললেন, "তোমায় শয়তানে পেয়েছে।" আমি বললাম, "শয়তানই যদি হয়, আমি তাকেই মেনে চলব।"

মণিলাল: লোকে বলে, যৌগিক সাধন বইটা কেশব সেনের আধিভৌতিক সত্তার দ্বারা লেখা। সত্যি?

শ্রীঅরবিন্দ: কেশব সেন? আমি যখন বইটা লিখছিলাম, তখন প্রত্যেকবার লিখবার আরম্ভে ও শেষে রামমোহন রায়ের মূর্তি সামনে দাঁড়াত। বোধ হয় রামমোহন বদ্‌লে কেশব সেন হয়েছে। উত্তর যোগী নামটা কি করে হল জান?

মণিলাল: না, স্যার।

শ্রীঅরবিন্দ: দক্ষিণ দেশে মস্ত এক যোগী ছিলেন। মৃত্যুর সময় তিনি তাঁব শিষ্যদের বলে যান যে উত্তর দেশ হতে দক্ষিণে এক পূর্ণযোগী আসবে। তাকে চেনা যাবে তার তিনটি বাক্যে, যেগুলো আমার স্ত্রীর চিঠিতে আমি উল্লেখ করেছি। সেই যোগীব জমিদার শিষ্য আমায় খুঁজে বের কবে এবং সে-ই যৌগিক সাধন বই প্রকাশের খরচ দেয়।

মণিলাল: যীশুখৃষ্ট নাকি একটু ছুঁয়েই রোগ সারাতেন? এ কি সম্ভব?

শ্রীঅরবিন্দ: কেন নয়? এ রকম দৃষ্টান্ত ত প্রচুর রয়েছে। অবশ্য বিশ্বাস থাকা চাই। খৃষ্ট নিজেই বলেছেন, "তোমার বিশ্বাস তোমায় পূর্ণ করেছে।"

নীরদ: বিশ্বাস থাকতেই হবে?

শ্রীঅরবিন্দ: না, বিশ্বাস ছাড়াও রোগ সারান যায়, বিশেষতঃ রোগীর উপর কি কাজ করা হচেছ সে বিষয়ে যদি রোগী অজ্ঞ থাকে। বিশ্বাস হল মনের উর্ধ্বের জিনিষ। সুতরাং সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা বা তর্ক তার কাজ পণ্ড করে দেয়।

মণিলাল : বিশ্বাসের বলে এরূপ আরোগ্যের বা সাহায্যলাভের কথা আমিও জানি। আমি প্রথম যখন আপনার কাছে আসি, আপনি আমায় বলেছিলেন যে বিপদে আপদে আমি যেন আপনাকে স্মরণ করি। ফিরে গিয়ে আমি তাই করতাম, ফলে নানা বিপদের হাত থেকে উদ্ধার পাই। কিন্তু এখানে এসে যখন সাধকদের মুখে নানা ধরনের কথা শুনলাম, তখন আর সেরকম ফল পেলাম না। ভাবতাম, আমিই বুঝি নিজেকে আপনার কাছে খুলতে পারিনি।

শ্রীঅরবিন্দ : এটা হল সরল বিশ্বাস। কেউ কেউ বলে, 'অন্ধ বিশ্বাস।' যখন রামকৃষ্ণকে বিশ্বাস সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হত, তিনি বলতেন, "সব বিশ্বাসই অন্ধ। নতুবা সেটা বিশ্বাসই নয়।" খাঁটি কথা।

মণিলাল : সন্দেহ আসে কেন? নিজের প্রকৃতির দোষে, না, পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে?

শ্রীঅরবিন্দ : দুইই, দেহগত মনের মধ্যে এই সমস্ত জিনিষ রয়েছে, তারা কোন না কোন সময় উপরে উঠে আসে। অন্যের সংস্পর্শেও বিশ্বাস ইত্যাদি লোপ পায়। একবার একজন সত্যবাদী লোক এখানে এসেছিল; তখন কেউ নাকি তাকে বলে যে সর্বদা সত্য কথা বলা একটা কুসংস্কার মাত্র! যখন যা খুসী তাই বলবার স্বাধীনতা থাকা চাই। এ সমস্ত ধারণা অন্যের ক্ষতি করবেই ত।

মণিলাল : সে সব লোকদের 'গারদে' বেঁধে রাখা যায় না?

শ্রীঅরবিন্দ : আমিও তা ভেবেছিলাম বটে, কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। এককালে মা কিছু বিধিনিষেধ জারি করেছিলেন, বিশেষ ফল হয়নি। ভেতর থেকে বদলানই হল আসল জিনিষ। অন্যান্য যৌগিক

মার্গ আছে বটে, যেখানে কঠোর নিয়ম পালন করতে হয়; বৌদ্ধ শাসন সে হিসাবে অদ্বিতীয়। ফ্রান্সে একটা প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানে কথা বলা একেবারে নিষিদ্ধ।

নীরদ: এরকম বাইরের বাধ্যতা আরোপ কি ভাল?

শ্রীঅরবিন্দ: ভাল হতে পারে যদি তা একনিষ্ঠভাবে মেনে চলা হয়। যেমন, সেই প্রতিষ্ঠানের সাধকেরা তাদের লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন থাকত; কাজেই নিয়মগুলি তাদের সাহায্য করত বলে সেগুলো তারা মেনে চলত।

পৃথিবীটাকে বদলাতে হবে। এখানে যারা আছে, তারা হল পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত প্রতিরূপ (epitome)। প্রত্যেকেই মানবজাতির এক একটি টাইপ বিশেষ। এখন, একটি টাইপ যদি বদলায় তাহলে সেটা হল আমাদের কাজের পক্ষে মস্ত জয়লাভ কিন্তু এই পরিবর্তনের জন্যে চাই নিরন্তর জাগ্রত ইচ্ছাশক্তি। তা থাকলে আধারের জন্যে অনেক কিছু করা যায়।

নীরদ: সাধনায় কি পরে শিথিলতা এসে গেল?

শ্রীঅরবিন্দ: তাই। সাধনা যখন দেহের ও অবচেতনার স্তরে নেমে এল, তখন অবস্থা গুরুতর হল। আমাকেও দু'বছর ধরে আপ্রাণ লড়তে হয়েছে, কারণ অবচেতনা হল একেবারে পাথরের মত জড়বস্তু। যদিও উপরে আমার মন সম্পূর্ণ জাগ্রত ছিল, কিন্তু নীচে সে কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পারত না। কী অসম্ভব হাড়-ভাঙ্গা খাটুনী, Herculean পরিশ্রম। এই রাজ্যে ঢুকলে মনে হয় যেন কোথায় এক জনমানবহীন মহাদেশে প্রবেশ করা হয়েছে।

আমায় যদি আগে এই রাজ্য দেখান হত, সম্ভবতঃ আমার তেমন

উৎসাহ হ'ত না। এই হল অন্ধ বিশ্বাসের গুণ। পূর্বতন যোগীরা প্রাণের স্তরের নীচে নামেনি; ঠিকই করেছে তারা, কিন্তু আমিও যদি তাতে সন্তুষ্ট থাকতাম, আসল কাজ বাকী পড়ে থাকত। একবার যদি এই রাজ্য জয় করা যায়, তাহলে পরবর্তীদের পথ সোজা হবে। একেই বলে সবার জন্যে একের উপলব্ধি।

নীরদ: তাহলে তো আমরা সেই সুদিনের জন্যে বসে থাকতে পারি।

শ্রীঅরবিন্দ: অর্থাৎ তোমরা সোজা পথের ভক্ত?

নীরদ: শুধু সোজা নয়, আমরা চাই শিশুর মত আমাদের ব'য়ে নিয়ে যাবে কেউ।

মণিলাল: সম্ভব নয় কি?

শ্রীঅরবিন্দ: সম্ভব, কিন্তু শিশু হওয়া চাই, সত্যি শিশু।

নীরদ: শ্রীরামকৃষ্ণ যেন বলেছেন যোগীকে যে সব সময় ধনুর্বাণের মত টান থাকতে হবে এমন কোন কথা নেই।

শ্রীঅরবিন্দ: কোথায় বলেছেন? তার মানেই বা কি? যোগীকে সর্বদা সজাগ থাকতে হবে, বিশেষতঃ সাধনার সুরুতে। নতুবা যা কিছু অর্জন করা হয়েছে ধপাস করে ভেঙে পড়ে যেতে পারে। আমাদের সাধকেরা সাধনাকেই জীবনের অনন্য লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেনি। তাদের মাঝে দুটো অংশ আছে, একটা ভিতরের, অন্যটি বাইরের; বাইরের অংশটি তার সাধারণ ধারা ও সামাজিক আদানপ্রদানে ব্যস্ত। সাধনাকেই সারবস্তু করা চাই।

নীরদ: আপনি যে আশ্রমের সেই চমৎকার দিনগুলির কথা বলেছিলেন একবার—

শ্রীঅরবিন্দ : হাঁ, তখন সাধনা চলছিল প্রাণের স্তরে। সে অবস্থায় সব কিছুই শান্ত ও আনন্দময়। যদি আমি তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতাম তাহলে একটা বিরাট ধর্ম স্থাপন করতে পারতাম কিন্তু আসল কাজটি পড়ে থাকত।

মণিলাল : আপনি নির্জনবাস নিলেন কেন? আপনার কাজের উপর বেশি জোর দেবার জন্যে কি?

শ্রীঅরবিন্দ : না, সাধারণ দেহ-চেতনার আবহাওয়া থেকে সরে আসার জন্যে। আমায় যদি মা'র কাজ করতে হত, তাহলে আমার নিজের বিশেষ কাজের জন্যে আর সময় মিলত না; খাটুনীর কথা না হয় বাদই দিলাম।

নীরদ : মা'র আসার ফলে আপনার সাধনায় খুব লাভ হয়েছে?

শ্রীঅরবিন্দ : নিশ্চয়, নিশ্চয়! আমার নির্বাণ ও অন্যান্য যত উপলব্ধি, সেগুলো হল মনের স্তরে, যাকে বলা যায় theoretical. মা-ই দেখালেন তাদের বাস্তবরূপ দেবার পথ। তাঁকে না পেলে কিছুই গড়ে উঠত না। ফলতঃ এটাই তিনি করে আসছেন তাঁর শিশু-কাল থেকে।

নীরদ : তা বটে। তাঁর Prayers and Meditations পড়লে আপনাদের মতের মাঝে প্রচুর মিল পাওয়া যায়।

শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা

১১।১২।৩৮

শ্রীঅরবিন্দ বিছানায় শুয়ে, সময় সন্ধ্যাকাল, আমরা সবাই তাঁকে ঘিরে বসে। **কথা সুরু হবে** প্রায়। তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে।

নীরদ : আচ্ছা, এই যে কতকগুলো লোক এখান থেকে চলে গিয়ে অযথা আমাদের নামে নিন্দা রটনা করে বেড়াচেছ, তাদের কোন শাস্তিবিধান হবে না? দুষ্কর্মের ন্যায়বিচার বলে কোন জিনিষ নেই? তাদের কুকর্মের ফল তারা নিশ্চয় পাবে, নয় কি? আবার এই সব লোকই তো দেখি দুনিয়ায় নাম যশ লাভ করে, জীবনে সফল হয়।

শ্রীঅরবিন্দ : ন্যায়বিচার? এই জীবনে? খুব সম্ভব নয়। কিন্তু ন্যায়বিচার সম্বন্ধে সাধারণ লোকের যা ধারণা, জিনিষটা আসলে তা নয়। তাদের মতে পুণ্যবান যারা, তাদের পরবর্তী জীবনে সুখ-সমৃদ্ধিলাভ হবে, আর বিপরীত লোকদের বিপরীত ফল হবে। এই যুক্তি অনুসারে তা হলে তুমি যাদের কথা বলছ, তারা নিশ্চয়ই পূর্ব জীবনে ধার্মিক ছিল। ন্যায়বিচার আছে এই অর্থে যে, যারা ধার্মিক বা সৎলোক, তারা ক্রমশ সাত্ত্বিক জীবন লাভ করে, আর অন্যেরা মানুষের স্তর থেকে নেমে গিয়ে ক্রমশ আসুরিক হয়ে ওঠে। এই কথাই আমি 'আর্য'তে বলেছি।

এই সময় মা এলেন এবং শ্রীঅরবিন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের আলোচ্য বিষয় কি। শ্রীঅরবিন্দ বললেন, 'ন্যায়বিচার আছে কি না সেই কথা নীরদ জানতে চাচেছ।'

মা একটু থেমে নিজেই বললেন, "নিশ্চয়ই আছে। কুকর্মীরা ভেতরে ভেতরে আদৌ সুখী নয়; ভিতরের যন্ত্রণায় তারা মোটেই শান্তি পায় না।"

নীরদ : কিন্তু কই তাদের কোন পরিবর্তন হয় না তো। বরং আরো খারাপের দিকেই এগিয়ে চলে।

মা : ঠিক, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ভাগবত শক্তির চাপ যেমন তাদের উপর বাড়তে থাকে, তার ফলে হঠাৎ এক সময় তাদের মাঝে পরিবর্তন দেখা দেয়, বিশেষ করে তাদের কোন আসন্ন বিপদকালে। এ রকম বহু দৃষ্টান্ত আমরা পেয়েছি, শ্রীঅরবিন্দের নির্যাতনকারীদের মাঝে। ক বদ্‌মাস হতে পারে, কিন্তু তার যদি কিছু যোগ্যতা থাকে বা যদি সে চতুর হয়, তাহলে সে অবশ্যই জীবনে সফল হবে। যোগ্যতা এবং নিপুণতাই তো সাফল্য আনে, সাধুতা বা ধার্মিকতা ইত্যাদি নয়।

নীরদ : লোককে ঠকিয়ে অর্থ উপার্জন করাকে চাতুর্য বলব?

মা : নিশ্চয়ই, অথবা বলতে পার চাতুর্যের অপব্যবহার। অবশ্য আমি বলছি না যে এই চাতুর্যের খারাপ ফল ভোগ করতে হবে না। কিন্তু এও সত্য যে এই জাতের লোকেরাই সাংসারিক উন্নতি করে এবং এই সব গুণই দুনিয়ায় সফল হয়।

নীরদ : আপনি আপনার 'Prayers'-এ বলেছেন যে ন্যায়বিচার অবশ্যই আছে, ভাগবত করুণা ব্যতীত কেউ কর্মের বিধান এড়াতে পারে না।

মণিলাল : কিন্তু আমরা ভাগবত করুণায় বিশ্বাস করি না কেন?

এবার বেশ কিছুক্ষণ নীরব থেকে মা বললেন, "তার কারণ

মানুষের মন যুক্তির মার্গ ই পছন্দ করে ; এক জিনিষের সাথে অন্যটির সম্বন্ধ, একটির সাথে অন্যের যোগাযোগ খোঁজে। কাজেই সেখানে করুণার আর কোন জায়গা থাকে না। যেমন ধর, ভাগবত করুণায় কারো অসুখ সারান হল বা পরীক্ষা পাশ করানো হল, সে ভাববে যে ওষুধ বা অন্য কিছু তার রোগ সারাল বা পরীক্ষা পাশ করাল। সে লক্ষ্য করে না যে তার পেছনে ভাগবত করুণা কাজ করেছে। নয় কি ?'' মা জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীঅরবিন্দকে।

শ্রীঅরবিন্দ : তারা বলবে তাদের কপালের জোর (luck) (উচচহাস্য)

মা বলে চললেন, ''তোমরা যদি করুণায় অস্বীকার কব, সে কাজ করবে কি করে ? এ যেন তার মুখের উপর দরজা ভেজিয়ে দেওয়া। অবশ্য তবুও তলা বা নীচের দিক থেকে করুণার কাজ চলতে পারে না, এমন নয়।''

নীরদ : বিনা সর্তে করুণা আপনা হতে কাজ করে না ?

মা : করে, বিশেষত তাদের বেলায় যারা কোন বিশেষ কাজের জন্য বিধিনির্দিষ্ট। কিন্তু যখন করুণা স্বীকার করে' তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান হয়, তখন তার কাজ হয় আরও দ্রুত ও জোরালো।

নীরদ : আমরা স্বীকার করি না সচেতন নই বলে ?

মা : না, তা নয়। আমি অনেক অচেতন লোকদের জানি যারা করুণার স্পর্শ পেয়ে অন্তর থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছে।

মণিলাল : আমরা চাই এমন করুণা যে আমাদের শিশুর মত খাওয়ায় দাওয়ায় আর সকল রকম দরকারে সাহায্য করে।

শ্রীঅরবিন্দ : এই শিশুটি কে ? (সকলের হাস্য)

মা : কিন্তু করুণা তো মানুষের নিজের ধারণা বা দাবী অনুযায়ী কাজ করে না। তার হলো আলাদা নিয়ম, আলাদা নির্ধারণ। কোন নিয়মে চলবে সে? প্রায়ই যা বর্তমানে মনে হচ্ছে মস্ত আঘাত বা সমূহ বিপদ, দশ বছর পরে দেখা যাবে যে সেগুলো মস্ত আশীর্বাদ, এবং তখন মানুষ বলবে তাদের সত্যিকার জীবন সুরু হল তার পর থেকেই। করুণা অহেতুকী বটে, কিন্তু মানুষ যদি তাকে অস্বীকার করে বা ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তাহলে কি করে সে কাজ করবে? তোমার পেয়ালাতে জল ঢালা হচ্ছে, আর তুমি জলটা দিচ্ছ ফেলে।

মা হঠাৎ আমাদের মূল প্রসঙ্গে ফিরে এসে বললেন যে, যাদের নিয়ে কথা হচ্ছিল তাদের দুজনের জীবনে কি রকম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় সে সম্বন্ধে তিনি কৌতূহলী। প্রত্যেকের ক্ষেত্রে ফল আলাদা রকমের হতে পারে, কিন্তু কি রকমের তাঁর জানা নেই।

নীরদ : প্রভেদটা কি হবে মাত্রা হিসাবে?

মা : না, গুণ হিসাবেও। একজন অন্যের চাইতে বেশী বোকা ও অন্ধ। কাজেই তার অনিষ্টের ক্ষমতা কম। অন্য লোকটি জানে সে কি চায়।

নীরদ : হয়ত একজনের আবার ভাল পরিবর্তনও হতে পারে এবং সে ফিরে আসতে পারে, যেমন ক'এর বেলায় হয়েছে।

মা : সেটা রঙিন কল্পনা! একবার কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে তার আর আশা বা সম্ভাবনা থাকে না; কাউকে সুযোগ দেওয়া হলে তার কিছু সম্ভাবনা থাকে।

এই বলে মা ধ্যানে চলে গেলেন।

আমরা শ্রীঅরবিন্দের দিকে ফিরে বসলাম। মণিলাল তখন

জৈনদের কর্মবাদ সম্বন্ধে বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। আমরা কেউ কেউ তাঁর ধর্মশাস্ত্রে এমন অনুরাগ দেখে অবাক হ'লাম। কিন্তু এই শুকনো কচ্‌কচানি কি বেশীক্ষণ শোনা যায়? অথচ শ্রীঅরবিন্দ বেশ ধৈর্য ধরে শুনতে লাগলেন। অবশেষে মণিলাল বললেন, এই কর্মের বিধান থেকে কেউ নিস্তার পায় না, তীর্থঙ্করও নয়, একেবারে নিক্তি মেপে গাণিতিক মাত্রায় শোধ দিতে হবে।

শ্রীঅরবিন্দ: মস্ত বড় জিনিষ সন্দেহ নেই। কিন্তু এত আশ্চর্য-বৎ ও গাণিতিকি যে অতটা সত্য কিনা সন্দেহ। গল্পে শোনা যায়, একটি ছেলে অসুখে পড়ে, তার বাপের প্রচুর অর্থ খরচ হয় তার চিকিৎসার জন্যে। ছেলেটি তবু মারা যায়। ছেলেটির বাপ নাকি পূর্বজন্মে ছিল ঐ ছেলের অধমর্ণ। তাই এখন রুগ্ন ছেলেটি তার চিকিৎসা বাবত বাপের সমস্ত ঋণ আদায় করে নিয়ে মরে গেল।

মণিলাল: এরকম কর্মকে বলা হয় নিকচিত বা উৎকট কর্ম। অর্থাৎ যে কর্মকে এড়ান চলে না, যেমন এক ধরনের গ্রন্থি আছে যা খোলা যায় না।

শ্রীঅরবিন্দ: হয়ত এই ধরনের কোনো উৎকট কমই আমার এই দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে।

মণিলাল: কিন্তু স্যার, আপনার এই অযথা ভোগ কেন?

শ্রীঅরবিন্দ: কি করে জানলে অযথা? হয়ত আমায় তীব্র বেদনা অনুভব করাবার জন্যে এটা ঘটেছে। আগে যে সব বেদনা অনুভব করেছি, সেগুলো ছিল সাধারণ; তাদের আনন্দে পরিণত করতে পেরেছি কিন্তু এই বেদনা ছিল তীব্র এবং গাঢ়, তা এল আবার অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক ভাবে; তখন তাকে আনন্দে রূপান্তরিত করা সম্ভব হল

না। সম্ভব হল পরে, যখন ব্যথাটা থিতিয়ে গেছে। এর পুরো অর্থ পরে আস্তে আস্তে পরিষ্কার হবে। অবশ্য এ সমস্তই আমার কাছে যুদ্ধের অংশবিশেষ মাত্র।

মণিলাল : আপনি কবে সেরে উঠবেন?

শ্রীঅরবিন্দ : বলতে পারি না ; আর পারলেও বিরুদ্ধ শক্তি এসে তখনি বাধা দেবে। সুতরাং আমি ভবিষ্যদ্বাণী করতে চাই না।

ভবিষ্যৎ যে জানা যায় না বা তার সম্ভাবনা দেখা যায় না এমন নয়। যেমন কতকগুলো জিনিষ সম্বন্ধে আমি স্পষ্ট উত্তর দিয়েছি কিন্তু সম্ভাবনার ক্ষেত্রে আমি চুপ ক'রে থাকি, কারণ সম্ভাবনার শৃঙ্খলে আমি বাঁধা পড়তে চাই না। কেননা যদি তা' করি তাহলে আগে থেকেই কতগুলো নির্দিষ্ট পথে চলা স্বীকার করে নেওয়া হয়। ফলে আমি যা' চাই তা' নাও হতে পারে, এবং যা নামিয়ে আনার জন্য আমার চেষ্টা তাও নামিয়ে আনা হয় না।

কিন্তু প্রচুর লোক আছে যারা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। যোগীদের মাঝে সে ক্ষমতা তো সুলভ। আমায় যখন গ্রেপ্তার করে, তখন আমার দিদিমার বোন বিশুদ্ধানন্দকে (বোধ হয়) জিজ্ঞাসা করেন "আমাদের অরুর কি হবে?". তিনি বলেন, "বিশ্বজননী তাকে তাঁর কোলে তুলে নিয়েছেন, কিছু হবে না তার। কিন্তু সে তো তোমাদের অরবিন্দ নয়, সে বিশ্বের অরবিন্দ, এবং বিশ্ব তার সৌরভে আমোদিত হবে।"

নারায়ণ জ্যোতিষী আমার সম্বন্ধে তিনটি বিচার, শ্বেতজাতীয় শত্রু ও মুক্তি এই তিন বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। আমার কোষ্ঠী দেখে তিনি বলেন যে জন্মমুহূর্ত সম্বন্ধে কোন ভুল রয়েছে ; সেটা সংশোধন হবার

পর তিনি উত্তর দিলেন, "আহা, সিসা যে এখন সোনায় পরিণত হল।" (মণিলালকে) "স্বপ্নে কোনদিন ভবিষ্যদ্বাণী শুনেছ?"

মণিলাল : আমি নিজে শুনিনি। তবে আমাদের এক বন্ধুর পুত্রবধূ নাকি স্বপ্নে দেখে তার শ্বশুরকে শ্মশানে নেওয়া হচ্ছে। দু'ঘন্টা পরেই লোকটির মৃত্যু হয়।

শ্রীঅরবিন্দ : ভাল দৃষ্টান্ত বটে।

নীরদ : অজানা অচেনা কারও সম্বন্ধে (যেমন আপনার সম্বন্ধে বিশুদ্ধানন্দের) ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়?

শ্রীঅরবিন্দ : ওটা হল সম্বোধি শক্তির ব্যাপার (intuition)। একবার পণ্ডিচেরী ইলেক্‌শনে আমাদের ইচ্ছা হল কোন একটি লোক মনোনীত হোক। লোকটির চেহারা আমি ভাবদৃষ্টিতে দেখতে চাইলাম, কিন্তু যাকে দেখলাম তার সাথে আমাদের মনোনীত লোকটির কোন মিল নেই। কিছুদিন পরে যখন আমার শালার সাথে এক সরকারী কর্মচারীর ঝগড়া বাধে তখন তার তলব পড়ে, কিন্তু নাম ভুল করে বোস হয়ে যায় ঘোষ। কাজেই যেতে হল আমায়। গিয়ে দেখি আমার Vision-এ দেখা ঠিক সেই লোকটি গভর্ণরের আসনে বসে আছে। কম আশ্চর্য হলাম না।

আর একবার চ, র'র বন্ধু, আমার সাথে দেখা করতে আসছে শুনে ভাবলাম লোকটার কি রকম চেহারা আগে ভাবদৃষ্টিতে দেখা যাক। নেড়া মাথা, ডালকুত্তার মত মুখওয়ালা এক ছবি ফুটে উঠল। কিন্তু লোকটি যখন উপস্থিত হল, দেখলাম একেবারে রীতিমত দক্ষিণী ব্রাহ্মণের চেহারা। কিন্তু শুনতে অদ্ভুত মনে হবে যে, দু'বছর পরে তাকে যখন দেখলাম, সে অবিকল আমার সেই পূর্বদৃষ্ট চেহারাই

পেয়েছে। এ সব জিনিষ সূক্ষ্মজগৎ থেকে আমাদের বহিশ্চেতনায় প্রতিফলিত হয়।

মণিলাল : শরীরের কোষেও ভাগবত চেতনার উপলব্ধি হয়?

শ্রীঅরবিন্দ : হয় বৈ কি। কোষেও শান্তি, আনন্দ প্রভৃতির অনভূতি হতে পারে। কোষগুলি সচেতন হলে বিরুদ্ধ প্রভাবকে ঠেলে ফেলে দিতে পারে। শরীরে শান্তি নামলে রোগ প্রতিকারের পক্ষে তা একটা মহৌষধি।

নীরদ : আমি শান্তি পাচ্ছি অথচ নিজে জানছি না, এমন কি হয়?

শ্রীঅরবিন্দ : সেটা হল নিরপেক্ষ (neutral) শান্তি, নিশ্চলতা (quietude) থেকে সামান্য বেশী। কিন্তু পরা (positive) শান্তিও আছে যা জানা যায়, অনুভব হয়। সত্যও নামতে পারে শরীরে, শক্তিও, কিন্তু শক্তি সহ্য করতে পারে খুব কম লোক; আলোও নামে। আমার মনে আছে এক শিষ্য তার গুরুকে বলছিল যে তার শরীরে আলো নেমেছে। গুরু বলল যে তাকে শয়তানে পেয়েছে। তখন থেকে শিষ্য সব হারিয়ে ফেলল।

এক অসীম শান্তির, শক্তির, আনন্দের সাগর রয়েছে মাথার উপরে। (নীরদের দিকে তাকিয়ে), যাকে বল 'overhead', তার সাথে যোগাযোগ হলে সব সময় এই সব জিনিষ পাওয়া যায়।

মণিলাল : আপনার মাঝে নানা ধরনের চিন্তা ইঙ্গিত (suggestion) ইত্যাদি আসে?

শ্রীঅরবিন্দ : অর্থাৎ? চিন্তা, ইঙ্গিত, প্রেরণা চারদিক থেকেই তো আসছে আমার কাছে, কিন্তু তাদের তাড়িয়ে না দিয়ে আমি আগে

দেখি কোনটা কি। কিন্তু তুমি যদি জানতে চাও নিজে চিন্তা করি কিনা, তা' আমি কখনো করি না। লেলের সাথে সেই অভিজ্ঞতা লাভের পর সেটা থেমে গেছে বহু পূর্বে। যেমন বললাম, চিন্তা আসে চারদিক থেকে এবং উপর থেকে। মন নিশ্চল থেকে সেগুলোকে চলে যেতে দেয়, অথবা বিস্তৃত হয় তাদের গ্রহণ করবার জন্যে। প্রকৃত চিন্তা যেগুলো তারাও এভাবেই আসে। সেগুলোকে ভেবে পাওয়া যায় না। ভেবে পাওয়া চিন্তাকে মা নাম দিয়েছেন মন-গড়া ইমারত।

মণিলাল: আপনার 'আর্য' কি এভাবে লেখা হয়?

শ্রীঅরবিন্দ: না, সে লেখা একেবারে কলমের মুখে নেমে আসে। (একটু থেমে) এই যে দায়িত্বমুক্তি, এতে পরম স্বস্তি মেলে।

মণিলাল: হাঁ, স্যার।

শ্রীঅরবিন্দ: আমি কিন্তু সাধারণ দায়িত্বের কথা বলছি না; এই যে সব কিছু চিন্তা করে স্থির করা, আমি বলছি তার কথা। কতগুলি চিন্তা আছে যেগুলো বলতে পার পাঠিয়ে দেওয়া হয় বা এসে প্রতিফলিত হয় উপর থেকে। তা বলে মনে করোনা যে আমি কোন বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান চাই না। যখন চাই, তাকে আহ্বান করি। উচ্চতর বৃত্তি চিন্তাগুলোকে দেখতে পায় দেয়ালে লেখার মতন।

মণিলাল: বিশুদ্ধানন্দ নাকি নানা রকমের গন্ধ সৃষ্টি করতে পারতেন?

শ্রীঅরবিন্দ: সেগুলো স্থূলরূপকরণ (materialisation), না স্থূলজগতে ইন্দ্রিয়ের উপর প্রক্ষিপ্ত সূক্ষ্মগন্ধ, বলা শক্ত।

প, ব নাকি সব সময় অনুভব করত কেউ একজন তার সাথে রয়েছে।

আমার ছবি দেখে বলল, 'না, এ নয়' কিন্তু দর্শনে আমায় দেখেই চিনতে পারল, এই সেই Presence। এক সময় আমি ভাবতাম কায়াসিদ্ধি সম্ভব নয়। কিন্তু আলিপুর জেলে থাকার সময় আমি একদিন আমার শরীরের এমন এক ভঙ্গীতে অবস্থিতি দেখলাম যা জাগ্রত শরীরের পক্ষে অসম্ভব। আবার, আমার হাতদুটিকে ঊর্ধ্বাবস্থায় রাখতে, মাংসপেশীর কোন ক্রিয়া ছাড়া—অভ্যাস করতাম, সে অবস্থায় আমি একদিন ঘুমিয়ে পড়ি। ওয়ার্ডার তো দেখে ভাবল যে আমি মরেই গেছি। সে রিপোর্ট করল তৎক্ষণাৎ। বড়বাবুরা এসে দেখে আমি পুরাদস্তুর বেঁচে আছি।

Jules Romains বলে এক ফরাসী লেখক আছেন ; তিনি হলেন আবার ডাক্তার ও মিষ্টিক। চোখ বন্ধ করেও শরীরের অন্যান্য অংশ দিয়ে তিনি দেখতে পান। তাঁর মতে চোখ হল এক বিশিষ্ট দৈহিক অংশ মাত্র। অন্যান্য দৈহিক অংশদেরও দেখবার ক্ষমতা শিক্ষা দেওয়া যায়। সেটা যখন লোকসমক্ষে তিনি প্রতিপাদন করলেন বৈজ্ঞানিকেরা মানতে রাজী হল না।

১২।১২।৩৮

আজ একসময় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলাপ আরম্ভ হতে আমি তাঁকে বললাম যে কবির শেষের দিনের কবিতাগুলির খুব সুখ্যাতি হচ্ছে; তাতে নাকি তাঁর বহু মিষ্টিক অভিজ্ঞতার নিদর্শন রয়েছে।

শ্রীঅরবিন্দ: সেগুলোর বক্তব্য বিষয় কি? তোমার মনে নেই?

নীরদ: না, আমি আবার পড়ে আপনাকে বলব।

বিকেল বেলা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটা মিষ্টিক ভাবমূলক কবিতা তাঁকে পড়ে শোনালাম, জিজ্ঞেস করলাম, "কোন মিষ্টিক ভাব আছে কি?

শ্রীঅরবিন্দ: কই, তেমন বিশেষ কিছু নয়। একটাতে আলোর কথা বলছেন যেন।

নীরদ: অন্যগুলোতে বলছেন আস্তে আস্তে তাঁর দেহচেতনা হারিয়ে যাচ্ছে, এই পৃথিবীর স্মৃতি ক্রমশঃ ক্ষীণ হচ্ছে......

শ্রীঅরবিন্দ: অর্থাৎ মৃত্যু এগিয়ে আসছে। আর কিছু?

নীরদ: আর একটাতে বলছেন যেন তিনি অন্য কোন লোকে প্রবেশ করছেন। তার উজ্জ্বল আলো তারার দীপ ইত্যাদির আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

শ্রীঅরবিন্দ: তা যদি হয়, তাহলে অলঙ্কারগুলো বাদ দিয়ে সোজাসুজি বললেই পারেন, বৈষ্ণব কবিরা যেমন পরিষ্কারভাবে বলেছে।

নীরদ: ক'র কাছে শুনি যে রবীন্দ্রনাথ একবার পিঁপড়ে কি

বিছের কামড়ে ভীষণ যন্ত্রণা পাচ্ছিলেন। কঠোর চেষ্টার পর তিনি নাকি তাঁর মনকে ব্যথা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন এবং ফলে আরাম লাভ করেন। এটা কোন ধরনের অভিজ্ঞতা ?

শ্রীঅরবিন্দ : হ্যাঁ, এটা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা বটে।

নীরদ : তাঁর জীবনস্মৃতিতে তিনি লিখেছেন যে একদিন তাঁদের চৌরঙ্গীর (?) বাড়িতে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি প্রকৃতির দৃশ্য দেখছিলেন। হঠাৎ যেন এক আনন্দের ঢেউ উথলে উঠে বিশ্ব, প্রকৃতি ছেয়ে ফেলল। বোধ হয় সেই আনন্দই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'।

শ্রীঅরবিন্দ : এটাও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা বটে। কি বলেছেন তিনি সে কবিতায় ?

নীরদ : তিনি বলেছেন যে ঝরণা হঠাৎ জেগে উঠেছে, সমস্ত পাহাড় পর্বত, বাধাবন্ধ লঙ্ঘন করে মহানন্দে ছুটে চলেছে সমুদ্রের পানে।

শ্রীঅরবিন্দ : কেন, এই প্রতীকের আশ্রয় নিলেন কেন ? তাঁব অভিজ্ঞতা কি প্রতীকের রূপ নিয়ে আসে ?

নীরদ : .মনে তো হয় না।

শ্রীঅরবিন্দ : তাহলে ঠিক যেমন অনুভব করলেন তেমনটি লিখলেই তো পারতেন। এই কবিতা পড়ে তো কেউ বুঝতে পারবে না যে কবিতাটি তাঁর অভিজ্ঞতাপ্রসূত। এই সব অলঙ্কারের মুস্কিল হল যে আসল বক্তব্য তাতে চাপা পড়ে যায়।

ধর, বেদের সেই লাইনটি যেটা আমি **Future Poetry**-তে উল্লেখ করেছি, 'যা কিছু জীবিত, তাকে উর্ধ্বে তুলছে, আর যা মৃত

তাকে বহির্জগতে এনে প্রকাশ করছে', এটা পড়লেই বোঝা যায় যে এটা অভিজ্ঞতার কথা। দেবী ঊষা যা কিছু প্রকাশ হয়েছে তাকে ক্রমশ ঊর্ধ্বে তুলছেন, আর যা এখনও অপ্রকাশিত, প্রচ্ছন্ন তাকে প্রকট করছেন। অবশ্য তোমায় প্রথমে প্রতীকের অর্থ জানতে হবে, তাহলে সব পরিষ্কার বোঝা যায়।

নীরদ : কিন্তু মিষ্টিক কবিতা তো একটু ধোঁয়াটে, অস্পষ্ট হবেই। আপনি মিষ্টিক কবিতাকে তুলনা করেছেন চাঁদের আলোর সাথে এবং আধ্যাত্মিক কবিতাকে সূর্যের আলোব সাথে।

শ্রীঅরবিন্দ : না, আমি বলেছি গুহ্য (occult) কবিতার কথা। মিষ্টিক কবিতা দুই প্রকার : গুহ্য মিষ্টিক আর আধ্যাত্মিক মিষ্টিক। আমার 'Moon and Star' বা 'Bird of Fire' হল গুহ্য মিষ্টিক কবিতা আর সনেটগুলি হল আধ্যাত্মিক মিষ্টিক। 'Nirvana' কবিতায় দেখবে আমি নির্বাণ যা' ঠিক তাবই রূপ দিয়েছি।

যে কোন প্রতীক বা ছবি কি উপমা ব্যবহার করবার স্বাধীনতা তোমার আছে। তবে সে সব ছবির মাধ্যমে তোমার বক্তব্য যা, তা স্পষ্ট হওয়া চাই। এই দৃষ্টান্তটা নাও :

অবস্থার পর অবস্থার জন্মলাভ হল,
আবরণের পর আবরণ সচেতন হল, (১)

এখানে ছবির ব্যবহার হয়েছে কিন্তু প্রতীকের সাথে যাদের পরিচয় আছে তাদের কাছে অর্থ প্রাঞ্জল। এটা খাঁটি অভিজ্ঞতাপ্রসূত। আর একটা দৃষ্টান্ত নাও :

---

(1) Condition after condition is born.
Covering after covering becomes conscious.

"ঋষিগণ (**Seers**) মইএর মত ইন্দ্রকে বেয়ে উঠছে" (২) কী অপূর্ব সেই অংশটা, অভিজ্ঞতার নিখুঁত ও পরিষ্কার বর্ণনা। অংশটা পুনরাবৃত্তি করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বুঝলে? ইন্দ্র হল দিব্য মানস; যত উর্ধ্বে ওঠা যায় তত স্পষ্ট দেখা যায় কি কি করবার বাকি রয়েছে। যার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে, সে-ই জানে এ কতখানি সত্য এবং এ-যে অভিজ্ঞতা হতে লেখা, কল্পনাপ্রভাবে নয়, সেটা বোঝে।

নীরদ: কিন্তু অভিজ্ঞতা ছাড়াও, এমন কি না বুঝেও ত মাঝে মাঝে আধ্যাত্মিক বিষয় সম্বন্ধে কবিতা লেখা যায়?

শ্রীঅরবিন্দ: যায় বইকি। আন্তর সত্তার সূক্ষ্মদৃষ্টি থাকতে পারে এবং কবিতায় তা প্রকাশ হতে পারে।

নীরদ: মিষ্টিক না হয়েও মিষ্টিক কবিতা ত লেখা যায়? যেমন রবীন্দ্রনাথ, বা হারীন লিখেছেন এখানে আসার পূর্বে?

শ্রীঅরবিন্দ: রবীন্দ্রনাথের বংশে ত ধর্মজীবনের বীজ ছিল। আর হারীনেরও একটি মিষ্টিক অংশ ছিল। তার পূর্বের কবিতা দেখে আমি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম যে সে আধ্যাত্মিক কবি হতে পারে। যেই সে এখানে এল, প্রথম বছর চমৎকার চলতে লাগল তার সাধনা, তার আন্তর মন খুলে গেল এবং মার সম্বন্ধে যে সব কবিতা লিখল, সবই তার অনুভূতি হতে লেখা। তার কবিতার প্রেরণা আসত বরাবর তার উর্ধ্ব সত্তা থেকে।

(2) The seers climb Indra like a ladder.

১৩।১২।৩৮

মা আজ এসেছেন আন্দাজ ছটার সময়। এসে ধ্যানে বসলেন, আমরাও ধ্যান করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে মা চলে গেলেন। শ্রীঅরবিন্দ দু'বার মণিলালেব ধ্যানমূর্তির দিকে তাকালেন, পরে মৃদু হেসে বললেন, "ধ্যান করছ?"

মণিলাল: (হেসে) ওটার বিরুদ্ধেই ত আমার অভিযোগ, স্যার! এত চেষ্টা করছি, সবই বৃথা। কেবল গত বুধবার চমৎকার জমেছিল ধ্যান, তারপরে দিনের পর দিন ফেইল, কত যে তুচ্ছ অবাঞ্ছনীয় জিনিষ ভিড় করে আসে!

শ্রীঅরবিন্দ: কি রকম?

মণিলাল: সব বাজে, অর্থহীন, nonsense.

শ্রীঅরবিন্দ: কোন অসাধারণ বাজে বিষয়, যেমন দিবারাত্র মহারাজার সেবা বা মুসোলীনির উত্তরাধিকারী সম্বন্ধে চিন্তা?

মণিলাল: না, স্যার! মহারাজার চিন্তা কদাচিৎ আসে। কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও ফল পাই না কেন, অথচ একদিন হঠাৎ ভাব এসে যায়?

শ্রীঅরবিন্দ: সেটা তো সাধারণ নিয়ম। কেবল ধ্যানই যাদের নিত্য কর্ম সেই সব যোগীদের কথা আলাদা। তাদেরও ফাঁকা অবসর থাকে।

মণিলাল: বন্ধুবর নীরদ, দেখি, মুহূর্তে ধ্যানে ডুবে যায়, আর তার ঘাড়টা নুয়ে পড়ে।

নীরদ : হতাশায়। (হাস্য)

শ্রীঅরবিন্দ : তোমার ঘুম আসে নাকি?

মণিলাল : হতাশায় কি কেউ ঘুমুতে পারে?

শ্রীঅরবিন্দ : পারে, পরিত্রাণের আশায় (escape)। কেউ কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমায়, ঘোড়ার মতন, যেমন আমার মাতামহ রাজনারায়ণ বোস।

মণিলাল : তিনি কি যোগাভ্যাস করতেন?

শ্রীঅরবিন্দ : যৎসামান্য, ব্রাহ্ম ধরনের।

মণিলাল : নীরদের মুখ, স্যার, আনন্দে জ্বলজ্বল করছে।

শ্রীঅরবিন্দ : সত্যি, তোমার মুখে গভীর তন্ময়তার ছাপ রয়েছে। জ্বলজ্বল করলেই সোনা হয় না বলতে চাও?

মণিলাল : তা কেন? সে কবি, ঊর্ধ্বলোকের বাসিন্দা।

শ্রীঅরবিন্দ : সেক্সপীয়রের মতে কবিতা মিথ্যা, বচনসর্বস্ব।

মণিলাল : না, নীরদ সে রকম কবি নয়। আচ্ছা স্যার, কি করে কেউ কেউ হঠাৎ ধ্যানে ডুবে যায়, তাদের শরীর দোলে, কখনও মাটিতে পড়ে যায়?

শ্রীঅরবিন্দ : অনেকেরই তা হয়। সেজন্যে যোগীরা তাদের শরীর কোন অবলম্বনের সাথে বেঁধে রাখে ; অথবা যারা আসন অভ্যাস করেছে তারা খাড়া থাকে।

মণিলাল : ধ্যানে ফল পাওয়া যায় কি করে?

শ্রীঅরবিন্দ : মনকে স্থির করতে হয়। মাথার উপরে রয়েছে অসীম শান্তি, আনন্দ, আলো ও শক্তির সমুদ্র। কিন্তু মন আর ঊর্ধ্বমানসের মাঝখানে রয়েছে একটি ঢাকা, হিরণ্ময় পাত্র, (এখানে

শ্রীঅরবিন্দ মাথার উপরে হাত দিয়ে দেখালেন)। সেটা ভাঙতে পারলে, তাবা সমস্ত তোমার ইচছামত নেমে আসবে কিন্তু তার জন্যে নিশ্চল মন (quietude) একান্ত প্রয়োজন। অবশ্য এমন লোক আছে যারা এই নিশ্চলতা ছাড়াও ওসব পেতে পারে, কিন্তু বড় শক্ত।

মণিলাল : আমাদের অন্তরেও কি সেরকম পর্দা আছে ?

শ্রীঅরবিন্দ : হ্যাঁ, প্রাণের পর্দা বা দেয়াল ; স্থূল চেতনা, বিক্ষুব্ধ আবেগ, এ সব দিয়ে গড়া। সেই দেয়াল ভেঙে যেতে হবে অন্তরের পেছনে। কোন কোন ক্ষেত্রে শক্তি পর্দার অন্তরালে কাজ করতে থাকে, সামনে নানা বাধা পায় বলে, এবং প্রয়োজনানুযায়ী ভাঙতে বা গড়তে থাকে। হঠাৎ যখন একদিন পর্দা সরে যায়, আধার দেখে যে সে অসীমের নিবাসী।

নীরদ : অভীপ্সা না থাকলেও শক্তি সর্বদা কাজ কবতে থাকে ?

শ্রীঅরবিন্দ : তাদের মাঝে, যাদের অন্তরে একটা বেগ রয়েছে। শক্তি পিছন থেকে কাজ করে বলেই তাদের মাঝে থেকে থেকে অভীপ্সার শিখা জ্বলে ওঠে।

মণিলাল : কি উপায়ে এই আনন্দ, শান্তি পাওয়া যায় বলুন।

শ্রীঅরবিন্দ : শুধু তাইই চাইতে হবে। খুব শক্ত নয় কি ? (হেসে বললেন)। তা না হলে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। যোগে সহিষ্ণুতা চাই ; পুরোনো যোগের মতে বার বছর পরে অভিজ্ঞতার দেখা মেলে। তার পরে তুমি অনুযোগ অভিযোগ করতে পার, কিন্তু তুমি ত বলেছিলে তোমার প্রচুর অভিজ্ঞতা হয়েছে ?

মণিলাল : ঠিক কথা, স্যার। আপনাকে বলেছি কি রকম সহজে বরোদায় ধ্যানের ভাব আসত যে কোন সময় ; তখন আমার

ধ্যানে বসতেই হত। কখনও হয়ত হাসপাতালে যাবার পথেই এল; আর তার শান্তি, আনন্দ অনেকদিন পর্যন্ত থাকত। কিন্তু আবার বহুদিন ধরে একেবারে ফাঁকা; এরকম খেয়ালী না হয়ে দুসপ্তাহে অন্ততঃ একবার তার আসা উচিত!

নীরদ: আচ্ছা, মাথাটার উপর দিকে একটা আকর্ষণ বোধ হয়, সেটা কি?

শ্রীঅরবিন্দ: সেটা হল তোমার সূক্ষ্মশরীর, এই দেহের মাথা নয়। মনের উর্ধ্বচেতনার দিকে ওঠার চেষ্টা।

নীরদ: স্বপ্নে সমুদ্র, পাহাড় ইত্যাদি দেখার অর্থ কি?

শ্রীঅরবিন্দ: এগুলো হল প্রতীক, শক্তির সমুদ্র, সত্তার পাহাড় ও তার নানা অংশ ও স্তরভেদ, একেবারে চূড়ায় হল ভগবান। এগুলো অতি সাধারণ ব্যাপার। মনের বিস্তৃতির সাথে হৃদয়েরও বিস্তৃতি লাভ করে। এই বিশালতা ব্যাপ্তি এলে দুয়ার আরো খুলে যায়। (মণিলালের দিকে তাকিয়ে) তুমি কখনও তোমার ভিতরের সত্তার স্পর্শ পাওনি?

মণিলাল: পেয়েছি স্যার। আপনাকে বলেছি কি করে পেলাম আর মৃত্যুভয়ে কি করে হারালাম।

শ্রীঅরবিন্দ: (হেসে) তাই ত। আমি ভুলে গেছি।

মণিলাল: এক সময়ে আমাব মনে হত আমার মাথাটা যার পায়ে নত হয়ে রয়েছে। ওটা কি, স্যার?

শ্রীঅরবিন্দ: ওটা হল চৈত্যপুরুষ। তাহলে তোমার চৈত্য পুরুষের অভিজ্ঞতা হয়েছে?

মণিলাল: আমি তো চিনতে পারিনি, স্যার।

(সকলের হাস্য)

শ্রীঅরবিন্দ : এই আমিই সমস্ত নষ্টের গোড়া। তাকে ভুলে যেতে হবে। ভাবতে হবে অভিজ্ঞতাগুলি যেন অন্যের হচ্ছে। তা যদি পার তাহলে একটা মহৎ জয়লাভ হবে। আমার যখন নির্বাণের অভিজ্ঞতা হয়, আমি নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলে যাই, আমি যেন কেউ নই। এই একটা 'আমি' আঁকড়ে ধরে অমুক, অমুক উপাধিযুক্ত ডাক্তার মণিলালের বেঁচে থাকার কি সার্থকতা? তোমার যদি তখন মৃত্যুই হত, সে মৃত্যু হত কত গৌরবের।

মণিলাল : (লজ্জিত স্বরে) মানুষী চেতনা যখন দিব্য চেতনায় পরিণত হয়, তখন কি রকম অবস্থা হয়?

শ্রীঅরবিন্দ : তখন আধার নিত্য শান্তি, শক্তি অনুভব করে, অসীমের সান্নিধ্য পায় এবং অসীমে ও অনন্তে বাস করে। অমরতার অধিকারী হয় এবং শরীরের মৃত্যু মনে হয় তুচ্ছ। তারপর আসে সকলের মাঝে সেই এককে উপলব্ধি। প্রত্যেক বস্তু যেন ব্রহ্মের প্রকাশ। এই যে আমি ঘরের চারিদিকে তাকাচ্ছি, আমি দেখছি সমস্ত জিনিষই ব্রহ্মের রূপ। না, এটা চিন্তা বা ভাব-গত কিছু নয়, বাস্তব উপলব্ধি। এই দেয়াল, এই বই, ব্রহ্ম। তোমায় দেখছি মানুষ মণিলাল বলে নয়, ভগবান, ভগবানের মাঝে বাস করছ এই রূপে। কী চমৎকার এই অভিজ্ঞতা।

নীরদ : বৈদিক ঋষিরা নাকি "মন্ত্র" শুনতে পেতেন। এটা কি অন্তঃশ্রুতি?

শ্রীঅরবিন্দ : হাঁ, তাই। কখনও একটা লাইন, কখনও একটা স্তবকও, কখনও বা পুরো কবিতাই শোনা যায়। অথবা তারা

নেমেও আসতে পারে। শ্রেষ্ঠ কবিতা• সর্বদা ওভাবেই লেখা হয়ে থাকে।

নীরদ: আমার মনে আছে আমার কবিতার একটি লাইন, আপনি তার সুখ্যাতি করেছিলেন—

"A fathomless beauty in a sphere of pain,"

যেন কেউ কাণে কাণে বলে গেল।

শ্রীঅববিন্দ: তাই। এটাই অন্তঃশ্রুতি কিন্তু তাতে বিপদও আছে। মাঝে মাঝে প্রতারিত হওয়া অসম্ভব নয়। নিম্নস্তরের প্রেরণাও ওরকম সহজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসতে পারে।

নীরদ: তা আবার বলতে! কতবার আমি ঠকেছি! মনে করেছি কী চমৎকার লাইন, কত স্বচ্ছন্দে এল, আর আপনার মন্তব্য তাদের ধূলিসাৎ করে দিল!

শ্রীঅরবিন্দ: স্বপ্নেও কত চমৎকার কবিতা লেখা হয়—যেমন অধিপ্রাকৃত (surrealist) কবিতা, (বললেন হেসে) অথচ কাগজে বসালেই মনে হয় কী বাজে! সেক্সপীয়রের কবিতা ত বন্যার মত নামত—কিন্তু চতুর্থ হেনরীতে নিদ্রাকে সম্বোধন করে যে চারটি লাইন আছে,

Wilt thou upon the high and giddy mast ইত্যাদি, এগুলো বাকি লাইনগুলির মধ্যে যেন জ্বলজ্বল করছে। এগুলো যে একেবারে সোজা উপর থেকে নেমে এসেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। অথবা তাঁর সেই লিরিকটি:

Take, O take those lips away-এ'র সমস্তটা উপর থেকে নেমে আসা।

এই সময় ডাঃ মণিলাল এলেন, আমাদের আলোচনা থামল। ভদ্রলোক খুব কবিতাভক্ত নন। এসেই তিনি শ্রীঅরবিন্দকে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলেন "How are you, sir ?" এটা তাঁর নিত্যকার কুশল জিজ্ঞাসা। শ্রীঅরবিন্দ উত্তরে কখনও শুধু হাসতেন, কখনও হাতটা তুলতেন, কখনও বা ডাক্তারকেই জিজ্ঞেস করতেন, "তুমি কেমন ?" মণিলালও কখনও মিষ্টি হাসতেন, কখনও "'Could not sleep well, sir, feeling better, sir' ইত্যাদি উত্তর দিতেন, গুরু-শিষ্যের এই দৈনন্দিন স্বাস্থ্যসংবাদ আমরা বেশ উপভোগ করতাম। মণিলালকে আসতে দেখলেই আমরা টিপ্পনী কেটে বলতাম, এই রে, গুরুর স্বাস্থ্য-জিজ্ঞাসা চলবে এবার! আর, আমরা দু'এক জন এগিয়ে আসতাম। ভদ্রলোকও আমাদের কৌতুক বুঝতে পারতেন ও হাসতেন। রসিক না হলেও তিনি সমজদার ছিলেন। গুরু তাঁকে নিয়ে বেশ ঠাট্টা মশকরা করতেন।

কিছুক্ষণ পরে মা এলেন এবং পাশের দ্বিতীয় বিছানার উপর বসলেন।

মণিলাল : মা, ছারপোকা, বিচ্ছু, মশা ইত্যাদি মারা কি পাপ ? আমি মশা মারতে পারি, কিন্তু ছারপোকা মারতে পারি না।

মা : কেন ? দুর্গন্ধের জন্যে ?

মণিলাল : বোধহয়। কিন্তু মারায় পাপ আছে কি ?

মা : (হেসে) শ্রীঅরবিন্দকে জিজ্ঞেস কর। আমি প্রথম যখন এখানে আসি, মশাদের যোগশক্তি দিয়ে তাড়িয়ে দিতাম, তাতে শ্রীঅরবিন্দ আপত্তি করতেন।

শ্রীঅরবিন্দ : তুমি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে বলে।

(হাস্য)

মণিলাল প্রশ্নটা আবাব জিজ্ঞেস করলেন।

শ্রীঅরবিন্দ : পাপ কাকে বলে ? যদি তুমি তাদের না মার, তারা গিয়ে অন্যদের কামড়াবে, তাতে তোমার পাপ হবে না ?

মণিলাল : কিন্তু তাদের যে প্রাণ আছে, স্যার—

শ্রীঅরবিন্দ : আছেই ত !

মণিলাল : তাদের যদি মারি ?

শ্রীঅরবিন্দ : বেশ, তাতে কি ?

মণিলাল : কেন ? পাপ হয় না ? অবশ্য আমি বলছি না আমরা বধ করি না, প্রতি শ্বাসে ত আমরা নানা বীজাণু বধ করছি।

মা : (হেসে) ডাক্তারেরা মারে না ?

মণিলাল : নিশ্চয়, মা, কিন্তু সে মারা তো ইচ্ছাকৃত নয়।

নীরদ : জৈনরা নাকি লোক ভাড়া করে এনে ছারপোকাকে তাদের রক্ত উপহার দেয়।

মণিলাল : ওসব গল্প।

শ্রীঅরবিন্দ : তবে একটা গল্পই শোন, ঐতিহাসিক গল্প। গজনীর মামুদ'শা যখন ভারত আক্রমণ করেন, তিনি এক জৈন রাজাকে তাব ভ্রাতার সাহায্যে পরাজিত করে' তাকে সিংহাসনে বসান এবং পুরান রাজাকে বন্দী করে তার তত্ত্বাবধানে রেখে যান। নূতন রাজা পড়ল মহা ফাঁপরে : সে ভাইকে নিয়ে কি করবে ? নিজে জৈন বলে' সে বধও করতে পারে না। অবশেষে সাব্যস্ত হল যে তার সিংহাসনের নীচে একটা গর্ত খুঁড়ে সেখানে রাজাকে পুঁতে মাটি ঢেলে দেওয়া হ'ক। তাতে রাজা মরল বটে, কিন্তু ভাই তাকে মারল না ত। (হাস্য)

মা: প্রকৃত জৈন হতে হলে যোগী হওয়া চাই। তখন যোগশক্তি দিয়ে এসব পোকামাকড়ের যথার্থ ব্যবস্থা করা যায়।

মণিলাল: ঠিক। কিন্তু মা, বিচ্ছু বা সাপ মারা কি করে উচিত হতে পারে?

শ্রীঅরবিন্দ: কেন নয়? আত্মরক্ষার্থে মারতেই হবে। আমি বলছি না যে তুমি যেখানে সাপ পাবে তাড়া করে বধ করবে। অন্যদের বা তোমার প্রাণ যখন বিপন্ন হবে তখন তোমার নিশ্চয় অধিকার আছে তাকে বধ করবার।

মা: গাছগাছড়ারও ত প্রাণ আছে। তুমি কি বলতে চাও যে মশার দাম গোলাপের চাইতে বেশি? চারাগাছের কেমন অনুভব শক্তি আছে তা বোধ হয় তুমি জান না।

নীরদ: কারো কারো মতে বিড়াল বা কুকুর মারা মানুষ মারার চাইতে কম অপরাধজনক।

নানা প্রশ্নের গোলমালে কথাটা চাপা পড়ে গেল, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের সজাগ কাণে তা পৌঁছেছে। গোলমাল থামলে তিনি বললেন, "তুমি কি বলছিলে? বিড়াল কুকুর মারায় মানুষ মারার চাইতে অপরাধ কম?"

মা: এ তো দেখছি বেশ মানব-হিতৈষী!

শ্রীঅরবিন্দ: প্রাণ প্রাণই, বিড়াল কুকুরের হোক্ বা মানুষের হোক্, এ নিয়ে বিড়াল কুকুর ও মানুষের মাঝে কোন তফাৎ নেই। মানুষই নিজের সুবিধার জন্যে তার মনোমত ধারণা সৃষ্টি করে।

এই সময় মা নিজের কাজে চলে গেলেন। আমাদের কাথাবার্তাও অন্য মোড় নিল; হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে আলোচনা সুরু হল। প্রত্যেকে

তার শোনা অভিজ্ঞতা থেকে হোমিওপ্যাথি ও তার অলৌকিক আবোগ্যের স্বপক্ষে নজির উপস্থিত করল। এমন কি, রাগ হিংসা, আধ্যাত্মিক নৈরাশ্যেরও নাকি প্রতিকার আছে এই শাস্ত্রে।

শ্রীঅরবিন্দ: বৈজ্ঞানিকদের মতে গ্লাণ্ড থেকে নিঃসৃত রসের দ্বারা নাকি বাগের উৎপত্তি হয়, ভালবাসাও নাকি তাই। কিন্তু (মৃদু হেসে) অহংব্যাধি সারাতে পারে কি হোমিওপ্যাথি ?

ডাক্তার স : (আগন্তুক, ইনি একজন সখের হোমিওপ্যাথ, তাঁর কথা আগে বলা হয়েছে) যদি পাবত, তাহলে আমি নিজেই তাব প্রথম রোগী হতাম।

মণিলাল : তুমি যে এ সম্বন্ধে সচেতন, তাতেই অর্ধেক বোগ সেবে গেছে। কি বলেন স্যাব ?

শ্রীঅববিন্দ: তা বলা যায না। কিন্তু ওটা হল প্রথম ধাপ।

নীবদ: দ্বিতীয়টি ?

শ্রীঅরবিন্দ: নিজেকে সব কিছু থেকে পৃথক করে নেওয়া। মনে কবা যেন সমস্ত জিনিষ তোমার বাইরের প্রকৃতির অংশ বা অন্য কারও ; এই ভাবে চলতে চলতে অন্তর-পুরুষ জাগে এবং প্রকৃতিব ক্রিযায় তাব অনুমোদন আস্তে আস্তে বন্ধ করে। ফলে, ব্যক্তিগত স্বভাবেব উপর প্রকৃতির আধিপত্য চলে যায় এবং আধ্যাত্মিক প্রভাব এসে তার স্থান নেয়। কিন্তু যদি স্বভাব বা প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে থাকে, তাহলে পুরুষ হয় তার দাস—অনীশ, সাক্ষী।

প্রকৃতির প্রেরণাকে প্রত্যাখ্যানও করতে পার, সেটা আরো জোবালো উপায়। এগুলি তোমাব ভিতর প্রবেশের পূর্বেই তাদের ঠেলে ফেলে দিতে হবে, আমার চিন্তার বেলায় যেমন আমি করেছি। এটা

আরো শক্তিশালী উপায়, ফলও আসে দ্রুত। আর একটা উপায়, মনের দ্বারা দমন করা। কিন্তু এখানে মন বশ করতে চায় প্রাণের স্বভাবকে। এতে যে লাভ, সেটা সাময়িক ও আংশিক প্রভুত্ব মাত্র; প্রবৃত্তিকে ভেতরে চেপে রাখা হয়, যে কোন সুযোগে সে ফেটে পড়তে পারে। এ রকম একটা ঘটনা শোন: একদিন কাশীর ঘাটে নাকি এক যোগী স্নান করছিল, নীচের ঘাটে স্নান করতে নেমেছে এক সুন্দরী কাশ্মীরী রমণী; দেখা মাত্রই যোগীটি তার উপর বলাৎকারের চেষ্টা করে। এটা পরিষ্কার মনের দ্বারা প্রকৃতি দমনের বিফলতার দৃষ্টান্ত।

কিন্তু যোগের ফলে মাঝে মাঝে অনেক কিছু নীচ থেকে ভেসে ওঠে, যার অস্তিত্বই হয়ত আগে টের পাওয়া যায়নি। বহু লোকের মুখে একথা শুনেছি। আমার বেলায়ও তাই হয়েছে: আমি একবার দেখলাম ক্রোধ নীচ থেকে উঠে এসে আমায় অধিকার করছে। কিছুতেই তাকে দমন করা গেল না। আমি নিজেই তাতে ভয়ানক আশ্চর্য হলাম, কেননা ক্রোধ ছিল আমার সম্পূর্ণ স্বভাববিরুদ্ধ। আর একবার যখন আমি আলিপুরে বিচারাধীন, এক সাংঘাতিক বিপত্তি ঘটবার মুখে থেমে যায়। কুঠুরীতে ঢুকবার আগে কয়েদীদের কিছুক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করা নিয়ম। আমরা তাই করছিলাম, একজন স্কচ কারারক্ষী কোত্থেকে এসে অকারণে আমায় একটা ধাক্কা দেয়, তাতে আমার দলের ছেলেরা ভয়ানক ক্ষেপে যায়। আমি কিছুই না করে তার প্রতি এমন এক রুদ্র দৃষ্টি হানলাম যে সে তৎক্ষণাৎ পালিয়ে গিয়ে জেলারকে ডেকে আনল। আমার এই ক্রোধকে বলা যেতে পারে সংক্রামক ক্রোধ (Communicative anger)। সমস্ত ছেলের দল তাকে মারতে উদ্যত হল। জেলারটা ছিল ধর্মপ্রবণ

লোক ; কারারক্ষী তাকে বলল যে আমি তাকে উদ্ধত দৃষ্টি দিয়েছি। জেলারের প্রশ্নের উত্তরে আমি বললাম যে এরকম অভদ্র ব্যবহারে আমি মোটেই অভ্যস্ত নই। জেলার সকলকে ঠাণ্ডা করে যাবার বেলায় বলল, "আমাদেব সবাইকে ক্রশ বইতে হবে।"

কিন্তু ক্রোধ আর রুদ্রভাব এক জিনিষ নয়। সে অভিজ্ঞতাও আমার কয়েকবাব হয়েছে।

নীবদ: রুদ্রভাব কি শ্রীবামকৃষ্ণেব সেই সাপের ফোঁসফোঁসের মত ?

শ্রীঅরবিন্দ: মোটেই না। এটা সত্যিকারের রাগ—প্রবল অন্যায় বা দোষেব বিরুদ্ধে ভীষণ কঠোবতায় তার প্রকাশ—যেমন শিবের রুদ্রভাব। রাগ হল ইন্দ্রিয়েব উত্তেজনা, সেটা ওঠে নীচের থেকে ; আর রুদ্রভাব ওঠে অন্তর হতে। উদাহবণ দিচ্ছি : ক একদিন মা'র বিরুদ্ধে ভীষণ মূর্তি ধাবণ কবে ভয়ানক চেঁচাতে লাগল। তার চীৎকার শুনে আমাব মাঝে এমন এক প্রচণ্ড কঠোরতা জেগে উঠল যা কিছুতেই দমন করা গেল না। আমি বাইবে এসে বললাম "কে, কে এমনভাবে মার প্রতি চীৎকার করছে ?" শোনামাত্র সে শান্ত হয়ে গেল।

নীবদ: সে নাকি ভযানক বদরাগী ছিল ?

শ্রীঅববিন্দ: তাই। এই দোষ ছাড়া, সে আন্তরিক সাধক ছিল, নানা বিষয় সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিল এবং সাধনায বেশ উন্নতি করেছিল। কিন্তু এই ভূত মাঝে মাঝে তাকে চেপে ধরত বলে সে কতকগুলি আসুরিক শক্তির কবলে পড়ে যেত। তখন সে কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারত না। এরাই ব্যর্থ কবেছে তার সাধনা। কারণ এখান থেকে চলে গিয়ে সে নাকি এদেব আক্রমণ থেকে মুক্ত হয়েছে। যখন এই

অপশক্তিগুলি তাকে চেপে ধরত, তখন তার অন্যায় সে বুঝতে পারত না ; মা'কে ও আমাকে দোষী সাব্যস্ত করত, যদিও তার প্রতি আমরা খুবই সদয় ও সহিষ্ণু ছিলাম। পরে যখন তার দোষ বুঝতে পারত, সেটা স্বীকার করে সে প্রতিজ্ঞা করত যে আর দ্বিতীয়বার তা করবে না। কিন্তু স্বভাব যাবে কোথায় ? দুষ্টশক্তিগুলি এসে আবার তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেত। মাঝে মাঝে তার দেমাক ও আত্মসম্মান এসে দোষ স্বীকারে বাধা দিত।

এটাই হল ভুল। নিজের দোষকে বা অন্যায় কাজকে কখনও সমর্থন করতে নেই বা ন্যায্য প্রমাণ করতে নেই। সেটা তখন বার বার ফিরে আসে এবং তাকে বর্জন করা কঠিন হয়ে পড়ে।

নীরদ: অমুক এতখানি তপস্যা করেও বলছে সে চলে যাবে, বার বছর পরে!

শ্রীঅরবিন্দ: কি তপস্যা ? তাকে যদি আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও কর্তৃত্ব দিতাম, তাহলে বোধ হয় সে থাকত।

নীরদ: সে নাকি মাকে তাঁর কাজে সাহায্য করছে।

শ্রীঅরবিন্দ: সাহায্য শুধু ? আমি ত ভেবেছিলাম সে-ই আশ্রম চালাচ্ছে।

নীরদ: কিন্তু এরাও ত একদিন ভগবানকে পাবে ?

শ্রীঅরবিন্দ: সবাই একদিন ভগবানকে পাবে। একজন মা'কে জিজ্ঞেস করে সে ভগবান লাভ করবে কি না। মা উত্তরে বলেন যে সে পাবে যদি না সে কোন বোকামি করে তার আয়ুশ্ছেদ করে। প্রায় তাই করেছিল সে।

১৪।১২।৩৮

সময় বিকেল ৫-৩০ মিঃ। সকলে চুপচাপ। শ্রীঅরবিন্দ বিছানায় শুয়ে। মণিলাল ধ্যান করছেন, আমি তাঁর পাশে বসে। শ্রীঅরবিন্দ মণিলালের দিকে তাকালেন। কিছুক্ষণ পরে আমি সশব্দে একটা মশা মারতে চেষ্টা করতে শ্রীঅরবিন্দ আমার দিকে তাকালেন। মণিলালের চোখ খুলল। আমি একটু লজ্জা ও কৌতুক বোধ করলাম আর মৃদু মৃদু হাসতে লাগলাম।

মণিলাল: তুমি যদি একটা মশা মারতে কামান দাগ...

নীরদ: (হেসে) তাহলে আমার ধ্যান নষ্ট হবে, না?

মণিলাল: ধ্যান কখনও নষ্ট হয় না। যাকগে, মা এলে আমরা ধ্যান করব আবার।

(শ্রীঅরবিন্দ ও সকলের হাস্য)

কথা উঠল থিয়সফি সম্বন্ধে।

মণিলাল: থিয়সফিষ্টরা নাকি 'মহাত্মাদের' কাছ থেকে বাণী লাভ করে?

শ্রীঅরবিন্দ: তাই বলে। মোরিয়া ও কুতুমী হল তাদের দুই মহাত্মা, ভুটানে হাজার বছরের বৃদ্ধ ঋষিদের সাথে বাস করে নাকি।

মণিলাল: আচ্ছা, স্যার **Blavatsky** সম্বন্ধে আপনার কি মত?

শ্রীঅরবিন্দ: উনি একজন অসাধারণ মহিলা, কিন্তু তাঁর লেখায় নানা কিছু মেশানো আছে।

মণিলাল: সত্যি নয়? আপনি তো কুতুমী সম্বন্ধে একটা কবিতাও লিখেছেন।

শ্রীঅরবিন্দ: কবির কল্পনা।

মণিলাল: আপনি কি Freemason ছিলেন, স্যার?

শ্রীঅরবিন্দ: আমি নয়, আমার বড় ভাই। তাতেই আমি বুঝতে পারলাম ওটা কি বস্তু। তবে প্রথম অবস্থায় ওতে বেশ খাঁটি জিনিষই ছিল।

Cagliostro-এর নাম শুনেছ? তিনি ছিলেন একজন মিষ্টিক Freemason; তাঁর ভবিষ্যৎ বলবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল, কিন্তু বিনিময়ে কোন টাকা নিতেন না। তাঁর অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল। প্রবাদ যে তিনি সোনা তৈরী করতে পারতেন! তিনি ফরাসী বিদ্রোহ, Bastille ধ্বংস, রাজারাণীর হত্যা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন; এমন কি ঘোড়দৌড়ের ফলাফলও বলতেন। তাতেই গোলমালে পড়েন। জেলে যেতে হয় এবং সেখানে মৃত্যু হয়। (কিছুক্ষণ পরে) Nostradamus-এর নাম শুনেছ? না? তিনি ছিলেন ঈহুদি। তাঁর সময় ঈহুদীদের অনেক বিদ্যা জানা ছিল। তিনি এক অপ্রচলিত ও দুর্বোধ্য ভাষায় বই লেখেন এবং তাতে কতগুলি ভবিষ্যদ্বাণী করেন। যেমন, প্রথম চার্লস-এর প্রাণদণ্ড, পর্তুগীজদের অসন্তোষ, বৃটিশ সাম্রাজ্য গঠন এবং তার প্রায় ৩৩০ বছর আয়ুষ্কাল ইত্যাদি।

নীরদ: সর্বনাশ! তাহলে ত এখনও ঢের দেরী!

শ্রীঅরবিন্দ: না, উপনিবেশ স্থাপন অর্থাৎ প্রথম জেমসের সময় থেকে গুনতে হবে। তাহলে সময় ঘনিয়ে এসেছে।

মণিলাল: চেম্বারলেনের আজকের উক্তি থেকে সেই রকমই

অনুমান হয়। বলছে ফ্রান্সের সাথে আর কারও যুদ্ধ বাধলে ইংরেজরা নাকি তার পক্ষ নিতে বাধ্য নয়।

শ্রীঅরবিন্দ: ইংরেজ বরাবর রাজনীতিতে নিজের রাস্তা খোলা রাখে, যাতে তার নিজের সুবিধার পথ বেছে নিতে পারে।

মণিলাল: কিন্তু জার্মাণী বা ইতালীর সাথে ত যোগ দিতে পারে না ?

শ্রীঅরবিন্দ: কেন পারে না ? ফ্রান্সের উপনিবেশগুলোতে ভাগ বসাতে পারে ত ?

এই সময় মা এলেন। আমরা শ্রীঅরবিন্দের বিছানার কাছেই একটু নড়ে চড়ে বসলাম যাতে মার কথাও শোনা যায়। মা বললেন, নড়োনা, নড়োনা।

মণিলাল: মা, আমরা স্থির করেছি যে, আপনি এলে আপনার সাথে আমরা ধ্যান করব। (সকলেব হাস্য)

মা তাঁর চোখদুটি বড় বড় করলেন, পরে বললেন, আর আমি যদি তোমাদের কথাই শুনতে চাই ?

মণিলাল: তাহলে আমরা কথাই বলব।

শ্রীঅরবিন্দ: (মার উদ্দেশ্যে) আমি ডাক্তারকে Cagliostro ও Nostradamus-এর ভবিষ্যদ্বাণীর কথা বলছিলাম। সে তাদের নামই শোনেনি।

তারপর বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে কথা উঠল, লোকনাথ বলে কোন এক ইতালীয় ভিক্ষুর প্রসঙ্গে। আমি বললাম, লোকনাথ কি করে আমার খোঁজ পায় এবং আমায় স্বধর্মে ফিরে যেতে চিঠি লেখে। কিন্তু তার যুক্তিতে কোন আগামাথা ছিল না।

শ্রীঅরবিন্দ: সব প্রচারকই যুক্তিহীন। তুমি কি খুব নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ ছিলে? তোমাদের দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব খুব?

নীরদ: বৌদ্ধ মাত্র ২।১ লক্ষ, কিন্তু আসল ধর্মের কোন চিহ্ন নেই।

মা: উত্তর না দক্ষিণ বৌদ্ধধর্ম?

নীরদ: দক্ষিণ।

মা: চীন জাপানেও ধর্মের কোন চিহ্ন নেই, আছে শুধু অনুষ্ঠান। সিংহলে নাকি এখনো প্রকৃত ধর্ম বজায় রয়েছে।

নীরদ: বর্মা দেশেও একই অবস্থা, যদিও ভিক্ষুদের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা আছে।

মণিলাল: রং এর প্রতি ভক্তি, সত্যের নয়।

শ্রীঅরবিন্দ: লেলেও রং এর মর্যাদা দেন। একবার লেলে ও ভ'র সঙ্গে যখন আমার সাক্ষাৎ হয়, লেলে বললেন, 'কি, তুমি ওকে প্রণাম করলে না যে?' আমি বললাম, 'লোকটার প্রতি আমার শ্রদ্ধা নেই।' তিনি বললেন, 'কিন্তু গেরুয়ার মর্যাদা দেবে না তুমি?'...

মা ধ্যান করছেন দেখে আমরা সবাই চুপ হয়ে গেলাম। প্রায় ৭ টায় মা চলে গেলেন। আমরাও শ্রীঅরবিন্দের পাশে ঘুরে বসলাম।

শ্রীঅরবিন্দ: (নীরদকে) তুমি যেন ধ্যানে আনন্দের স্পর্শ পেয়েছ। তোমার মুখ বেশ জ্বলজ্বল করছে।

মণিলাল: হাঁ, স্যার। আজকাল ওর চেহারা আনন্দে ভাসে।

নীরদ: (লজ্জিতভাবে) আমি তো গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়েছি মনে হল। কিন্তু ওর মধ্যে নানা ধরনের 'দর্শনও' হল, সেগুলো যেন বাইরের।

শ্রীঅরবিন্দ: তাহলে ঘুম বলছ কেন? তোমার চৈত্যপুরুষ বা অন্তরপুরুষ দেখছে কি কি ঘটছে। আরো গভীরে ডুবে গেলে বাইরের চেতনার কিছুই মনে থাকে না, তবে অনেক কিছু সেখানে ঘটতে থাকে। যাকে স্বপ্নহীন ঘুম বলা হয়, আসলে তা নয়। বহু স্বপ্ন দেখা হয়, শুধু তার স্মৃতি থাকে না। সে অবস্থায় নানা সমস্যার সমাধান মেলে, ভাগবত মিলনের আনন্দ লাভ হয়, তোমার সত্তার কোন অংশ অন্যান্য লোকে বিচরণ করতে পারে, অন্যান্য সত্তাদের সাক্ষাৎ মেলে ইত্যাদি। এটা অবশ্য প্রথম ধাপ, সমাধির আরম্ভ বলতে পার।

তোমার বর্ণনা শুনে মনে হচ্ছে এটা তোমার আন্তর পুরুষের অভিজ্ঞতা, চৈত্যপুরুষের নয়। তবুও তোমার মুখ যে আনন্দে ভাসছে তাতে কোন সন্দেহ নেই; সেজন্য বললাম তুমি ভিতরে ডুব দিয়েছিলে।

নীরদ: এ অবস্থায় কি রোগের নিদানও পাওয়া যায়?

শ্রীঅরবিন্দ: অবশ্যই। বহু লোকের নজির আছে যে এ অবস্থায় তারা তাদের সমস্যার সমাধান পেয়েছে। আমার নিজের এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা মনে আছে। আমি যখন ধ্যানাবস্থায়, তখন দেখি, নানা লেখা আমার মাথার উপর দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে ফাঁক, আবার লেখা, এমনিভাবে চলল—অথচ আমি ধ্যানে মগ্ন, ওদিকে আমার কোন দৃকপাত নেই।

(মণিলালের প্রতি) এখন, তোমার ধ্যানের কি খবর?

মণিলাল: মোটেই সুবিধের নয়, স্যার!

শ্রীঅরবিন্দ: সে কি? আমি দেখলাম কী ভয়ানক দৃপ্ত তোমার চেহারা, যেন দৃঢ় সংগ্রামে ব্রহ্মের দিকে এগিয়ে চলেছ।

মণিলাল: অসংখ্য চিন্তা এসে আমায় আক্রমণ করে। তাদের তাড়িয়ে নিজেকে শূন্য করতে চেষ্টা করি।

শ্রীঅরবিন্দ: ফল হয় শূন্য? (হাস্য)

নীরদ: কিন্তু এটাও ধ্যান ত?

মণিলাল: মোটেই না। ভিতরে ডুবতে পারলাম না, কোন চাপ অনুভব করলাম না, কি করে ধ্যান হবে? এটা কি ধ্যান, স্যার?

শ্রীঅরবিন্দ: ধ্যানের সুরু, প্রথম অবস্থা। আগে মনকে নিশ্চল করতে হবে, তাহলে উপরের জিনিষ নামতে পারবে। কিন্তু তুমি ধ্যানকে হুকুম করবে না যে তোমার এই চাই বা ওই চাই। সে যা তোমায় দেয়, তাই গ্রহণ করবে। তোমায় কি ধ্যানের চেষ্টা করতে হয়?

মণিলাল: সব সময় নয়, স্যার। আপনি তো জানেন ধ্যান কখনও হঠাৎ আপনি এসে আমায় বসিয়ে দেয়। কিন্তু আমার ধারণা কি ঠিক স্যার?

শ্রীঅরবিন্দ: কি সম্বন্ধে?

মণিলাল: এই যে বললাম আমার চিন্তাগুলি তাড়িয়ে দিয়েছি?

শ্রীঅরবিন্দ: (হেসে) সে ত তুমিই বলবে। আমি কি করে জানি? আমি তোমার বক্তব্যের উপর টীকা করেছি মাত্র।

মণিলাল: আপনি জানেন না? আমাদের ধারণা আপনি সর্বজ্ঞ।

শ্রীঅরবিন্দ: তা বলে তুমি কি মনে কর জেলেরা কত মাছ ধরেছে, তার মূল্য কত, সবই আমি জানি? লোকেরা আমায় জিজ্ঞেস করত তুলার দাম চড়বে কি না, কোন ঘোড়া জিতবে, তাদের হারানো ছেলে ফিরে পাবে কি না ইত্যাদি। এ সব জেনে কি হবে? সেই সন্ন্যাসীর

নদী পার হওয়া সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের গল্প জান ত? অবশ্য দরকার হলে স্বপ্নসমাধিতে এসব জিনিষও জানা যায়। তাছাড়া, এসব ত এখন আমার কাজ নয়, মার হাতে এগুলি ছেড়ে দিয়েছি। দূরের কথা তিনি শুনতে পান, স্বপ্ন-জগতে সাধকদের সাথে সাক্ষাৎ করেন, কথা বলেন। এই ইউরোপের গত গোলমালে কি ঘটবে তিনি অবিকল দেখতে পেয়েছেন। আমাদের কাজের পক্ষে যা প্রয়োজন, আমরা তা জানি।

নীরদ: কিন্তু আমি যখন কোন রোগীর অবস্থা বা নিদান সম্বন্ধে আপনার মত চাইতাম, আপনি চুপ করে থাকতেন কেন?

শ্রীঅরবিন্দ: সেটা তোমার কাজ, আমাদের দিয়ে করাতে চাও কেন?

নীরদ: সে ত অন্য জিনিষ, কিন্তু আপনি বলতেন যে আপনার ভেতর প্রচ্ছন্নভাবেও ডাক্তারের নামগন্ধ নেই বলে (latent medico) আপনি জবাব দিতেন না। আমার ধারণা আপনার সম্বোধির দ্বারা আপনি বলতে পারেন, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ জ্ঞান না থাকলেও।

তখন সম্বোধি সম্বন্ধে আমাদের নানা কথা হল, কি করে ঘুমে ডাক্তারেরা রোগের নিদান পায়, মার আমার প্রতি উপদেশ—সম্বোধি লাভ করতে হলে মনকে স্তব্ধ করা ইত্যাদি।

শ্রীঅরবিন্দ: (মণিলালকে) আমি তোমায় বলছিলাম যে, আমাদের যা জানা দরকার তা আমরা জানতে পারি। কিন্তু জানা সব সময় ভাল নয়। ধর, আমি যদি জানতে পাই যে একটা কিছু ঘটবে, তখন তাতেই আমি বাঁধা পড়ি এবং ফল আমার ইচ্ছার বিপরীত হলেও আমায় তা গ্রহণ করতে হয়। তার থেকে বড় কিছু বা অন্য কিছু পাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং নিজেকে আমি মুক্ত রাখতে চাই যাতে নানা

সম্ভাবনার পথ খোলা থাকে। অতিমানসের নীচে সবই হল সম্ভাবনার রাজ্য। কাজেই আমি স্বাধীন থাকলে গ্রহণ বা বর্জন আমার উপর নির্ভর করবে। নিয়তি স্থির নির্ধারিত জিনিস কিছু নয়, তা' হল নানা শক্তির সমাবেশ ; তাকে বদলান যায়।

নীরদ: কিন্তু না জানলে কাজ করব কি করে? জানার পর কি প্রত্যাখ্যান করা যায় না?

শ্রীঅরবিন্দ: জ্ঞান আসে সম্বোধি হতে। প্রত্যাখ্যান করা যায়, কিন্তু ফল খুব নিশ্চিত নয়। তবে অসাফল্য তোমায় পরবর্তী সাফল্যের পথ দেখাতে পারে বটে।

মণিলাল: আপনি আগষ্টের আলাপে বলেছেন আপনি প্রাকৃতিক মৃত্যু জয় করেছেন, কিন্তু দুর্ঘটনার উপর আপনার হাত নেই?

শ্রীঅরবিন্দ: (আশ্চর্যভাবে) কখন, কি বলেছি আমি?

নীরদ: আমায় যেন আপনি লিখেছিলেন যে কোন অসুখ আপনার জীবন ছেদ করতে পারবে না, কিন্তু দুর্ঘটনার কথা বলা যায় না।

শ্রীঅরবিন্দ: ওঃ! অসুখ ত সাধারণত অনেক দিন ধরে চলে, কাজেই তার উপর ক্রিয়ার সময় থাকে। তবে এমন অসুখ যদি থাকে যেগুলো হঠাৎ সাংঘাতিক রূপ নেয়, তাহলে তাদের প্রতিকার সম্ভব নয়। আর দুর্ঘটনা সম্বন্ধে, শরীরের নিজস্ব বোধ আছে এবং সর্বদা সে সজাগ, কিন্তু মন যদি অন্য ব্যাপারে ব্যস্ত থাকে, তখন দুর্ঘটনা অতর্কিতে ঘটে যায়। কোন প্রচণ্ড উৎপাত হলে—যেমন দাঙ্গা—তখন আত্মরক্ষার্থে আমায় ৫।৬ দিন একাগ্র-মনঃসংযোগ (concentrate) করতে হয়।

বিরুদ্ধ শক্তিরা "দর্শন" ইত্যাদি ব্যাপারে বাধা দেবার চেষ্টা করেছে

কিন্তু তাদের সমস্ত আক্রমণ ব্যর্থ করতে পেরেছি। এবার মায়ের রক্ষার জন্যে আমি বেশি ব্যস্ত ছিলাম বলে নিজের কথা ভুলে গেছি। তাছাড়া আমি ভাবিনি যে তারা আমায় আক্রমণ করবে; সেখানেই হল আমার ভুল। আশ্রম সম্বন্ধীয় ব্যাপারে আমাদেব অসাধারণ সাফল্য হয়েছে, কিন্তু যখন পৃথিবীর ব্যাপারে কাজ করতে গেছি তখন ফলের তারতম্য হয়েছে। স্পেনের মাদ্রিদে চমৎকার ফল পাওয়া গেছে, জেনারেল **Miaja** অদ্ভুত যন্ত্র ছিল বলে। শক্তিব কাজ নির্ভব করে যন্ত্রেব উপর। তেমনি **Basque**-এ হল ব্যর্থতার চরম। **Negus** যন্ত্র হিসাবে ভালই ছিল, কিন্তু তার সহকারীরা ভাল যোদ্ধা হলেও তাদেব কোন সংহতি ছিল না, যন্ত্রবলও ছিল সামান্য। **Egypt**এ সুফল হয়নি, তবে **Ireland** আব **Turkey**তে দারুণ সুফল হযেছে। বাংলাতে আমি যা করতে চেয়েছি, **Ireland**এ ঠিক তাই কবেছি। তুর্কীরা জাত হিসাবে খুব চুপচাপ।

নীবদ: এই যে যুদ্ধটা হবার মুখে হঠাৎ থেমে গেল, আপনিই তার কারণ?

শ্রীঅববিন্দ: হাঁ, নানা কারণে যুদ্ধটা তখন অভিপ্রেত ছিল না।

নীরদ: কিন্তু বড় জাতগুলোর মানটা যে গেল।

শ্রীঅববিন্দ: তাতে কি এসে যায়?

মণিলাল: চীন জাপান যুদ্ধ সম্বন্ধে আপনার মত কি?

শ্রীঅরবিন্দ: আমার কাছে দুইই সমান: ছয় আর আধ-ডজন। দুইই বস্তুতান্ত্রিক; কিন্তু বাছতে হলে জাপানই আমার পছন্দ। জাপানের এক সময় একটা আদর্শ ছিল। জাপানীদের স্বদেশপ্রেম, ত্যাগ,

আত্মাহুতি, নীরবতার অদ্ভুত পরিচয় পাওয়া যায়। কারও সামনে তারা কখনও রেগে উঠত না, যদিও পরে হয়তো ছুরি বসাত। এমন নীরবে ও গোপনে তারা কাজ করে যে রুশজাপানের যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তেও কেউ তার আভাস পায়নি। হঠাৎ যুদ্ধ দেখা দিল। তারা ক্ষত্রিয়; তাদের সৌন্দর্যজ্ঞান ত প্রবাদবাক্য। কিন্তু ইউরোপের প্রভাব সমস্ত কিছুই নষ্ট করে দিয়েছে। তারা কি রকম পাশবিক হয়ে উঠেছে দেখ। এটা একেবারে অ-জাপানী। আগে শত্রুকে তারা সহানভূতির চোখে দেখত, কিন্তু এখন! জাপানী সান্ত্রী সেদিন ইউরোপীয় অফিসারদের ঘুষি মারল—আমি বলছি না যে এটা তাদের উচিত প্রাপ্য হয়নি—জাপানী সেনাপতি চাং ক্যাইশেককে 'মল্লযুদ্ধে' আহ্বান করল। এই ধরনের আস্ফালন মোটেই জাপানীরীতিসম্মত নয়।

নীরদ: কিন্তু নৃশংসতা ছাড়া—অর্থাৎ নির্দোষ দেশবাসীদের মারা—যুদ্ধ জয় কঠিন হত না কি?

শ্রীঅরবিন্দ: ভগবান জানেন! তারা এমন চমৎকার যোদ্ধা, দেশপ্রেমিক ও আত্মবলিদানে অভ্যস্ত যে উল্টোটাই বিশ্বাস করতে বাধে না। কিন্তু এটা হয়েছে বোধ হয় দুটো কারণে: প্রথম, তাদের অর্থাভাব—এটা খুব বিশ্বাসযোগ্য নয়, কেননা তাদের আত্মত্যাগের ক্ষমতা অসীম। দ্বিতীয়, চীনের লোকসংখ্যা।

মণিলাল: চীনের প্রতি সোভিয়েট সাহায্য?

শ্রীঅরবিন্দ: সম্ভব; কিন্তু সোভিয়েটের ভিতরের অবস্থা এমন পাকা নয় যে অন্যকে সাহায্যের কথা ভাবতে পারে।

মণিলাল: ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে আপনার কি মত? দেশ কি আপনার ঈপ্সিত পথে চলেছে?

শ্রীঅরবিন্দ : নিশ্চয় না। ভারতবর্ষ চলছে ইউরোপীয় সোশিয়লিজমের দিকে। এটা তার পক্ষে মারাত্মক। আর আমরা চেষ্টা করছিলাম জাতির অন্তরাত্মার রূপ ফুটিয়ে দিতে তারই বিশিষ্ট ধারায়, সকলের স্বাধীনতার প্রয়াসে। বাংলার আন্দোলনের কথা ভাব : সমস্ত জাতি কেমন অল্প সময়ের মাঝে জেগে উঠল ; যারা ছিল অত্যন্ত ভীরু, রিভলভার দেখলে কাঁপত, তারা দেখতে দেখতে এমন বদলে গেল যে পুলিশ সাহেবরা বলত—সেই উদ্ধত বরিশাল-দৃষ্টি! জাতির আত্মাই উঠেছিল জেগে এবং দেখা দিয়েছিল চমৎকার কতগুলি মানুষ। আন্দোলনের নেতারা ছিল যোগী অথবা যোগীর শিষ্য। মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা ছিল বিজয় গোস্বামীর শিষ্য।

নীরদ : তিনি কি স্বদেশী ছিলেন?

শ্রীঅরবিন্দ : বল কি? সে ছিল আমার সহকর্মী এবং গুপ্ত দলের একজন। তারপর, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতি। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের শক্তি ছিল পিছনে। আন্দোলন তার গুপ্তদলসহ এমন সাংঘাতিক হয়ে উঠেছিল যে রাজনীতি যেখানে মজ্জাগত এমন অন্য যে কোন দেশে সেটা ফরাসী বিদ্রোহের রূপ নিত। সমস্ত জাতের সহানুভূতি ছিল আমাদের দিকে। দোকানদারও "যুগান্তর" পড়ত। একটা উদাহরণ দিচ্ছি : একজন যুবক শ্যামবাজারের পুলিশ কর্মচারীকে মেরে যখন পালিয়ে যাচ্ছিল, তার হাতের রিভলভার ফেলে দিতে ভুলে যায়। এক দোকানদার তা দেখে চীৎকার করে বলে ওঠে, রিভলভার লুকিয়ে ফেল, রিভলভার লুকিয়ে ফেল। তারপর জানই ত, যতীন মুখার্জির কথা?

মণিলাল : হাঁ, স্যার।

শ্রীঅরবিন্দ : অদ্ভুত লোক! সমগ্র মনুষ্যজাতির মধ্যে একেবারে

প্রথম শ্রেণীর পুরুষ। সৌন্দর্যের আর তেজের এমন সমন্বয় আমি দেখিনি। দেহের গড়নও যোদ্ধার মত। পুলিন দাস—

নীরদ: পুলিন দাস নাকি spy—

শ্রীঅরবিন্দ: Spy? আমি বিশ্বাস করি না। সে বদলে গিয়ে মডারেট হতে পারে, কিন্তু spy নয়। এরাই ছিল তখনকার নেতা, আর এখন? দেখ বাংলার অবস্থা।

নীরদ: গান্ধি আন্দোলন সম্বন্ধে আপনার মত কি?

শ্রীঅরবিন্দ: গান্ধি দেশকে স্বাধীনতার পথে অনেকখানি অগ্রসর করেছেন, কিন্তু তাঁর আন্দোলন কাজ করেছে দেশের উচ্চ মধ্যবিত্তদের মাঝে, আর আমাদেরটা নিম্ন মধ্যবিত্তদের মাঝেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

নীরদ: তাঁর আন্দোলন বিদ্রোহের প্রভাব খর্ব করেছে নয় কি?

শ্রীঅরবিন্দ: হাঁ।

নীরদ: Anderson-ই তো শেষে এই আন্দোলন ধ্বংস করল?

শ্রীঅরবিন্দ: নিশ্চয়ই নয়। যে শক্তি পেছনে ছিল, তা সরে গেল। ফলে, সে রকম নেতার আবির্ভাব হল না, এবং লোকজনের মাঝে দেখা দিল নানা দোষ।

নীরদ: এই যে শেষ *সন্ত্রাস-আন্দোলন*, এটা কি ১৯০৫ সালের আন্দোলনের পরিণতি?

শ্রীঅরবিন্দ: হাঁ, তারই জের।

নীরদ: যুদ্ধের সময় বিদ্রোহীদল বোধ হয় ইংরেজের মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে প্রলুব্ধ হয়েছিল?

শ্রীঅরবিন্দ: প্রলুব্ধ হ'বার পাত্র ওরা নয়।

নীরদ: গান্ধি দেশের লোকেদের খুব সাহস ও শক্তি দিয়েছেন

বলতে হবে। বাঙালীরা কি রকম পুলিশের লাল পাগড়ীর ভয়ে কাঁপত! আমার মনে হয় গান্ধি তাদের সে ভয় ভেঙেছেন।

শ্রীঅরবিন্দ: বাংলার কি তা প্রয়োজন ছিল?

মণিলাল: চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে আপনার কি মত?

শ্রীঅরবিন্দ: পুরোনো দলের সে-ই হল শেষ বাতি। সে যখন এখানে এল ও আমার শিষ্য হতে চাইল, আমি বললাম যতদিন রাজনীতিতে থাকবে ততদিন যোগ সম্ভব হবে না। তাছাড়া তার শরীরও ভেঙ্গে পড়েছিল; আমি কিছুটা সারালেও ফিরে যাওয়ার পর পুনরায় পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হল। ওদিকে আবার অনুকূল ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করল।

১৫।১২।৩৮

মা এসেছেন। ডাঃ সাবুরও আজ উপস্থিত।

নীরদ (ডাঃ সাবুরকে): আপনারা হেমিওপ্যাথির ওষুধ নির্বাচন করেন কি করে? সম্বোধির দ্বারা? কিন্তু সম্বোধি যে ঠিক হয়েছে সেটা বোঝেন কি করে?

সাবুর: সম্বোধি তাকেই বলে যা যুক্তির দ্বারা পাওয়া যায় না। কাজেই সম্বোধি ভুল হতে পারে না।

নীরদ: আপনি আমায় বলেছিলেন যে র-এর সম্বোধি হল মনের স্তরের। তাহলে কি সম্বোধির নানা স্তর আছে?

শ্রীঅরবিন্দ: মানস-সম্বোধি (mental intuition) অর্থে এই

বলতে চাই যে সম্বোধি নেমে আসে উর্ধ্ব জগৎ থেকে, কিন্তু মনের বস্তুতে মিশে যায়। তা বলে মনে করো না সেই সম্বোধি ঠিক হতে পারে না; তবে সব সময় হয় না, এই মিশ্রণের ফলে। প্রাণের সম্বোধিও আছে, সেটা প্রায়ই মিশে যায় আমাদের কামনা বাসনার সাথে।

নীরদ: কি করে একে পাওয়া যায়? মনকে শান্ত করে?

শ্রীঅরবিন্দ: তা যথেষ্ট নয়, মনকে নীরব হতে হবে।

নীরদ: সে তো অনেকদিনের ব্যাপার।

শ্রীঅরবিন্দ: বলা যায় না। কমও হতে পারে, বেশিও।

নীরদ: আত্ম-দর্শন হবার আগে কি মনকে নীরব করা যায়?

শ্রীঅরবিন্দ: শিক্ষা দিয়ে মনকে তৈরী করা যায়।

★

কতক্ষণ ধ্যানের পর মা চলে গেলেন। সাবুরও।

মণিলাল ধ্যান করছেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দিকে দু' একবার তাকালেন। আমি তখন সাহস করে বলে উঠলাম, "ডাঃ মণিলাল আজ ধ্যানে কিছু পেয়েছেন।. চেহারা খুব উজ্জ্বল।"

মণিলাল: না, স্যার, ধ্যান ভাল জমেনি, আমার কোমরের ব্যথার জন্যে। কিন্তু পিঠের দিকে সামান্য স্পন্দন অনুভব হওয়াতে বেশ ফূর্তি লাগল।

নীরদ: ওটা তাহলে কুণ্ডলিনী—

মণিলাল: কুণ্ডলিনীতে আমি বিশ্বাস করি না। এই স্পন্দনটা কি শক্তির ক্রিয়া, স্যার?

শ্রীঅরবিন্দ: হাঁ, তোমার **lumbago** সারাতে চেষ্টা করছে হয়ত। তার প্রথম লক্ষণ হল তাকে কিছু বাড়িয়ে দেওয়া।

(হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার উপর এই টিপ্পনীতে আমরা হেসে উঠলাম) তুমি কুণ্ডলিনীতে বিশ্বাস কর না?

মণিলাল : না, স্যার।

শ্রীঅরবিন্দ : কিন্তু তুমি বলেছিলে তোমার চেতনায় ওঠানামার অভিজ্ঞতা হয়?

মণিলাল : ওটা কি কুণ্ডলিনী? আমি তো জানতাম না! (হাস্য)

কিন্তু কুণ্ডলিনী ত আমাদের যোগের ধারা নয়। আপনি ত কোথাও তার উল্লেখ করেন নি?

পুরাণী : করেছেন বই কি! 'যোগের পথে আলো' বইতে আছে।

শ্রীঅরবিন্দ : কুণ্ডলিনী হল তন্ত্রের সাধনা। শক্তি মূলাধারে জট পাকিয়ে ঘুমিয়ে আছে; সে যখন জাগে চেতনাকে তুলে নিয়ে উপরের দিকে উঠতে থাকে ; সমস্ত চক্র খুলে খুলে ব্রহ্মরন্ধ্রে গিয়ে পৌঁছে এবং সেখানে ব্রহ্মের সাথে তার মিলন হয়। . এটা হল আরোহণ, পরে সুরু হয় অবতরণ। তন্ত্রের প্রণালী হল আরও জটিল।

শক্তির কাজ নানাক্ষেত্রে নানা ধরনের ; দেখতে বেশ মজা লাগে। কেউ কেউ অনুভব করে যেন তার মাথাটা কোন যন্ত্র দিয়ে ড্রিল করা হচেছ্। আবার কেউ দোলে, শব্দ করে, শক্তিকে ধরে রাখতে পারে না যেন। কখনও বা শক্তি নীচের ময়লা উপরে তোলে তাদের শোধরাবার জন্যে। একজনের কথা আমার মনে আছে, সে প্রবল উৎসাহে প্রাণায়াম করত আর বিকট শব্দ করত। কোন ভাল ফল পেয়েছে বলে আমি শুনিনি।

শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা

১৮-১২-৩৮

সময় আন্দাজ ৪-৩০ মিঃ। আমি, সত্যেন্দ্র, ডাঃ বেচারলাল ও চম্পকলাল উপস্থিত। এসব কথাবার্তা যদিও মণিলাল আর আমিই বেশির ভাগ চালাচ্ছি, অন্যদের দেখা পরে মিলবে। যে কারণেই হোক, প্রথম দিকে আমাদের অংশই ছিল অধিক।

আমি 'হিন্দু' কাগজটি শ্রীঅরবিন্দকে পড়ে শোনালাম। পরে, Asia নামক এক আমেরিকান কাগজে "শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর যোগ" সম্বন্ধে লেখাটা পড়লাম, লেখক নিখিলানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কেউ শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে লিখেছেন দেখে আমার জানতে কৌতূহল হল উনি কে।

শ্রীঅরবিন্দ: সে হল নিষ্ঠার (Miss Wilson, প্রেসিডেন্ট Wilson-এর মেয়ে) বন্ধু। নিষ্ঠাই এখানে আসার আগে তাকে দিয়ে লিখিয়েছে। (কিছুক্ষণ থেমে) সমস্ত জিনিষের উপর এরা কি রকম মজার আমেরিকান ছাপ দেয়!

নীরদ: এদের মন দেখছি বেশ খোলামেলা।

শ্রীঅরবিন্দ: নূতন জাত কিনা! অতীতের কোন সংস্কার বা শিক্ষার বালাই নেই যে তাদের বেঁধে রাখবে। France আর Czechoslovakiaও খোলা; তাদের অনেকে যোগ করতে চায়, লিখছে।

নীরদ: নিষ্ঠার সাথে কি আপনাদের পূর্বে যোগাযোগ ছিল?

শ্রীঅরবিন্দ: নিশ্চয়। তিন চার বছর ধরে সে চিঠিপত্র লিখছে। যোগ সম্বন্ধে তার ধারণা পরিষ্কার, অভ্যাসও করছে।

এই সময় মণিলাল এলেন এবং আমাদের আলাপ শুনে বললেন, দর্শন না হওয়াতে (শ্রীঅরবিন্দের দুর্ঘটনার জন্যে) তিনি নিশ্চয় খুব নিরাশ হয়েছেন ?

শ্রীঅরবিন্দ : না, সে বরং যোগীব মতই ঠিকভাবে নিয়েছে ; অন্যেরা তা পারেনি।

মণিলাল : আচ্ছা, তিলকের সাথে আপনি এতদিন কাজ করেছেন, বরোদায়ও বহুদিন ছিলেন, তবুও এখানে মহারাষ্ট্রের লোক এত অল্প কেন ?

শ্রীঅরবিন্দ : কি জানি ! অদ্ভুত বটে। তবে ওদের প্রকৃতি বেশি রাজসিক। এখানে অবশ্য বাঙালী, গুজরাটি ও মাদ্রাজীর সংখ্যাই বেশি ; এখন অন্যান্য দেশের লোকও আসছে—পাঞ্জাবী, বিহারী, হিন্দী ইত্যাদি।

মণিলাল: আশা করি, অতিমানসের গৌরবময় দিনগুলি দেখবার সৌভাগ্য হবে আমাদের। অতিমানস কবে নামবে, স্যার ?

শ্রীঅরবিন্দ: (চুপ করে থেকে) কি করে সে নামবে ? যতই কাছে আসে, ততই নীচের বাধা প্রতিবন্ধক বেড়ে ওঠে।

মণিলাল : বরং মাধ্যাকর্ষণশক্তির উচিত তাকে টেনে নামিয়ে আনা।

শ্রীঅরবিন্দ : তোমার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এখানে অচল। কারণ উপরে ওঠা হল তার স্বভাব। তা সত্ত্বেও যখন সে নামে, বিপুল বাধা-প্রতিবন্ধক তাকে অতিক্রম করতে হয়।

মণিলাল : আপনি কি অতিমানস লাভ করেছেন ?

শ্রীঅরবিন্দ: জান ত, আমি নীরদকে অতিমানসের লেজ সম্বন্ধে কি কি বলছিলাম ? অতিমানস কি, আমি জানি ; শরীরচেতনায় তার

আভাস-ইঙ্গিতও পেয়েছি, এখন অধিমানসকে অতিমানসে পরিণত করতে চেষ্টা করছি। অতিমানস যে কাজ করছে না তা নয়, কিন্তু করছে অধিমানসের মাধ্যমে। সম্বোধি ও অন্যান্য মধ্যবর্তী শক্তিগুলি নেমে এসেছে। অতিমানস হল অধিমানসের ওপরে (হাতদুটি উপরোপরি রেখে শ্রীঅববিন্দ দেখিয়ে দিলেন), কাজেই একটিকে অন্যটি বলে ভুল করা সম্ভব। আমার সেদিনের কথা মনে আছে, যেদিন এখানে কেউ কেউ অতিমানস সিদ্ধি লাভ করেছে বলে গর্ব করছিল। আমারও সে ভুল হয়েছে, যখন আমি উপরের নানা স্তর সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। বিবেকানন্দই প্রথম আলিপুর জেলে এসে আমার ধ্যানের সময় আমায় সম্বোধিস্তর দেখিয়ে দেন এবং প্রায় মাসাবধি সম্বোধি সম্বন্ধে শিক্ষা দেন। পরে, তার উর্ধ্বের স্তরের দৃষ্টি পাই। অতিমানসের ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে বা সামান্য চমকে আমি তুষ্ট নই, আমি চাই অতিমানসের সমগ্র বিপুল বস্তুপিণ্ড। সেটা অত্যন্ত শক্ত ব্যাপার।

মণিলাল: আমরা শুনেছি যে কয়েকজন বাছা বাছা লোক আগে অতিমানস লাভ করবে?

শ্রীঅরবিন্দ: বাছাই করবে কে?

মণিলাল: অতিমানস, স্যার।

শ্রীঅরবিন্দ: (হেসে) তাহলে তার হাতেই সেটা ছেড়ে দাও। যা' সত্য, তাই সে করবে, কেননা অতিমানস হল ঋতচিৎ। আমাদের চেতনায় সেইই নানা জিনিষ প্রতিষ্ঠা করায়। সুতরাং তখন তোমার হৃত শান্তি, আনন্দের জন্য আর কোন আপশোস, অভিযোগ থাকবে না। কারণ অতিমানসের কৃপায় সেগুলো স্থায়ীভাবে পাবে।

নীরদ: অতিমানস নামলে আমাদের সাধনা সহজ হবে না?

শ্রীঅরবিন্দ: হবে, যাদের মাঝে নামবে, যারা তৈরী তাদের জন্যে। যদি ৩০।৪০ জন তৈরী থাকত, তাহলে সে নামতে পারত।

নীরদ: আপনি নাকি বলেছেন যে ১৯৩৪ সালে অতিমানস নামতে প্রস্তুত ছিল কিন্তু একটি সাধকও তৈরী পাওয়া যায়নি বলে সে শক্তি নামল না। আমায় কিন্তু আপনি লিখেছেন যে অতিমানসের নামা সাধকের প্রস্তুতির উপর নির্ভর করে না।

শ্রীঅরবিন্দ: কেউ যদি তৈরী না থাকে সে নিজেকে প্রকাশ করবে কি করে? কিন্তু অতিমানসের চিন্তা বাদ দিয়ে প্রথমে খুলতে চেষ্টা করতে হবে সম্বোধির জন্যে।

ইতিমধ্যে মা এলেন এবং জানতে চাইলেন আমাদের বক্তব্য বিষয় কি। শ্রীঅরবিন্দ উত্তর দিলেন সম্বোধি সম্বন্ধে আলাপ হচ্ছে। মা কিছু না বলে তাঁর আসনে ধ্যান করতে বসলেন। আমরাও তাই করলাম। কতক্ষণ পরে তিনি তাঁর কাজে চলে গেলেন, আমাদের কথা আবার সুরু হল।

শ্রীঅরবিন্দ: সু'র খবর কেউ জানে কি? সে লিখেছে যে বিন্দু বিন্দু করে তার শরীর থেকে রক্ত বের হয়ে যাচ্ছে। আমার জানতে বড় কৌতূহল হয়েছে কি করে এটা হয়। তার ভাষায় এলিজাবেথীয় সাহিত্যের আভাস মেলে।

এই বিষয় থেকে কথা উঠল মৃত্যুভয় সম্বন্ধে। সু আর ন'র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে কেউ বলল যে তারা ঠাণ্ডার ভয়ে সব সময় আপাদমস্তক ঢেকে রাখে।

শ্রীঅরবিন্দ: এতে কেম্ব্রিজের একটা ঘটনা মনে পড়ছে। স্বাস্থ্য

ও শারীরিক উন্নতি সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা হচ্ছিল। তখন একজন তার চমৎকার স্বাস্থ্য দেখাবার জন্য একটার পর একটা জামা খুলতে আরম্ভ করল। দেখা গেল যে প্রায় ১০।১২টা জামা তার গায়ে।

নীরদ: আমাদের বিশ্বাস যে আশ্রমে স্থান পেলেই আমরা মৃত্যুজয়ী হব।

শ্রীঅরবিন্দ: বহুদিন ধরে আশ্রমে কোন মৃত্যু হয় নি বলে এরকম ধারণা জন্মেছে। যারা মারা গেছে তারা হয় আগন্তুক, নয় যে সব সাধক এখান থেকে চলে গেছে। গোড়াতে সকলের বিশ্বাসের জোর ছিল, কিন্তু যেই সংখ্যা বাড়তে লাগল, বিশ্বাসও কমল। কিন্তু মৃত্যুভয় কেন? আত্মা অমর, মৃত্যুর পর সে নবজন্ম লাভ করবে। যোগে ত ভয়ের কোন স্থানই নেই।

নীরদ: ভয় পাই আসক্তি আছে বলে।

শ্রীঅরবিন্দ: যোগে আসক্তি থাকলে চলবে না।

মণিলাল: কি করে ভয় জয় করা যায়?

শ্রীঅরবিন্দ: মনের জোরে, ইচ্ছাশক্তি ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে। আমার যখন কোন বিষয়ে ভয় হত, আমি ঠিক সেটাই করতাম; তাতে প্রচণ্ড মৃত্যু হয় যদি হোক। গুপ্ত আন্দোলনের সময় বারীনেরও খুব ভয় হত কিন্তু সে জোর করে ভয়ের কাজে এগিয়ে যেত। যখন তার প্রাণদণ্ড হল, সে হাসিমুখেই তা গ্রহণ করল। ফ্রান্সের রাজা চতুর্থ হেনরির প্রবল দৈহিক ভয় ছিল কিন্তু শুধু মনের শক্তির জোরে তিনি যুদ্ধের ঘোর মাঝখানে গিয়ে হাজির হতেন, এমন করে তিনি মহা যোদ্ধা বলে খ্যাতি লাভ করেন।

নেপোলিয়ান ও সীজারের ভয় বলে কিছু ছিলই না। সেই গল্প

ত জান বোধ হয়, **Albania** তে যখন **Pompey**এর সাথে সীজারের যুদ্ধ বাধে, সীজারের সৈন্যদের তখন শোচনীয় অবস্থা; সীজার সে সময় ইটালীতে। খবর পেয়ে যুদ্ধস্থলে আসবার জন্যে এক জেলের নৌকায় সমুদ্র পার হচ্ছেন আর উঠল প্রবল ঝড়। জেলে প্রাণের ভয়ে আধখানা। সীজার তাকে বললেন, "তোর ভয় কিসের? জানিস তুই সীজারকে ভাগ্য-সমুদ্র পার করে দিচ্ছিস?"

এখানে এক সাধক হিক্কায় কষ্ট পাচ্ছিল, সে বললে, "হিক্কা না থামলে আমি মরে যাব।" আমি তাকে বললাম, "তুমি যদি মরেই যাও, ক্ষতি কি?" হিক্কা তৎক্ষণাৎ থেমে গেল। প্রায়ই এসমস্ত ভয় প্রতিকূল শক্তিদের ডেকে আনে, আর তারা ঘাড়ে চেপে বসে। আমার রূঢ় জবাব শুনে সাধকটি তার বোকামি বুঝতে পাবল; এ সমস্ত অশুভ বুদ্ধি আর ঢুকবার অবসর পেল না।

মণিলাল: ব কি এখনও যোগ করছেন?

শ্রীঅববিন্দ: আমি জানিনা। পণ্ডিচেরী আসবার আগেও সে এক ধরনের যোগ করত। আন্দামানেও। সে লেলের শিষ্য ছিল, জানই ত। একবার সে লেলেকে কলকাতায় যুবকদের গুপ্ত-সমিতিতে নিয়ে যায়। লেলে জানতেন না ওরা কারা। আর একদিন সে তাঁকে নিয়ে যায় মানিকতলায় যেখানে তাবা গুলি ছু ড়ত। লেলে দেখেই বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা কি এবং ব'কে বললেন ওসব ছেড়ে দিতে। ব যদি না শোনে, লেলে বললেন, সে খানায় পড়বে; আর হলও তাই।

নীরদ: ব'র নাকি প্রচুর অভিজ্ঞতা হয়েছে?

শ্রীঅরবিন্দ: হাঁ, তবে সবই মনের স্তরের। তাতে তার জ্ঞান

বাড়ে অবশ্য। আমি শুনেছি যে তার কামানন্দের অনুভূতিও হয়েছিল। লেলে শুনে ত অবাক, কারণ এ অভিজ্ঞতা আসে শেষের দিকে। অন্য অভিজ্ঞতার মতই এটাও এক প্রকার অবতরণ কিন্তু ইন্দ্রিয়ের উপর যথেষ্ট সংযম না থাকলে এতে নানা কুফল ঘটায়।

নীরদ : তাঁর নাকি নানাগুণ ও কর্মশক্তি ছিল?

শ্রীঅরবিন্দ: হাঁ, অনেকটা বিদ্যুতের দীপ্তির মত, সীমাবদ্ধ। বিস্তার ছিল না। অনেক কিছুতেই সে হাত দিয়েছে—সাহিত্য, কবিতা, গান, ছবি, গুপ্ত সমিতি। আমুদে আলাপীও বটে, কিন্তু তার ব্যাপকতার অভাবে কোনটিই টিকে থাকবে কি না সন্দেহ।

নীরদ : আপনার জীবনীও লিখতে আরম্ভ করেন, শুনি?

শ্রীঅরবিন্দ: তাই নাকি? কাগজও বে'র ক'রেছে সে? আমার সম্বন্ধে কি লিখেছে জানতে আগ্রহ হয়।

মণিলাল : কাগজটা কিন্তু অল্পকাল পরেই বন্ধ হয়ে যায়।

নীরদ: সেই কাগজেই তিনি লেখেন যে আপনি বিদ্রোহী দলের নেতা ছিলেন। সে খবর সত্য কি না আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করি।

শ্রীঅরবিন্দ : আমি কি বললাম?

নীরদ: আপনি শুনে অবাক হলেন যে সবাই যা জানে আমি কি করে তা জানি না।

শ্রীঅরবিন্দ: খবরটা আসলে ঠিক তা নয়। ব'র দোষ হল সে সব খবর অবিকল দেয় না। আমি সে দলের প্রতিষ্ঠাতাও নই, নেতাও নই। পি, মিত্র এবং মিস ঘোষাল Baron Okakura-র মন্ত্রণায় ও প্রেরণায় তা আরম্ভ করে। আমি বাংলায় গিয়ে তাদের এই কাজ সম্বন্ধে জানতে পাই। তখন থেকে আমি শুধু খবর রাখতাম। আমার

উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত ভারতে প্রকাশ্য সশস্ত্র বিদ্রোহ সৃষ্টি করা। আর এরা যা করত, তা নিতান্ত ছেলেমানুষী, যেমন ম্যাজিস্ট্রেটকে মারধর করা। পরে ব্যাপারটা ডাকাতি, সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদির দিকে মোড় নেয়। ওগুলো মোটেই আমার মতানুযায়ী নয়, উদ্দেশ্যও ছিল না। বাঙালী হল ভাবপ্রবণ জাত, আশু ফল প্রত্যাশী, দীর্ঘদিন ধরে তৈরী হতে অক্ষম। আমরা চেয়েছিলাম Sinn Feinদের মত Guerilla যুদ্ধ করে জাতির ভেতর একটা ক্ষাত্রতেজ জাগিয়ে তোলা, তারপর প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করা। কিন্তু এখন তা সম্ভব নয়, যুদ্ধের ধারা সম্পূর্ণ বদলে গেছে।

নীরদ: কিন্তু আপনি তখন তাদের নিষেধ করেননি যে?

শ্রীঅববিন্দ: যঁখন কোন জিনিষ দৃঢ় রূপ নেয়, তখন তাকে বাধা দেওয়া সমীচীন নয়। কেননা তাতে কিছু ভাল ফল মিলতেও পারে।

মণিলাল: আপনি I. C. S. পরীক্ষায় ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষা দেন নি?

শ্রীঅরবিন্দ: না, আমায় দ্বিতীয়বার সুযোগ দিয়েছিল। সেটায়ও উপস্থিত না হওয়াতে তারা আমায় ফেল করে।

মণিলাল: কিন্তু I. C. S. পরীক্ষাই বা দিলেন কেন তাহলে? কোন ভিতরের নির্দেশেই কি ঘোড়া চড়াব পরীক্ষায় হাজির হন নি?

শ্রীঅরবিন্দ: না, না! তখন যোগসম্বন্ধে আমি কিছুই জানতাম না। পিতার ইচ্ছানুসারে আমি I. C. S. পরীক্ষা দিয়েছি। অল্পবয়স্ক ছিলাম বলে বুঝবার ক্ষমতা হয়নি। পরে বুঝতে পারি ওটা কি ধরনের কাজ। এ সমস্ত শাসন কার্যে আমার কোন স্পৃহা ছিল না; আমার

অনুরাগ ছিল কবিতায় সাহিত্যে, ভাষাশিক্ষায় আর স্বদেশী কাজে।

মণিলাল : আমরা শুনেছি যে আপনি আর চিত্তরঞ্জন দেশকে স্বাধীন করবার উদ্দেশ্যে বিদ্রোহমূলক প্ল্যান করতেন সেখানে ?

শ্রীঅরবিন্দ : শুধু আমরা কেন, অনেকেই। দেশপাণ্ডে একজন। যখন আমি বরোদায় আসি, তখন কংগ্রেসের নীতির উপর আমার ধিক্কার জন্মে। আমি দেশপাণ্ডে, তিলক, মাধবরাও প্রভৃতির সংস্পর্শে আসি। দেশপাণ্ডে ইন্দুপ্রকাশে কিছু লিখতে অনুরোধ করায় আমি কংগ্রেসী নরম নীতির তীব্র প্রতিবাদ করি। লেখাগুলি এমন তেজস্বী হয়েছিল যে রাণাডে গ্রেপ্তারের ও জেলে যাবার ভয় দেখিয়ে এরকম বিদ্রোহজনক লেখা কাগজের মালিককে নিষেধ করে ছাপাতে। দেশপাণ্ডে এ খবর নিয়ে আমার কাছে আসে এবং কিছু মোলায়েম জিনিষ লিখতে অনুরোধ করে। তখন রাজনীতির ব্যবহারিক প্রয়োগ বাদ দিয়ে রাজনীতির দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে লিখতে আরম্ভ করি, কিন্তু অচিরেই আমার মন বেঁকে বসে, আর যখন শুনলাম বিপিন পাল বন্দেমাতরম্ কাগজ বের করছেন তখন তাতে আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ করবার সুযোগ মিলল।

নীরদ : মহারাজা নাকি আপনাকে দিয়ে রেসিডেন্টের কাছে রাজস্ব সংক্রান্ত কোন এক বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি (Memorandum) লেখাতে চেষ্টা করেন ; আপনি রাজি হলেন এই সর্তে যে মহারাজা নিজে সেটা রেসিডেন্টের হাতে দেবেন, কেননা আপনার ভয় ছিল যে দেওয়ান ভীরু লোক বলে চেপে রেখে দিতে পারেন।

শ্রীঅরবিন্দ : ওসব গল্প। অবশ্য আমি মহারাজার অনেক আবেদনপত্র লিখেছি, কিন্তু তাঁর নির্দেশ অনুসারে। আমি আগেই

বলেছি এসব কাজ আমার ভালই লাগত না। সেজন্যে আমি মহারাজাকে একরকম বাধ্য করি আমায় কলেজে বদলি করতে।

তিলক, মাধবরাও, দেশপাণ্ডে ও জোষি—জোষি পরে মডারেট হয়ে যায়—আমরা ক'জন মিলে কংগ্রেসের চাইতে আরও গরম পথে কাজ করতে মতলব করি। যতীন বানার্জিকে বাংলা থেকে আনিয়ে বরোদা সৈন্যদলে ভর্তি করাই। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল মডারেটদের তাড়িয়ে কংগ্রেস দখল করা।

যেই শুনলাম যে কলকাতায় জাতীয় কলেজ স্থাপিত হয়েছে, বরোদার চাকরী ফেলে দিয়ে প্রিন্সিপাল হয়ে সেখানে গেলাম। বন্দেমাতরমের সম্পাদক বিপিন পালের সাথে পরিচয় হল। কাগজের আয় ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। তিনি দেশের কাজে বাইরে যাবার সময় আমায় কাগজের ভার নিতে বলেন। আমি রাজী হলাম এবং সুবোধ মল্লিক-দের বললাম টাকা সাহায্য করতে। শীঘ্রই কাগজের নামডাক হল এবং কাগজ ভারতবর্ষময় ছড়িয়ে পড়ল।

একদিন বাংলার নেতাদের ডেকে বললাম, "এরকম শুধু লিখে কিছু হবে না। কংগ্রেস দখল করে মডারেটদের তাড়িয়ে দিতে হবে।" আমি ভারতনেতারূপে তিলকের নাম করলাম। সকলেই এই প্রস্তাবে মেতে উঠল। তিলক উত্তরাঞ্চলে পরিচিত না হলেও নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। তিনি সত্যিই মহৎ লোক,—এরকম লোক ক্বচিৎ মেলে,—সম্পূর্ণ স্বার্থহীন।

মণিলাল: তাঁর গীতা সম্বন্ধে আপনার কি মত? তাঁর লেখায় উর্ধ্ব প্রেরণার পরিচয় পাওয়া যায় কি?

শ্রীঅরবিন্দ: আমি বইটি পড়িনি।

মণিলাল : কিন্তু আপনি যে সমালোচনা করেছেন ?

শ্রীঅরবিন্দ : তাহলে না পড়েই করেছি (হাস্য)। অবশ্য চোখ বুলিয়ে গেছি ধরতে হবে। আমার বোধ হয় না যে কোন অন্তঃ-প্রেরণা রয়েছে তাতে। বুদ্ধিগত ব্যাখ্যাই বেশির ভাগ ; মনীষী ছিলেন ত।

মণিলাল : তিলককে যখন জিজ্ঞেস করা হয় ভারতবর্ষ স্বরাজ পেয়ে গেলে তিনি কি করবেন, তিনি উত্তর দেন, আবার গণিতের প্রফেসর হবেন।

শ্রীঅরবিন্দ : (নিজেই বন্দে মাতরমের কথা তুললেন) কেউ কেউ বিপিন পালকে বন্দেমাতরম থেকে সরিয়ে দিতে চাইত। আমি যখন অসুখে পড়ি, সেই সুযোগে তাঁকে সরান হয় এবং আমার নামও তাতে জড়ায়। আমি সহকারী সম্পাদককে তলব করে এই অন্যায়ের জন্যে দারুণ শাস্তি দিই, অবশ্য আলঙ্কারিক অর্থে। কিন্তু ক্ষতি যা তা হয়ে গেছে। বিপিন পাল ছিলেন মস্ত বক্তা ; সে সময় তাঁর বক্তৃতায় আগুন জ্বলত। তাকে এক ধরনের অবতরণই বলতে পার। পরে তাঁর সেই বাক্‌শক্তি হ্রাস পায়। আমার মনে আছে তিনি কখনও 'স্বাধীনতা' কথাটা ব্যবহার করতেন না, সর্বদা বলতেন, 'ব্রিটিশপ্রভুত্বহীন স্বায়ত্ত-শাসন।' বরিশাল কনফারেন্সের পর যখন চাষীরা যোগ দিল, তখন ৪০।৫০ হাজার লোক হাজির হত বিপিন পালের বক্তৃতা শুনতে। তাঁর সাথে সুরেন বানার্জির তুলনা হয়না। সুরেন বানার্জি এরকম কোন প্রভাব দেখাতে পারেন নি, কিন্তু বলেছি যে পরে তিনি এই ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। তবে তিনি ছিলেন বক্তা, নেতা নয়। ব্যবহারিক বুদ্ধির (practical) অভাব ছিল বলে তিনি নেতা হতে পারেন নি।

নেতৃত্বের গুণ ছিল না। পরে আন্দোলনে যোগ দিলেন শ্যামসুন্দর, আরও অনেকে।

নীরদ: অমৃতবাজারও ত চরমপন্থী ছিল?

শ্রীঅরবিন্দ: কখনো না। সন্ধ্যা বা যুগান্তরের মত প্রকাশ্যভাবে দিনের পর দিন স্বাধীনতা, গুপ্তযুদ্ধ (guerilla) সম্বন্ধে অমৃতবাজার লিখতে পারত না। তাদের নীতি ছিল, চাচা, আপন বাঁচা।

তখন বাংলায় তিনটি কাগজ চলতি ছিল: যুগান্তর, সন্ধ্যা, বন্দে-মাতরম। ব্রহ্মবান্ধব ছিলেন সন্ধ্যার সম্পাদক, ইনি আর একজন মহৎ লোক। এমন বিচক্ষণ লেখক ছিলেন যে সরকার তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ খুঁজে পেত না। আমাদের বন্দেমাতবমের আর্থিক অবস্থা ভয়ানক খারাপ ছিল, তবুও কয়েক বছর ধরে আমরা কাগজ চালিয়েছি।

নীরদ: সবকার আপনাকে গ্রেপ্তার করতে চেষ্টা করেনি?

শ্রীঅরবিন্দ: কি করে কববে? তেমন কোন আইন ছিল না। প্রেসেরও বেশি স্বাধীনতা ছিল। তাছাড়া অভিযোগ আনার মত কাগজে কোন লেখা থাকত না। Statesman বলত যে কাগজ রাজদ্রোহসূচক লেখায় ভর্তি অথচ এমন কৌশলে লেখা যে সম্পাদককে গ্রেপ্তার করার উপায় নেই। সম্পাদকের নামও ত ছাপান হত না; কাজেই শুধু প্রিন্টারদের গ্রেপ্তার করতে পারত, কিন্তু একজন গেলে অন্যরা তার স্থান নিত।

পরে সহকারী সম্পাদক, উপেন বানার্জি কতকগুলি চিঠি প্রকাশ করে; তার জন্যে রাজদ্রোহে আমি অভিযুক্ত ও গ্রেপ্তার হই, কিন্তু প্রমাণের অভাবে খালাস পাই। দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার হয়ে যখন আলি-পুর জেলে বন্দী হলাম, আর্থিক দুরবস্থার জন্যে কাগজ চালান দুঃসাধ্য

দেখে তারা কড়া লেখা বের করে, তাতেই কাগজ বন্ধ হয়। পরে খালাসের পর কর্মযোগিন বের করি। সেবারও যখন নিবেদিতার কাছে আমার গ্রেপ্তারের গুজব শুনলাম "দেশবাসীর প্রতি খোলা চিঠি" নামে একটা প্রবন্ধ লিখি এবং গোপনে চন্দননগরে চলে যাই। সেখানে বন্ধুরা যখন আমায় ফ্রান্সে পাঠাবার কথা ভাবছিল আমি আদেশ শুনলাম "পণ্ডিচেরী চলে যাও!"

মণিলাল : পণ্ডিচেরী কেন?

শ্রীঅরবিন্দ : সে প্রশ্নের অবকাশ ছিল না, শ্রীকৃষ্ণের আদেশ! মানতেই হবে। পরে বুঝতে পেরেছি যে আমার যোগের কাজের উদ্দেশ্যে এ আদেশ। ছদ্মনামে আমায় পাসপোর্ট নিতে হয়। জাহাজ কোম্পানী আবার ইংরেজ ডাক্তারের সই করা ছাড়পত্র চায়। কত হাঙ্গামা! অনেক কষ্টে ডাক্তারের সন্ধান মিলল। তাঁর বাড়ী গেলাম, তিনি আমার ইংরেজী উচচারণে মুগ্ধ! বললাম আমি অনেক বছর বিলাতে কাটিয়েছি।

নীরদ : আপনি সার্টিফিকেট নিলেন ছদ্মনামে?

শ্রীঅরবিন্দ : অবশ্য! আমার আসল নাম দিলে ত তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করত। মহাত্মা গান্ধির সত্যনিষ্ঠা আমার মাথায় থাক, কিন্তু ততখানি সত্যভাষী আমি হতে পারলাম না। তাতে বিপ্লবী হওয়া যায় না। বিজয়, মণি ও আমার শ্যালককে নিয়ে এখানে আসি এবং বেশ কিছুদিন ছদ্মনামে চলি।*

*

* এই আলাপে পুরাণীর কিছু কিছু সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

২০।১২।৩৮

শ্রীঅরবিন্দের দুপুরের খাবার শেষ হল প্রায় সাড়ে চারটায়। তখন দৈনিক কাগজে মিঃ অ'র মৃত্যুতে খ্যাতনামা নাগরিকদের Memorial গুলি তাঁকে পড়ে শুনালাম। গবর্ণর থেকে একে একে সকলেই এমন উচচ প্রশংসা করেছে—সৎ, সত্যবাদী, গরীবের বন্ধু ইত্যাদি স্তুতিবাক্যে যে শ্রীঅরবিন্দ হেসে উঠলেন এবং বললেন "Good Lord! তাহলে ত অ'কে এখন সাধু মহাত্মার (Saint) পদবী দেওয়া উচিত। এই হল রাজনৈতিক জীবন! ব'র যখন মৃত্যু হল, র এবং অন্যেরা যারা তার চিরশত্রু, তাদের মুখে তখন কী প্রশংসা!

কথা আবার শুরু হল সন্ধ্যা ৭টায়, আমাদের দৈনন্দিন নির্ধারিত সময়ে শ্রীঅরবিন্দের কোষ্ঠকাঠিন্য নিয়ে। বিছানায় শুয়ে থাকতে হয় বলে সব সময় ঠিক কাজ হয় না। মাঝে মাঝে constipation এবং diarrhoea পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে। শ্রীঅরবিন্দ বললেন, ব্যাপারটা হল সেই 'অতিবিক্তমাত্রায় সাহায্যে'র মত।* আমি যদি অতিরিক্ত শক্তি প্রযোগ করি, diarrhoea বন্ধ হয়ে constipation

---

* শ্রীঅরবিন্দ এ সম্বন্ধে আমায় একটা মজার ছোট্ট ঘটনা লিখেছিলেন: South Africaর বুয়র যুদ্ধের সময় নাকি দুটি বুয়ার অশ্বারোহী সেনা পালিয়ে যাচ্ছিল। একজন ছিল মোটাসোটা, ওজনে ভারী। সে মাটিতে পড়ে যায়, আর কিছুতেই উঠতে পারে না, অথচ এধারে শত্রুরা প্রায় কাছে এসে পড়ল। তখন নিরুপায় অবস্থায় ভগবানকে সে প্রার্থনা করলে, "God, give me force and help me to my saddle;" আর দিল জোরে এক লাফ। কিন্তু পড়লো গিয়ে ঘোড়ার উল্টো দিকে, এবং বলে উঠলো, "Oh God, thou hast helped me too much!" বেচারা পালাতে পারল না

এসে যায়। তাছাড়া এই শোয়া অবস্থায় যথেষ্ট শক্তিও ব্যবহার করা যায় না।

নীরদ: কেন?

শ্রীঅরবিন্দ: জানি না; বোধ হয় এটা তামসিক অবস্থা বলে। আমি সাধারণত বেড়াবার সময়ই শক্তি প্রয়োগ করতাম। আগে যখনই এই ধরনের পেটের গোলমাল হত, অতি অল্প সময়ের মাঝেই সারাতে পারতাম। কিন্তু এখন প্রচুর শক্তির প্রয়োজন হয়। এই কাশিটাও খুব তীব্র ছিল, কিন্তু সারিয়ে ফেলি শক্তি দিয়ে। তিন বছর বন্ধ ছিল। এই accident-এর পর থেকে আবার ফিরে এসেছে।

এখন কথার মোড় নিল হোমিওপ্যাথির দিকে; তার সাথে এলোপ্যাথির তফাৎ, মাত্রা ইত্যাদি নিয়ে।

শ্রীঅরবিন্দ: হোমিওপ্যাথি জিনিষটা যোগের কাছাকাছি বলা যায়। এলোপ্যাথি যেন মেশিনের মত। হোমিওপ্যাথিতে চিকিৎসা করা হয় গোটা দেহসত্তার (physical personality) উপরে। ব্যক্তিগত সমস্ত লক্ষণ মিলিয়ে এই যে বিশিষ্ট দেহসত্তাটি তারই উপর চলে চিকিৎসা। এলোপ্যাথি মাত্র রোগটিকেই নির্ণয় করে, মোটেই রোগীর দেহসত্তার বিচার বলা যায় না তাকে। হোমিওপ্যাথির কাজ বেশী সূক্ষ্ম ও তেজস্ক্রিয় (dynamic)।

সত্যেন্দ্র: কোন কোন যোগী শারীরিক যন্ত্রণা হতে মুক্তি পাবার জন্যে সমাধিতে ডুব দেয়। আবার কেউ কেউ যন্ত্রণা সজ্ঞানে সহ্য করে।

নীরদ : যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীঅরবিন্দ : ঠিক। যোগীরা সমাধিতে গিয়ে তাদের শারীরিক যন্ত্রণা লোপ করতে পারে। যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্যে সমাধিতে প্রবেশ করার বিশেষ সার্থকতা দেখি না। রামকৃষ্ণ তাঁর গুরুতর পীড়ার সময় কেশব সেনকে বলেন যে তাঁর শরীরটা ভেঙ্গে পড়েছে আধ্যাত্মিক সাধনার চাপে। কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি কি সব সময় অসুখ সৃষ্টি করে ?

নীরদ : রামকৃষ্ণ ইচ্ছা করলে ত নিজের অসুখ সারাতে পারতেন।

শ্রীঅরবিন্দ : নিশ্চয়! কিন্তু নিজের রোগ সারাবার ইচ্ছা বা তা নিয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না।

নীরদ : তাঁর cancer নাকি তাঁর ভক্তদের পাপের ফল ?

শ্রীঅরবিন্দ : হাঁ, তিনি ত তাই বলেছেন। আব তিনি যখন বলেছেন তখন তা নিশ্চয়ই সত্য হবে। জান ত তিনি ভগবানকে 'বকলমা দেওয়ার' কথা বলতেন। শিষ্যের অনেক ভারই গুরুকে নিতে হয়। মা তাই করেন, কেননা মা শিষ্যদের সাথে একাত্ম হয়ে যান, তাদের সকলকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করেন। অবশ্য সব কিছুই যে অনায়াসে তিনি ঢুকতে দেন এমন নয়, অনেক কিছুকে বাধাও দেন। এক যোগীর শিষ্য যখন গুরু হতে যাচ্ছিল তখন শিষ্যকে যোগী বললেন, "তোমার নিজের সমস্যার সাথে তোমার শিষ্যের সমস্যাও তাহলে ঘাড়ে নিলে।" তবে তুমি যদি শিষ্যের সাথে সমস্ত সম্পর্ক কেটে দাও, তাহলে পথ সহজ হয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রে সাধকের কোন অবলম্বন থাকে না, কাজও হয় না।

শক্তির এরকম আদানপ্রদান নিত্যই ঘটছে। যখনই দুটো লোক একত্র হয় তখনই এই আদানপ্রদান চলতে থাকে। এভাবে জীবাণু ব্যতীতও রোগ সংক্রামিত হতে পারে। ন এ সম্বন্ধে খুব সচেতন ছিল, কিন্তু সে ভুলে যেত যে সেও তার ভিতরের কত জিনিস বিনিময় করছে।

শুধু এই নয়, চিন্তার দ্বারাও ভালমন্দ করবার শক্তি থাকে। অশুভ চিন্তা অন্যের অনিষ্ট করতে পারে। সেজন্যে বুদ্ধ শুভ চিন্তার উপর জোর দিতেন।

মানুষের যে সঙ্গলিপ্সা, সেটা পরস্পরের মধ্যে শক্তিবিনিময়ের প্রয়োজন থেকে আসে। পুরুষ নারীর আকর্ষণটা আসলে কি জিনিস? প্রাণিক বিনিময় ছাড়া আর কিছু কি? একজন অন্যজনের প্রাণশক্তি আত্মসাৎ করছে মাত্র। যখন কোন নারী অন্য কোন পুরুষের প্রয়োজন অনুভব করে, তার মানে সে তার প্রাণশক্তি টানতে চায়। মেয়েপুরুষের পরস্পরের পেছনে ছোটার মূলে আছে এই বিনিময় বা শক্তি আহরণ। অবশ্য এই বিনিময় চলে পরস্পরের অজ্ঞাতে এমনকি নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। সাধারণ জীবনেও একজন যখন অকারণে অন্যকে অপছন্দ করে, তার মানে দুজনের মাঝে প্রাণিক সঙ্গতি নেই। Sheridan-এর সেই লাইন দুটো জান ত:

ডাক্তার ফেল্ মোর ভারী অপছন্দ,
জানিনা কি হেতু তার, ভাল কিবা মন্দ।*

ঠিকই সে জানে না, যেহেতু এ সমস্ত হল প্রাণের তরফের (vital)

---

* "I don't like Doctor Fell
The reason why I cannot tell."

অসঙ্গতি; কিন্তু সাধারণত এ সম্বন্ধে কেউ সচেতন নয়। তোমরা দেখেছ পুরুষ ও স্ত্রী কি প্রচণ্ড ঝগড়া করে, অথচ একে অন্যকে ছাড়তেও পারে না, কারণ তাদের পরস্পরের প্রাণশক্তির প্রয়োজন। মেয়েদের মাঝেই এই প্রয়োজনটা বেশি। একেই বলা হয় "প্রেমে পড়া।" অবশ্য পুরুষ সেটা তাদের উপর চাপিয়েছে। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক এই প্রয়োজন থেকেই সৃষ্টি হয়েছে, যাতে এই আকর্ষণ ও আদানপ্রদান দুজনের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে এবং একটা সাম্যভাব (equation) বজায় থাকে।

সত্যেন: কিন্তু তার মধ্যে একজন যদি বেশি মাত্রায় টানে, তাহলে বিপদ ঘটে?

শ্রীঅরবিন্দ: অবশ্য; তার নেওয়াটা যদি দেওয়া থেকে বেশি হয়, তাহলে দাতার পক্ষে অনিষ্ট হতে পারে। জান ত, হিন্দু জ্যোতিষে দেবগণ ও রাক্ষসগণের উল্লেখ আছে। স্বামীর যখন একটার পর একটা স্ত্রী মারা যাচেছ, তার মানে সে তাদের রক্ষণের পরিবর্তে ভক্ষণ করছে।

নীরদ: ভ্যাম্পায়ার কাকে বলে?

শ্রীঅরবিন্দ: যারা নিত্য অন্যের প্রাণশক্তি শোষণ করে, প্রতিদানে কিছুই দেয় না, তারাই ভ্যাম্পায়ার (vampire)।

নীরদ: এটা কি তাদের প্রকৃতিগত, না, ভূতে পাওয়ার (possession) মত কিছু?

শ্রীঅরবিন্দ: দুটোই সম্ভব। পুরুষ নারী দুই জাতেরই ভ্যাম্পায়ার আছে। অন্য এক ধরনের প্রাণশক্তি আছে, সেটা উদারধর্মী, নিজেকে ঢেলে না দিয়ে পারে না। আর এক ধরনের প্রাণশক্তি

চায় কেবল নিজের প্রভাব বিস্তার করতে, সেটাকে বলা যেতে পারে হিট্‌লারীয় ; তার প্রকৃতি হল সকলকে নিজের কবলে চেপে রাখা।

মণিলাল : বিশুদ্ধ প্রেমও (Psychic love) কি এই জাতের ?

শ্রীঅরবিন্দ : নিশ্চয় নয়। সেই প্রেমে পাওয়ার, দাবী-দাওয়ার নামগন্ধ নেই, আছে শুধু দেওয়া।

২১।১২।৩৮

আজ আমরা ডাক্তারীবিদ্যা সম্বন্ধে কথা পাড়লাম—হোমিওপ্যাথি, এলোপ্যাথী, আয়ুর্বেদ ইত্যাদি। কেউ একজন বললে যে ডাক্তারী চিকিৎসার ক্ষেত্রে নাপিতদের একসময় উচ্চস্থান ছিল।

শ্রীঅরবিন্দ : ইউরোপে মধ্যযুগে অধিকাংশ সার্জন ছিল নাপিত। আমাদের দেশে নাকি এমন কবিরাজ আছে যারা নাড়ী দেখে রোগীর সব লক্ষণ বলতে পারে ?

আমরা সকলে আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিষয় একে একে বললাম। একজন বললে, রোগী কিছুদিন আগে কি খেয়েছে তাও নাড়ী-বিশেষজ্ঞ জানতে পারে।

সত্যেন্দ্র : তাদের কথা কিন্তু সব সময় ঠিক হয় না। তাদের বিচারও সত্য বলে গ্রহণ করা যায় না।

শ্রীঅরবিন্দ : কেন ? কি করে জান যে ঠিক নয় ? অনেক বিজ্ঞানের ভিত্তি হল অভিজ্ঞতা ও সম্বোধির উপর, এবং সেই পদ্ধতি

ধরেই সেগুলো চলে এসেছে। যেমন চীনেদের চিকিৎসা তারা স্নায়ু-কেন্দ্র বের ক'রে সেগুলো সূঁচ দিয়ে বিদ্ধ করে।

পুরাণী ধন্বন্তরী সম্বন্ধে কিম্বদন্তী এই যে, তিনি কোনো গাছ-গাছড়ার সামনে দাঁড়ালেই তারা তাদের দ্রব্যগুণ সব তার কাছে প্রকাশ করত।

শ্রীঅরবিন্দ (হেসে) ধন্বন্তরী হলেন দেবগণের বৈদ্য, কাজেই কিছুই তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক নয়।

আয়ুর্বেদ হল প্রথম চিকিৎসাবিদ্যা। ভারতবর্ষ হতে এই বিদ্যা, জ্যোতিষ, অঙ্কশাস্ত্র যায় আরবদেশে, তারপর গ্রীসে। ভারতের বৈদ্যরাও আরবদেশে, পরে গ্রীসে গেছে। Hippocrates ও Galen যে তিনটি Humour-এর উল্লেখ করেছেন সেটা মূলে ভারতীয় মত। অঙ্কশাস্ত্রের শূন্য ও গাণিতিক সংখ্যা (notation) ভারতের দান। জ্যোতিষশাস্ত্রও এখান থেকে যায় আরবদেশে।

নীরদ কলকাতায় একটা আয়ুর্বেদ কলেজ খোলা হচ্ছে। সেখানে যদি Anatomy ও Surgery-র স্থান থাকে, তাহলে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সংমিশ্রণ ভালই হবে।

শ্রীঅরবিন্দ Anatomy, Surgery কি এদেশে ছিল না? সার্জারির বহু রকমের অস্ত্র ছিল। তাছাড়া আয়ুর্বেদের মত প্রাচীন বিদ্যা এরকম বর্তমান পদ্ধতিতে শেখান যায় কি না তাতে আমার সন্দেহ আছে। বর্তমান প্রণালী সব বিষয়ের উপর মনের ছাপ দেয়, তাকে ক'রে তোলে বুদ্ধিসর্বস্ব intellectual, আর পুরাতন প্রণালী ছিল সম্বোধি-জাত (intuitional)। সেই শিক্ষাই গুরুশিষ্য-পরম্পরায় চলে আসত। যোগ সম্বন্ধেও একই কথা। যোগের স্কুল কলেজ ইত্যাদির কথা

ভাবতেও পার না। আমেরিকায় চলতে পারে বটে, আমেরিকায় এইরকম শিক্ষা চলছে।

নীরদ: হঠযোগ ত চলতে পারে?

শ্রীঅরবিন্দ: তার বহিরাংশটুকু।

২২।১২।৩৮

আজ যেন শ্রীঅরবিন্দের কথা বলবার মত মেজাজ নেই—ইংরেজীতে যাকে বলে mood নেই। অন্যান্য দিন তিনি নিজেই কোন সংকেত দিতেন বা নিজে আরম্ভ করতেন, তবে আমরা সাহস করতাম। আজ কোন চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই সুযোগের অপেক্ষায় চুপ করে রইলাম। ভিতরে ভিতরে কল্পনা চলতে লাগল কি করে তাঁর মৌন ভাঙ্গা যায়। ইত্যবসরে দেখলাম ডাক্তার বেচারলাল হাসিমুখে তাঁর দিকে তাকাচ্ছেন এবং আস্তে আস্তে তাঁর বিছানার দিকে এগিয়ে আসছেন; বুঝতে পারলাম কিছু জিজ্ঞাসার জন্যে এই প্রস্তুতি। হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন "বিশুদ্ধ মনোভাব (right attitude) বজায় রাখতে হলে অন্যদের সাথে আমাদের আচরণ কি রকম হওয়া উচিত?"

শ্রীঅরবিন্দ: তোমার প্রশ্নটি বুঝতে পারলাম না। (আবার প্রশ্নটা বলা হল) আমার তো মনে হয়, সমস্যাটা উল্টো ধরনের। যদি আমাদের মনোভাব বিশুদ্ধ থাকে, অন্যান্য জিনিষগুলি আপনি ঠিক হয়ে যায়। বিশুদ্ধ মনোভাবের চাইতে বেশি জরুরী হল অন্তরের

অবস্থা বা ভাব। আধ্যাত্মিক নিয়ম ও নৈতিক নিয়ম—এ দুটো একেবারে আলাদা, এবং সব কিছু নির্ভর করবে তোমার কাজ কি আধ্যাত্মিক, না নৈতিক উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে তার উপর। মনের বলে তুমি তোমার বাইরের ব্যবহার সংযত করতে পার কিন্তু ভিতরের অবস্থা অশান্ত, অসংযত হতে পারে। কিন্তু সংযম যেখানে মনেব নয়, ভিতরের সত্তার তখন ভিতরের শান্তি নষ্ট হয় না এবং সকলের প্রতি মিত্রতাও বজায় থাকে। বাইরে তুমি রাগ না দেখাতে পার, বিনীত হতে পার কিন্তু ভিতরে দম্ভ, ক্রোধ পুরোমাত্রায় বিরাজ করতে পারে। কাজেই চৈত্যিক সংযম চাই, সেটা থাকলে তোমার আচার-ব্যবহার আপনি সহজ, নিখুঁত হবে। অবস্থাটা বদলাতে হবে ভিতর থেকে বাইরে। যতই তুমি এই আন্তর আলোর দিকে নিজেকে খুলবে, ততই বহিঃপ্রকৃতিব উপর তার প্রভাব পড়বে। মানসিক সংযম আধ্যাত্মিক সংযমে পরিণত হবে এমন কোন কথা নেই, তবে যারা সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক, তাদের পক্ষে এটা প্রথম ধাপ বলতে পার।

বেচারলাল : এই চৈত্যিক (psychic) আধিপত্য কি করে পাওয়া যায় ?

শ্রীঅরবিন্দ : নিরন্তর স্মরণ, নিবেদন এবং সে সমস্ত বর্জন যেগুলো তোমায় আত্মার প্রভাব থেকে দূরে রাখে। একবার এই অন্তরাত্মার বিকাশ হলে তোমার প্রতিপদে কি কর্তব্য সেই-ই দেখিয়ে দেবে।

ইতিমধ্যে মা এলেন এবং কিছুক্ষণ ধ্যান করে চলে গেলেন। এখন শ্রীঅরবিন্দ বেচারলালকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য কি ? এটা কি ব্যক্তিগত প্রশ্ন, না সর্বসাধারণের জন্য ?"

বেচারলাল : আমি জানতে চাই, এই যেমন সর্বভূতে কি করে ভগবানকে দেখা যায়, তাদের ভালবাসা যায়।

শ্রীঅরবিন্দ : সকলের প্রতি মিত্রভাবের সঙ্কল্প, সর্বভূতে ভগবানকে দেখতে চেষ্টা করা, আত্মসমর্পণের ভাব, এই নিয়ে সুরু করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনের প্রাণের অশুদ্ধি বর্জন করা চাই। এই সঙ্কল্প শেষে পরিণত হবে উপলব্ধিতে। উপলব্ধি হলে পথ সোজা; তখনও সোজা কেবল তোমার নিষ্ক্রিয় অবস্থায় (static aspect); যখন সে উপলব্ধিকে কাজে সক্রিয় করতে চাও তখন তা কত কঠিন বোঝা যায়। ধর, যদি চোখের সামনে কারও পশুর মত ব্যবহার দেখ, সে মুহূর্তে তার মাঝে ভগবান রয়েছেন এই বোধ রাখা খুব শক্ত। সেটা সম্ভব যদি তার বাইরের প্রকৃতি হতে তাকে আলাদা করে তার পিছনে ভগবানকে দেখতে পাও।

ভগবানের কোন নাম জপ করেও ভাগবত চেতনা লাভ করা যায়।

নীরদ : কি করে?

শ্রীঅরবিন্দ : নাম হল মন্ত্রের মত শক্তি। দুনিয়ায় সমস্তই হল শক্তির লীলা। কেউ কেউ জপের সাথে প্রাণায়ামও করে। কিছুকাল পরে নাম ও প্রাণায়াম সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে এবং ভগবানের সান্নিধ্য বোধ হয়। ভগবানকে পাবার পথের শেষ নেই। এখানে একসময় সাধকেরা তাদের কাজে দারুণ শক্তি ও উদ্যম অনুভব করত। বিনা ক্লেশে ঘন্টার পর ঘন্টা পরিশ্রম করতে পারত। ফলে দেখা দিল বাড়াবাড়ি। আধ্যাত্মিক জীবনেও যুক্তি, বিবেচনা চাই। সাধনা যখন প্রাণের স্তরে ছিল, তখনকার কথা বলছি। কিন্তু দেহের স্তরে

যখন নামল, তখন চেহারা বদলে গেল। দেহ-চেতনা হল পাথরের মত জড়, অপ্রকাশ ও অপ্রবৃত্তি তার ধর্ম।

নীরদ : মাঝে মাঝে সর্বভূতে একটা প্রেমের আভাস পাওয়া যায়। যদিও ক্ষণিক কিন্তু বেশ আনন্দদায়ক।

শ্রীঅরবিন্দ : সেটা হল অন্তরাত্মার একটা ঢেউ। কিন্তু তখন তোমার মনোভাবটা কি রকম হয় ? অর্থাৎ ওটা কি তোমার কাছে একটা ক্ষণিকের খেয়াল, না সেই আভাসকে গভীর করবার প্রেরণা জাগায় ?

নীরদ : প্রেরণাই দেয় কিন্তু কখনও প্রাণের অশুদ্ধি মিশে যায়। তখন সাবধান হয়ে পড়ি।

শ্রীঅরবিন্দ ওই হল বিপদ। এতে বোঝা যায় যে ঢেউটি আসছে প্রাণের জগৎ ছুঁয়ে, তার অশুদ্ধি নিয়ে। এই সমস্ত অশুদ্ধি বিশেষ করে যৌন সংক্রান্ত যেগুলি, সাবধানে এড়াতে হবে। ক'র এরকম হত। এমন চমৎকার লোক ছিল সে ! কিন্তু এই যৌন অশুদ্ধি তার সমস্ত অভিজ্ঞতা নষ্ট করে দিত। এটা হয় এই জন্যে যে যৌন আবেগকে আমরা আধানির্দোষ বলে গণ্য করি। 'এমন আর কি ?' এই রকম একটা সমর্থন আছে। কিন্তু যোগে যৌনক্রিয়ার কোন স্থান নেই। সাধারণ জীবনে তার স্থান ও উদ্দেশ্য আছে বটে। অবশ্য আমি সহজ মার্গের কথা বলছি না।

জেলে আটক থাকার সময় আমি একটি লোককে জানতাম। তার গভীর একাগ্রতার শক্তি ছিল (power of concentration), সেই শক্তি প্রয়োগে সকলের ভালবাসা পেতে চেষ্টা করছিল এবং সফল হল শেষে। প্রহরী শুদ্ধ সকলের মধ্যে তার প্রতি ভালবাসার উদ্রেক হল। অবশ্য তোমায় প্রণালীটা জানতে হবে।

নীরদ : সেইটাই যে আমরা জানি না।

শ্রীঅরবিন্দ : মনকে শান্ত করা চাই এবং চেতনা লক্ষ্যের দিকে —শুধু মন নয়—নিবিষ্ট হওয়া চাই। সময় নেবে বটে, কিন্তু অন্য পথ নেই। এ সব বিষয় কোন কৌশলে আয়ত্ত করবার নয়।

সত্যেন্দ্র : প্রকৃতির পরিবর্তন (modification) আর রূপান্তরে তফাৎ কি?

শ্রীঅরবিন্দ : রূপান্তর হল গোটা প্রকৃতিকে আমাদের উপলব্ধির ছাঁচে গড়ে তোলা। উপলব্ধিকে তোমার বাইরের প্রকৃতিতে প্রক্ষিপ্ত করতে হবে।

আমি তিনটি রূপান্তরের কথা বলেছি: চৈত্যিক, আধ্যাত্মিক ও অতিমানস। প্রথমটা পৃথিবীতে অনেকের লাভ হয়েছে, যেমন খৃষ্টান সাধুদের; তারা তা.দব হৃদয়ে ভগবানেব অস্তিত্ব অনুভূতির কথা বলেছে। আধ্যাত্মিক হল আত্মাব, অসীমের উপলব্ধি, তার শান্তি, জ্ঞান ও আনন্দ ইত্যাদি নিয়ে। এটা তেমন সোজা নয়। এর উপরে হল অতিমানস, ঋত-চিৎ, এই পৃথিবীতে কাজ করবে ভাগবত উদ্দেশ্যে।

নীরদ : ভিতরের উপলব্ধি হলে ত তার আলোকে বাহিরটা আপনি বদলাবে।

শ্রীঅরবিন্দ : তেমন কোন কথা নেই। প্রকৃতির কোন অংশ সামান্য বদলাতে পারে কিন্তু আমূল পরিবর্তন হয় না। এটা স্বতঃ-লভ্য নয়, এত সহজও নয়। লেলের সংস্পর্শে আমার যে শান্তির ও নিশ্চলতার অভিজ্ঞতা হয়, তা আর হারায়নি কিন্তু তবুও বাইরের প্রকৃতিতে প্রচুর চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। প্রত্যেকবার আমায় চেষ্টা

করে তাতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে। তখন থেকে আমার যোগের সমগ্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াল বহিঃপ্রকৃতিকে অন্তরের উপলব্ধির ছাঁচে গড়া। আমার সাধনায় তাই-ই আমি করেছি।

নীরদ: তবুও ভিতরের উপলব্ধি হলে—অভিজ্ঞতা নয়—প্রকৃতির গুরুতর দোষগুলি ত থাকবে না? যেমন কামভাব।

শ্রীঅরবিন্দ: কেন নয়? ক্রোধ, কাম থাকতে পারে। দুর্বাসার ক্রোধের কথা বা কামের প্রভাবে ঋষিদের পতনের কথা শোননি? কিন্তু যোগীদের মধ্যে সবাই এই দোষগুলিকে গুরুত্ব দেয় না। যোগীরা পাপপুণ্য, ভালমন্দের উপরে চলে যান। সাধারণ নৈতিক আদর্শ তাঁরা মানেন না। বহিঃপ্রকৃতি তাঁদের কাছে শিশুর খেয়ালের মত, তাকে অন্তরপ্রকৃতির ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা দরকার মনে করেন না।

আমি একসময় মাংসাদি খেতাম। ন' তা দেখে ভয়ানক শক্ পেল এবং রমণ মহর্ষির কাছে গিয়ে তার অভিযোগ জানাল। মহর্ষি উত্তরে বললেন ওগুলো হল অভ্যাসের ব্যাপার। সে চলে গেলে মহর্ষি তাঁর শিষ্যদের বললেন, "লোকটি কী নির্বোধ!"

একবার বরিশাল কনফারেন্সের শেষে আমি মহেন্দ্রনাথ নন্দীর সাথে সাক্ষাৎ করতে যাই। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সর্বত্র টলষ্টয় বলে পরিচিত ছিলেন। তাঁর পিতামহ ছিলেন তান্ত্রিক এবং নদীর উপর বসে ধ্যান করতে পারতেন। তাঁর কাছ থেকে সম্ভবতঃ নন্দী আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করেন। নন্দী বরাবর ভগবানের আদেশে চলতেন। বিপিন পাল একদিন তাঁকে ঠাট্টাচ্ছলে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনার ভগবান যদি আপনাকে একটা অন্যায় করতে আদেশ করেন, আপনি করবেন?' তিনি বললেন, 'যদি ভগবানের আদেশ হয়, করব বই কি।'

ভগবানকে পাওয়ার পথ একটা নয়, কত সত্য রয়েছে! যে কোন পথ অনুসরণ করতে পার। যখন আমি বলি যোগে এটা করবে, ওটা করবে না, তখন আমাদের যোগের কথাই উল্লেখ করি। আমাদের যোগে বহিঃপ্রকৃতির পরিবর্তন না হলে চলবে না।

(কিছুক্ষণ পরে) তোমরা কেউ ম'র খবর রাখ?

সত্যেন্দ্র : তাঁকে আমার কোনদিন বিশেষ ভাল লাগেনি।

শ্রীঅরবিন্দ : আমি যখন তার ছবি দেখি, মনে হল যেন প্রবল প্রাণশক্তিসম্পন্ন আধার। তার সাধনা যেন প্রাণের স্তরের। এসব ক্ষেত্রেই শক্তি সহজে নামে আর এই শক্তির দ্বারা দুর্ভাগ্যবশতঃ মানুষ আকৃষ্ট হয়। আধ্যাত্মিক, চৈত্যিক (psychic), বুদ্ধি (mental) যোগেও শক্তি নামে কিন্তু তাকে চাইতে হয় না, আপনিই সে অবতরণ করে।

বি ছিল ম'র মত। তারও প্রবল প্রাণশক্তি ছিল। একসময় তার সম্বন্ধে আমার উচচ আশা ছিল কিন্তু যাদের সাধনার ভিত্তি হল প্রাণজগতে, তারা, আমি যাকে বলি মধ্যবর্তী জগৎ (intermediate zone), সেখানে চলে যায়, তাকে আর অতিক্রম করে যেতে চায় না। প্রাণ জগৎ হল জঙ্গলের মত, সেখান থেকে এরকম প্রাণশক্তিবিশিষ্ট কাউকে উদ্ধার করা ভয়ানক শক্ত। যারা দুর্বল, যাদের এরকম শক্তি নেই, তাদের উদ্ধার করা ঢের সহজ। বি ভাবত যে সে ভগবানের হাতের যন্ত্র এবং ভগবান তার মাঝে রয়েছেন। এই মোহ থেকে তাকে বাঁচাবার জন্যে আমাদের যথেষ্ট রূঢ় হতে হয়েছে। সেজন্যে সে চলে গেল এবং গিয়ে সে গুরু হয়ে বসল। এই ধরনের লোকদের গুরুগিরি বেশ সুলভ। আমার নাম ভাঙিয়ে এই সব কাণ্ড করত বলে

আমার ভয়ানক অপছন্দ হত। দুর্ভাগ্যবশতঃ তার প্রাণশক্তি যতখানি বলিষ্ঠ ও সমৃদ্ধ ছিল, তার মন সেরকম ছিল না। তার ছিল যোদ্ধার মন, মনস্বীর নয়। আমাদের শক্তিপ্রয়োগের ফলে তার মন কিছুকালের জন্যে স্বচ্ছ হত এবং সে নিজের ভুল দেখতে পেত কিন্তু আবার তার প্রাণের অশুদ্ধি এসে মনকে দখল করে বসত। যদি তার মনটিও অনুরূপ পরিণত হত, তাহলে বোধহয় স্বচ্ছতা বজায় থাকত। বুদ্ধির সাহায্যে তুমি প্রাণ থেকে আলাদা হয়ে সব কিছু সমভাবে দেখতে পার। অবশ্য, মনও ঠেকাতে পারে, কিন্তু ততখানি নয়।

২৩।১২।৩৮

কথা বলার সময়। আগের মত সবাই এসে জুটেছে। শ্রীঅরবিন্দের ইঙ্গিতের অপেক্ষায় চুপ। কিন্তু তিনি কোন সাড়াশব্দ দিচ্ছেন না, বিছানায় নিশ্চিন্তে শুয়ে আছেন।

চম্পকলাল আস্তে আস্তে বিছানার দিকে এগুচ্ছে, আবার আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। আমাদের মনে আশার সঞ্চার হল। তার যুগপৎ দ্বিধা ও আগ্রহের সরস ছবি দেখে আমি সশব্দে হেসে উঠলাম। শ্রীঅরবিন্দ বললেন, ''কি হল?'

পুরাণী: নীরদ হেসে গড়াগড়ি দিচ্ছে।

শ্রীঅরবিন্দ: আনন্দ নেমেছে বুঝি?

আমি অতিকষ্টে উচ্চারণ করলাম 'চম্পকলাল'।

শ্রীঅরবিন্দ: ওঃ চম্পকলাল নেমেছে তাহলে?

এই হাসির হুল্লোড়ে হাওয়াটা পাতলা হল, তখন পুরাণী সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞেস করল : বিরুদ্ধশক্তিরা ভাগবত প্রকাশে বাধা দেয় বলে, এমন কি জয়লাভ করে বলে, এ কথা কি বলা চলে যে ভগবান সর্বশক্তিমান নন ? আমি নিজে তা মনে করি না। প্রশ্নটা অন্যের।

শ্রীঅরবিন্দ : (পুরাণীর দিকে ফিরে) সর্বশক্তিমান অর্থে কি বোঝ ? যদি বলতে চাও যে ভগবান সর্বক্ষেত্রে জয়ী হবেন, নানা বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও, তবেই তিনি সর্বশক্তিমান, তাহলে স্বীকার করতে হবে যে তিনি তা নন। এটাই হল লোকের অদ্ভুত ধারণা। বাধা প্রতিবন্ধক বিবর্তনের নিয়ম। সেটা আসে অজ্ঞতা হতে এবং অজ্ঞতা হল অচেতনের অংশ। সমস্ত সৃষ্টির আরম্ভ হচ্ছে অচিৎ থেকে, সেই অচিৎ আবার ভগবানের অস্তিত্ব পর্যন্ত মানে না। তাঁর লীলার নিয়ম হল বিশ্ব-বিকাশ অগ্রসর হবে বাধা, যুদ্ধের ভিতর দিয়ে। যদি একপক্ষই বরাবর জিতে যায় সেটা কোন ধরনের লীলা হল ? আলোর শক্তি, আঁধারের শক্তি দুইই রয়েছে। আলোর শক্তির সব সময় জয় কামনা করা মানে সত্যের ও মঙ্গলের চিরন্তন জয় প্রত্যাশা করা, যদিও বিশুদ্ধ সত্য ও মঙ্গল বলে কিছু নেই। ভগবান তাঁর অমোঘ শক্তি ব্যবহার করেন শুধু মহা সঙ্কটকালে বা কোন চরম মুহূর্তে।

যতবারই আলো নামতে চেষ্টা করেছে ততবার পেয়েছে বাধা, বিরুদ্ধতা। যীশুকে মানুষ ক্রুশে বিঁধেছে, বুদ্ধকে অস্বীকার করেছে। আলোর সন্তানেরা আসেন, পৃথিবী তাঁদের অস্বীকার করে, প্রত্যাখ্যান করে। পরে নামমাত্র গ্রহণ করে আবার তাদের প্রত্যাখ্যান করবার জন্যে। মুষ্টিমেয় সংখ্যামাত্র ভাগবত জীবন লাভ করে এবং তাদের দ্বারাই তাঁর প্রকাশ ঘটে।

বৌদ্ধধর্মের আজ কি অবশিষ্ট আছে? অশোকের কতগুলো শিলালিপি আর কয়েকহাজার বৌদ্ধ!

নীরদ: অশোক ত বৌদ্ধধর্ম প্রচারে সহায় হয়েছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ: যে কেউ তা করতে পারত।

নীরদ: কিন্তু তাঁর সাহায্যেই তো বৌদ্ধধর্ম এত শক্তিমান হল?

শ্রীঅরবিন্দ: রাজামহারাজারা যদি আধ্যাত্মিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করত অথবা তাদের হাতে ছেড়ে দিত যারা সত্যি আত্মদর্শী, তাহলে আধ্যাত্মিকতার পক্ষেও মঙ্গল হত। Constantine-এর খৃষ্টান হবার পরেই খ্রীষ্টধর্মের অবনতি স্নুরু হল। নরওয়ের রাজা, যার সম্বন্ধে Longfellow কবিতা লিখেছেন, সমস্ত অ-খ্রীষ্টান অধিবাসীদের হত্যা করে খ্রীষ্টধম স্থাপন করল। মুসলমান ধর্ম সম্বন্ধেও একই কথা। মহম্মদের পর শিষ্যেরা হয়ে বসল খলিফা; তখন থেকে ধর্মেরও গ্লানি দেখা দিল। না, রাজামহারাজারা আধ্যাত্মিকতাকে মোটেই বাঁচিয়ে রাখে না, রাখে তারাই যারা সত্যিই আত্মজ্ঞানী।

নীরদ: কিন্তু অশোক বৌদ্ধধর্মের জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করেননি কি?

শ্রীঅরবিন্দ: কিন্তু শেষ অবধি অশোক সম্রাট ছিল না কি? অশোক অশোকই হতে পেরেছে এই পর্যন্ত। রাজা মহারাজা যখন ধর্মপ্রচারে ব্যস্ত হয়, তখন তাকে তারা তাদের মনগড়া রূপ দেয়, তাতে প্রকৃত সত্যটা লোপ পায়।

নীরদ: রমণ মহর্ষিকে ত কেউ চিনত না। প, ব-ই তাঁকে বিশ্বপরিচিত করে।

শ্রীঅরবিন্দ: কে কত বড় যাচাই করবার মানুষের অদ্ভুত মানদণ্ড

হল কার শিষ্যসংখ্যা কত। যে রমণ মহর্ষি সর্বদা শিষ্যপরিবৃত ছিলেন তিনি বড় ? না, যিনি বছর বছর ধরে নির্জনে সাধনা করেছেন, সেই রমণ মহর্ষি বড় ? আধ্যাত্মিক সাফল্যই হল আসল সাফল্য। মাঝে মাঝে আবার এমনও দেখা যায় যে যখন কোন আধ্যাত্মিক আন্দোলন সাফল্য লাভ করে, তখন তার অন্তর্নিহিত সত্য লোপ পায়।

এখন আমাদের আলোচনার প্রসঙ্গ হল নানা আশ্রম। কেউ রমণ মহর্ষির আশ্রম প্রসঙ্গে বলল যে আশ্রমের নিত্য নৈমিত্তিক জীবনের সাথে মহর্ষি কোন সম্পর্ক রাখেন না ; তিনি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও নির্লিপ্ত, তাঁর ভাই-এর উপর আশ্রমের ভার ন্যস্ত।

শ্রীঅরবিন্দ : একটা গল্প শোন। এক ইউরোপীয় মহিলা নাকি মহর্ষির সাথে দেখা করতে যায়, তাঁর সামনে ধ্যান করতে বসে' মশা তাড়াতে সুরু করে এবং মশার উৎপাত সম্বন্ধে মহর্ষির কাছে অভি-যোগ করে। মহর্ষি বলেন, ভদ্রমহিলা যদি মশার কামড় সহ্য করতে না পারেন তাহলে তাঁর দ্বারা যোগ করা হবে না। মহিলাটি কথার গূঢ় অর্থ ধরতে পারল না। মশাবিহীন সাধনা চায়।

আমাদের এখানে তোমরা শিষ্যদের মাঝে ঝগড়ার কথা বল, সেই আশ্রমও ত বাদ যায় না শুনি!

মহর্ষি সম্বন্ধে আর একটি বিখ্যাত গল্প আছে, তোমরা হয়ত সেটা জান। শিষ্যদের এবং আশ্রমের নানা উৎপাতে বিরক্ত হয়ে তিনি নাকি পাহাড়ে কোথাও পালিয়ে যাচ্ছিলেন। এগুতে এগুতে দেখেন যে সমুখের পথ ভয়ানক সরু, দুধারে পাহাড়। আর, এক বুড়ী সটান পা'দুটি লম্বা করে পথ আগলে বসে আছে। মহর্ষি তাকে বহু অনুনয় বিনয় করলেন পথ ছেড়ে দিতে, কিন্তু বুড়ী কিছুতেই ছাড়বে না।

তখন মহর্ষি বেগে তাকে ডিঙিয়ে যাবার উপক্রম করতেই বুড়ীও চটে উঠল এবং বলল, "তুই এত ছটফট করছিস কেন? চরকীর মত না ঘুরে এক জায়গায় বসে থাকতে পারিস না? যা, তোর জায়গায় ফিরে গিয়ে শিবকে পূজা কর গিয়ে।"

কথাগুলো মহর্ষির মনে লাগল এবং মহর্ষি বাড়ীর দিকে ফিরলেন। কিছুদূর গিয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখেন, কই, কেউ ত নেই! তখন তাঁর খেয়াল হল যে মা ভগবতীই তাঁকে আদেশ দিয়ে গেলেন অরুণাচলে ফিরে যেতে।

মা ভগবতীই যে তাঁকে ফেরালেন এতে কোন সন্দেহ নেই। তার অর্থ এই রকম জীবনযাপনই তাঁর ভবিতব্য। পারিপার্শ্বিক ঘটনার সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক রাখার কথা নয়। সদা নির্লিপ্ত ও প্রশান্ত তাঁর স্থিতি, তিনি যা ছিলেন, তাই আছেন।

হাঁ, একটা খবরে আমি বেশ খুসী হয়েছি। মহর্ষি নাকি কোন ভারতীয় খ্রীষ্টানকে বকাবকি করেছেন। তাহলে মহর্ষিও প্রয়োজনে তেজস্বী (dynamic) হতে পারেন! (হাস্য)

একটিমাত্র আশ্রম যেখানে শুনেছি দৃঢ় একতা ছিল সেটা হল ঠাকুর দয়ানন্দের আশ্রম। আমি কর্মযোগিনে অবতার সম্বন্ধে একটা রচনা লিখি। দয়ানন্দের শিষ্য মহেন্দ্র দে সেটা পড়ে আমায় লিখল "অবতার আমাদের এখানে আছে!" *

নীরদ: আমাদের মত দুর্বল ও খুঁতওয়ালা আধারকে নিয়ে কেন গুরুদেব কাজ করতে হয়?

---

* মহেন্দ্র দে সম্বন্ধে বাকী খবরগুলি বাদ দেওয়া গেল; কারণ দয়ানন্দ আশ্রমের সভাপতি জানিয়েছেন যে সে খবরগুলি ঠিক নয়।

শ্রীঅরবিন্দ : সেটা আমার কাছেও হেঁয়ালী। কিন্তু ব্যাপারটা তাই। তবে আমাদের কথা একটু স্বতন্ত্র। আমাদের উদ্দেশ্য হল পৃথিবীকে বদলান, বিশ্বের প্রত্যেককে নয়, নিশ্চয়। কাজেই এখানে গোটা মানব প্রকৃতির নমুনা পাবে, তার বাধা বিপত্তি ক্ষমতা দুর্বলতা সব নিয়ে। (নীরদের দিকে তাকিয়ে) তোমার যে বাধাবিপত্তির কথা বল, তার এই হল ব্যাখ্যা।

২৫।১২।৩৮

ডাঃ রাও (একজন আশ্রমসাধকের বিশেষ বন্ধু) আজ বৈঠকে উপস্থিত। তিনি কোনও হাসপাতালের সুপারিনটেণ্ডেট। শ্রীঅরবিন্দের অসুখের সময় তাঁকেও ডাকা হয় এবং তিনিই মাদ্রাজের Specialist-কে নিয়ে আসেন। তাঁর কথা আগে বলা হয়েছে। তাঁর বিশেষ ইচ্ছা যে নূতন বছরের পয়লা শ্রীঅরবিন্দের পায়ের splintগুলি খুলে নেওয়া হোক। আমরা কেউ তাতে রাজী নই। তিনি এ বিষয়ে Specialist-এর সাথে আলোচনা করেছেন ; তাঁরও মত যে আরও ১০ হপ্তা splint রাখতে হবে। "আমাদের মত মিলল না" বললেন ডাঃ রাও। মা জানতে চাইলেন ডাক্তারেরা তাদের মত বদলায় কিনা। রাও উত্তর দিলেন, Specialist একবার তো বদলিয়েছে। শেষ পর্য্যন্ত তিনি শ্রীঅরবিন্দের হাতে বিচারের ভার দিয়ে বিদায় নিলেন। মা তখন শ্রীঅরবিন্দের মত জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, "কোন বিপদ বা দৈব ঘাড়ে নেওয়া ঠিক হবে না। আমি কি করে

বলব যে ঘুমের মাঝে হঠাৎ কোন ঝাঁকুনি লাগবে না? বিরুদ্ধশক্তিগুলির কথাও ত ভাবতে হবে। Specialist বলছে দশ সপ্তাহ, রাও-এর মতে ছ'সপ্তাহ, মাঝামাঝি একটা রফা করলে দুজনেই সন্তুষ্ট হবে।"

নীরদ : ডাঃ রাও সর্বদাই আওড়াচেছন যে আপনি যখন সাধারণ রোগী নন, ডাক্তারের নির্দেশ মেনে চলা আপনার পক্ষে মোটেই কঠিন হবে না।

শ্রীঅরবিন্দ : অসাধারণ হলে তেমনি অসাধারণ সাবধানীও হতে হবে। কিছুক্ষণ পরে মা চলে গেলে শ্রীঅরবিন্দ বললেন, "ডাক্তারদের অমিল মজ্জাগত। ডাক্তারীশাস্ত্র দেখছি জ্ঞান লাভ করেছে প্রচুর কিন্তু তার প্রয়োগ নির্ভর করে, হয় ব্যবহাবজাত বিচক্ষণতার উপর, (art), নয় আন্দাজের উপর। কোন বিশেষ রোগের বিশেষ অব্যর্থ ওষুধ (specific) বেব হয়েছে এমন দেখা যায় না। এলোপ্যাথির কথাই বলছি। হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে আমি একেবাবে অজ্ঞ। বিস্তর তথ্য তারা বের করেছে কিন্তু সেখানেও কাবও সাথে কারও মিল নেই। আজ যা ঠিক, দশ বছর পরে তা ভুল। টি বি'র কথা ধর না কেন, জনৈক ফবাসী ডাক্তার প্রমাণ করেছে যে এই বোগ বংশগত, সংক্রামক নয়। সত্যি হলে কত বড় স্বস্তির কথা বলত। আমি নিজেও প্রমাণ পাইনি যে এ রোগ সংক্রামক। তারপর, পথ্যের কথা, হরদম তাদের মত বদলাচেছ। একদিন ডাক্তাবীবিজ্ঞান যাথার্থ্য লাভ করবে।

সত্যেন্দ্র : তাছাড়া, ডাক্তারী এখন রীতিমত একটা ব্যবসায় দাঁড়িয়েছে। যেমনি সততার অভাব, তেমনি অপটুতা। আমার বিশ্বাস ডাক্তারী পেশা সরকাবের হাতে থাকলে ভাল হবে।

শ্রীঅরবিন্দ : আমার তাতে বিশ্বাস নেই। ডাক্তারের কাউন্সিল

দ্বারা নিয়ন্ত্রণের চাইতে সরকারের দ্বারা চালান আরও খারাপ, ওটা আমি আরও কম পছন্দ করি।

নীরদ : কেন? London County Council-এর কী সুন্দর ব্যবস্থা! তাদের অধীনে ডাক্তারেরা নিয়মিত সব বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে যায়।

শ্রীঅরবিন্দ : বেচারা যোগীদের তাহলে কি উপায়, যদি তারা পরীক্ষায় রাজী না হয়?

নীরদ : এক এক জন ডাক্তারের অধীনে এক একটি এলাকা থাকে ; ন্যায্য কারণ ছাড়া কোন বাসিন্দা অন্য ডাক্তার ডাকতে পারে না।

শ্রীঅরবিন্দ : যদি ডাক্তারের উপর তার আস্থা না থাকে অথবা তাকে সে পছন্দ না করে?

নীরদ : সে কারণ ত যথেষ্ট নয়, সব ডাক্তারেরাই যখন বেশ বিচক্ষণ?

শ্রীঅরবিন্দ : কেন নয়? চমৎকার কারণ ওটা। পছন্দ অপছন্দের অবকাশ থাকবে না কেন? না, ও সমস্ত সরকারী কড়াকড়িতে আমার আস্থা নেই। আমার মতে মানুষের কিছুটা স্বাধীনতা থাকা চাই, সে নিজের ভালমন্দ কিসে খুঁজে বের করবে; ভুল করবার স্বাধীনতাও তাকে দিতে হবে। নানা ভুলচুকের মধ্য দিয়ে প্রকৃতি আমাদের চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতি যখন ভুলত্রুটি সমেত মানুষের সৃষ্টি করল, সে কি জানত না কি করছে সে? মনুষ্যজীবনে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ ও স্বাধীনতালাভ মস্ত জিনিষ। স্বাধীনতা ছাড়া কোনও উন্নতি হতে পারে না।

নীরদ : কিন্তু চেতনার যথেষ্ট বিকাশ না হলে স্বাধীনতার কুব্যবহার হতে পারে ত?

শ্রীঅরবিন্দ : সে ঝুঁকি আমাদের নিতে হবে। স্বাধীনতা ছাড়া চেতনার বিকাশই বা হবে কি করে? অবশ্য সাধারণ নিয়মকানুন কিছু রাখতে হবে বই কি। স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যরক্ষার বিবিধ নিয়ম তুমি প্রচলন করতে পার (পুঁথিগত বিদ্যারও যথেষ্ট মূল্য আছে); সরকার রোগের প্রতিকারার্থে সুব্যবস্থা করতে পারে কিন্তু মনে রাখতে হবে বাঁধাবাঁধির একটা সীমা আছে, সেটা অতিক্রম করলে ভুলত্রুটির সম্ভাবনা দেখা দেবে। রোগী তার ডাক্তার বদলাতে পারবে না বলা আমার মতে একটু বাড়াবাড়ি।

ভারতবর্ষেই দেখ না কেন। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে কত রকমের পরীক্ষা চলেছে, মায় বামমার্গ পর্যন্ত বাদ যায়নি। তার ফলে কী আশ্চর্য্য সমৃদ্ধ হয়েছে তার আধ্যাত্মিকতা!

এই সমস্ত কড়াক্কড়ির সূত্রপাত হল পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের চাপে। বিজ্ঞান হল যান্ত্রিক নিয়মে আবদ্ধ, নিয়মের কোন নড়চড় নেই। সেখানে কোন বিষয় সম্বন্ধে তুমি স্থিরনিশ্চিত হতে পার। ভুলের সম্ভাবনা নেই। এতটুকু ভুল করেছ ত প্রকৃতি তোমার নাকে ঘুষি বসিয়ে দেখিয়ে দেবে কোথায় তোমার ভুল। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তা নয়। এইসব নিয়মকানুন তুমি মানুষের জীবনে ও মনের উপর ফলাতে যাও, দেখবে ভুলের উপর ভুল করলেও সেগুলো ধরা পড়বে না, যেহেতু তুমি একটি মনগড়া ধারণা নিয়ে বসে আছ, আর চাইছ যে সমস্ত কিছুই সে ধারণার বশবর্তী হয়ে চলুক।

ইউরোপে ত তাই হচ্ছে। **Totalitarian State**গুলি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য থাকতে দেবে না, আর **Non-totalitarian State**গুলি তাদের নকল করতে বাধ্য হচ্ছে। তারা বলে বটে যে এতে কার্যকারিতা

বেড়ে যায়। কিন্তু কার্যকারিতা কার? সরকারের, যান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের, ব্যক্তির নয়। ব্যক্তির স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ায় সে বাড়তে পারে না। সংঘবদ্ধ কর, আপত্তি নেই কিন্তু স্বাধীনতার ও নমনীয়তার (plasticity) স্থান থাকা চাই।

নীরদ: বার্ণাড শ ত ইটালীর Abyssinia অধিকার সমর্থন করেছেন। বলেছেন Denakal মরুভূমি পার হতে হলে প্রাণটা হাতে নিয়ে যেতে হয়।

শ্রীঅরবিন্দ: না গেলেই পারে, কে তাকে মাথার দিব্যি দিচ্ছে?

নীরদ: কিন্তু ঐ অধিকারের ফলে অসভ্য Abyssinia সভ্য হবে ত? ইটালী নিয়ে আসবে তার কৃষ্টি, জ্ঞানবিজ্ঞান, এমন কি চারুশিল্প।

শ্রীঅরবিন্দ: চারুশিল্প? কেন, নিগ্রোদের কোন শিল্প নেই বলতে চাও? আর কৃষ্টি? অবশ্য তুমি যদি কোন নিগ্রো আড্ডায় ঢুকে পড়, তোমার প্রাণসংশয় হতে পারে কিন্তু জার্মাণীতে কি তার কিছু কম হচ্ছে? ইংলণ্ডের ক'জনের সৌন্দর্যজ্ঞান আছে? আর রাস্তাদালানের কথা যদি বল, Port Said দেখেছ ত? কে বলবে যে সেখানকার অধিবাসীরা নিগ্রোদের চাইতে বেশি সভ্য? সাঁওতালদের সম্বন্ধে ফণীন্দ্র বোসের বই পড়েছ? লিখেছে যে সাঁওতালেরাও অন্যান্য সভ্যজাতের মতই সমান নীতিশীল; আরবজাতও তাই। Wilfred Blunt তাদের দরদ ও সততায় মুগ্ধ হয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তোমরা কি বলতে চাও যে বর্তমান কালের সাধারণ মানুষ দুহাজার বছর পূর্বের গ্রীক বা ভারতীয়দের চাইতে বেশি সভ্য? জার্মাণীর অবস্থা দেখ। (হেসে) কাইজার হিটলার সম্বন্ধে কি মন্তব্য করেছেন পড়েছ ত? তবুও বলবে যে এরা উন্নত জাতি?

আমি ভারতে ঘুরেছি কম নয়, লোকজনের সাথে মেলামেশা করেছি যথেষ্ট। দেখেছি তারা ইউরোপের জনসাধারণের অপেক্ষা ঢের ভাল ; আমাদের শ্রমিকরাও তাদের শ্রমিকের চাইতে শ্রেষ্ঠ। তবে ওরা বেশি কর্মপটু হতে পারে কিন্তু সে অন্য কারণে। এখানকার কোন ফরাসী গভর্ণর এক শ্রমিক দাঙ্গার সময় বলে যে শ্রমিকরা এমনি কত ভদ্র ও বিনীত কিন্তু মদ খেলেই তারা গবম হয়ে ওঠে। আমাদের জেলের সেই আইরিশ ডাক্তাবও ভেবে পেত না কি করে আমাদের শান্ত ও সুশ্রী যুবকেরা ঘোর বিদ্রোহী হতে পারে। আমাদের সাধারণ কয়েদীরাও ঢের ভাল।

বরাবরই লক্ষ্য করবে মানুষের মাঝে নানা স্তর রয়েছে। শিক্ষার ফলে যে তারা সবাই এক পর্যায়ে উঠে যাবে এ ধারণা ভুল। আর তোমাদের সভ্যতাও নির্ভেজাল বস্তু নয় যে তাতে শুধু কল্যাণই সম্ভব। নাৎসী জার্মাণীর অবস্থা কি ? সাংঘাতিক ! ব্যক্তিত্ব বজায় রাখা একেবারে অসম্ভব। দেখ একবার ইউরোপের সভ্যজাতির চেহারা। সেখানে মানুষ বাস করছে এক ভয়ানক উত্তেজনার মাঝে ; এই উত্তেজনা চরমে উঠলে হয় হুড়মুড় করে একদিন গোটা ইমারত ধূলিসাৎ হবে, নয় মানুষের সারা জীবনটাই পিষে মারবে। দুই ক্ষেত্রেই ফল হবে মহতী বিনষ্টি।

মোটের উপর দেখা যাচেছ্ সমাজ তার সাবেক ব্যবস্থাতে ফিরে যাচেছ্, শুধু আকারটা আলাদা। অভিজাত সম্প্রদায় নিয়ে সেই পুরাতন রাজতন্ত্র, আর জনসাধারণ, এই দুই শ্রেণী ; এরই পুনরুত্থান। **Fuhrer** অর্থাৎ নেতা হল রাজা, তার দল সম্ভ্রান্ত অভিজাতগোষ্ঠী, নীচে জনসাধারণ। ফ্যাসিজ্‌ম, কম্যুনিজম ভোলবদল মাত্র। কেবল ব্রাহ্মণ বা চিন্তাশীল মনীষীদের কোন স্থান নেই।

একটা অদ্ভুত বিষয় নজর করবে যে যখনই কোন কিছুর উপর একটা মার্কা লাগিয়ে দেওয়া হয়, তখন সেটায় ঘুণ ধরে। লেবেলটা পাবার আগে ডিমোক্রেসিতে সার জিনিষ ছিল কিন্তু যেই তার নামকরণ হল, ভিতরের সত্যটা গেল নষ্ট হয়ে।

নীরদ : হ সোসিয়ালিজমের দারুণ ভক্ত ছিল, বলত ভগবানহীন স্বর্গ সেটা।

শ্রীঅরবিন্দ : গেল না কেন সেই স্বর্গে? মজাটা টের পেত, তৎক্ষণাৎ তাকে দাবিয়ে রাখত পুরোমাত্রায়। আমি আগেই বুঝতে পেরেছি যে Socialism ব্যক্তির স্বাধীনতা থাকতে দেবে না।

......Communism আর Nazism এ কোন তফাৎ নেই?

শ্রীঅরবিন্দ : অতি সামান্য। Nazi-রা নিজেদের বলে National Socialist, আর অন্যরা Socialist. কম্যুনিজমে সাধারণ লোকের রাজত্ব, আলাদা কোন শ্রেণীর স্থান নেই। তারা শ্রেণী তুলে দিয়েছে, তবে বলেছে এটা হল সাময়িক পরিবর্তনের অবস্থা। নাৎসীরা শ্রেণী রেখেছে কিন্তু সকলকেই সরকারের অনুগত হতে হবে। সরকারই সর্বেসর্বা, কম্যুনিজমেও তাই।

নীরদ : কিন্তু কম্যুনিজম ত সুরু হয় বড় আদর্শ নিয়ে। নাৎসী বা ফ্যাসিজম্ থেকে সেটা নিশ্চয়ই ভাল, সাধারণ লোক সেখানে রাজ্য চালায়।

শ্রীঅরবিন্দ : কোন হিসাবে ভাল? আগে তারা ছিল অচেতন দাস, এখন হয়েছে সচেতন দাস। আগে কোন কারণে অসন্তুষ্ট হলেই ধর্মঘট করতে পারত, এখন পারে না। আসল কষ্টিপাথর হল মানুষের স্বাধীনতা আছে কি না। ব্যক্তিমাত্রেরই সেখানে সরকারের চাকায়

হাত পা বাঁধা, ডিক্‌টেটর আব পার্টি শুদ্ধ। ডিক্‌টেটার মনোনীত করবার পর্যন্ত কারও ক্ষমতা নেই। আর যদি কেউ তাদের সাথে একমত না হয়, তাকে নিষ্ঠুরভাবে পিষে মারবে। সেখানকার হালচাল কি রকম জানই ত।

নীরদ : কিন্তু শ্রেণীগত পার্থক্য চলে যাওয়ায় এখন ত সকলেই সমান ; উঁচুনীচু ছোটবড় নেই।

শ্রীঅরবিন্দ : কি করে ? প্রথমে তারা চেষ্টা করল জেনারেল ও সৈন্যদের দ্বারা কলকারখানাদি চালাতে ; যখন সুবিধা হল না, ডাক পড়ল বিশেষজ্ঞদের মোটা মাহিনায় ও অন্যান্য সুযোগ দিয়ে। কিন্তু সাধারণ শ্রমিকদের অবস্থা তথৈবচ, ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে যা, ওখানেও তাই। কিছু ভাল ব্যবস্থা করেছে মানতে হবে, স্ত্রীলোক ও শিশুদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে, কিন্তু সেটা ত ফ্রান্সে সুরু হয়েছিল। **Deroli** (?) বলে একটা সৌখিন জায়গা মজুরদের তারা ছেড়ে দিয়েছে।

নীরদ : তাহলে **Romain Rolland**দের রাশিয়া নিয়ে এত মাতামাতি কেন ?

শ্রীঅরবিন্দ : তারা **Socialist** ব'লে। তাদেরও ত এখন চোখ খুলছে। বহু ফরাসী শ্রমিক দল বেঁধে রাশিয়ায় বেড়াতে যায় কিন্তু হতাশ হয়ে ফিরে আসে। ডিমোক্রেসী সম্বন্ধেও একই কথা। লোকে ভাবল এবার বুঝি তাদের প্রচুর স্বাধীনতা মিলবে কিন্তু মোহ ভাঙতে বেশি দেরী হল না।

নীরদ : কিন্তু আগে তারা ছিল সম্রাটের দাস, এখন তাদের আপনজনের দাস।

শ্রীঅরবিন্দ : মোটেই না। কোথেকে পেলে এই ধারণা ?

সম্রাটের সাথে রাজ্যশাসনের কোন সম্বন্ধই ছিল না। রাজ্য চালিয়েছে বিত্তশালীর দল। এখনও তাই, যে নামই তুমি দাও না কেন। রাজনীতিই হল একেবারে আগাগোড়া জোচ্চুরী; রাজনীতির কল দিয়ে মানুষ বদলান অসম্ভব। তা হয় না।

২৬-১২-৩৮

সময় বিকেল ৫৷৷০টা। আমাদের মাঝে চারজন উপস্থিত, পুরাণী এখনও আসেনি। শ্রীঅববিন্দ বিছানায় শুয়ে। আমরা তাঁর মাথার দিকে বসে আস্তে আস্তে গল্প করছি। কোন একটা কথায় চম্পকলালের চাপা হাসি হঠাৎ ফেটে পড়বার উপক্রম হওয়াতে সে ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল। আমরা কোনমতে হাসি দমন করে রইলাম।

সাড়ে ছ'টায় যখন আমরা শ্রীঅরবিন্দের বিছানার পাশে এসে বসেছি, আমাদের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "কি নিয়ে ভাগবত অবতরণ হল?" আমি বললাম যে চম্পকলালের মাঝে হঠাৎ আনন্দের স্রোত নেমেছে তাই মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছিল।

শ্রীঅরবিন্দ: ওঃ, তাহলে বিষ্ণুর আনন্দ নেমেছে!

এই রসিকতায় উৎসাহিত হয়ে আমরা তাঁর আরও কাছে এসে বসলাম, চম্পকলাল কথা সুরু করল, "আমি জানি না কেন এত সহজে আমার মাঝে হাসির ঢেউ ওঠে। আগে তেমনি সহজে স্বল্প কারণে কান্না পেত। বোধহয় আমার জীবন বেশি বহির্মুখী বলে এরকম হয়, নয় কি?"

শ্রীঅরবিন্দ : এটা হল প্রাণের উপরকার স্তরের প্রতিক্রিয়া। সেটা সহজে কোন সামান্য জিনিষের স্পর্শেই সাড়া দেয়। প্রকৃতিতে একটা বালভাব আছে, যেটা এরকম ফেটে পড়ে। যোগীদের বালভাবও ঠিক এই ধরনের জিনিষ, সেটাও অল্পে মেতে ওঠে। প্রাণের গভীর স্তরগুলি তেমন সহজে সাড়া দেয় না।

ইতিমধ্যে দেখা গেল ডাক্তার বেচারলাল দ্বিতীয় প্রশ্নের জন্যে তৈরী হচেছন। তাঁর চোখমুখের ভঙ্গী, ঠোঁটের কাঁপন ইত্যাদি অনুকূল সাক্ষ্য দিচেছ। পরেই জিজ্ঞেস করলেন, "আত্মদান কাকে বলে? কি করে তা করা যায়?"

প্রশ্নটা শুনে শ্রীঅরবিন্দ বিস্মিত অথচ কৌতুকপূর্ণ মুখভঙ্গী করে বললেন, "কি করে করা যায়? তা ত জানি না। লোকে করে থাকে এটাই জানি।"

চম্পকলাল এই প্রসঙ্গে বাধা দিয়ে বলল যে তার চোখ সব সময় আর্দ্র থাকে। শ্রীঅরবিন্দ উত্তরে বললেন, "Horace এবং Virgil-এর চোখও সব সময় ওরকম আর্দ্র থাকত। একবার সাহিত্যের মস্ত মুরুব্বী Mycaenas তাদের দুজনের মাঝখানে বসে বললেন, কান্না আর দীর্ঘশ্বাসের মাঝখানে আমি বসে আছি। (হাস্য)

শ্রীঅরবিন্দ আবার আগের প্রসঙ্গে ফিরে এলেন। বেচারলালের দিকে তাকিয়ে "প্রাণ, মন ও চিত্ত—এদের ভগবানের কাছে সঁপে দিতে হবে; কামনাবাসনা, আসক্তি ইত্যাদি বর্জন করা চাই, তাহলে ভাগবত চেতনা অন্তরে জেগে ওঠে এবং বৃদ্ধি পায়।"

বেচারলাল : ধ্যানের পক্ষে দিন কি রাতের চাইতে বেশি উপযোগী? আমার ধ্যান রাতেই ভাল জমে।

শ্রীঅরবিন্দ : না। সেটা কতকটা অভ্যাসের জন্যে, কতকটা রাতের শান্তিময় পরিবেশের জন্যে। রাত্রের এবং ভোরের এই শান্ত অবস্থা ধ্যানের খুব অনুকূল। এইজন্যে আমরা বলি ধ্যানের একটা নির্দিষ্ট সময় থাকা ভাল : এরকম অভ্যাস করলে সাড়াও পাওয়া যায় সেই সময়ে। লেলে আমায় দু'বার ধ্যান করতে বলেন, কিন্তু যখন শুনলেন আমি মোটেই ধ্যান করছি না, বলে উঠলেন যে আমায় শয়তানে পেয়েছে। ধ্যান যে অহরহ আমার মাঝে চলছিল সেটা বলবার অবসরই দিলেন না।

নীরদ : মাঝে মাঝে ধ্যান ত আপনিই হয়।

শ্রীঅরবিন্দ : হাঁ, তখন তোমায় ধ্যানে বসতেই হবে। নতুবা ভয়ানক অস্বস্তি বোধ হয়। মণিলালের ত তাই হত।

বেচারলাল : সেদিন রাত্রে আমি যখন এখানে ধ্যান করছিলাম, তখন গভীর শান্তি ও আনন্দ নেমেছিল, সাথে সাথে আপনার দর্শনও পেলাম এবং দেখলাম 'আন্তরিকতা (Sincerity) ফুলটি। কিন্তু রাত বেশি হয়ে যাচেছ বলে ঘুমোবার জন্যে চলে গেলাম। ভয় হল যে ঘুমের অভাবে অসুখ হতে পারে। ফুলটা দেখার কোন অর্থ আছে কি ?

শ্রীঅরবিন্দ : আছে বই কি। বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে সেটা এসেছে : তোমায় সেটা চাইতে হবে। আন্তরিকতার অর্থ জান ত ? তোমার সত্তার সমস্ত প্রবৃত্তি ভগবানের দিকে ফিরাতে হবে।

নীরদ : ভয়টা কি মানসিক নয় ? বেশিক্ষণ বসে থাকলে অসুখে পড়বে ?

শ্রীঅরবিন্দ : বসে থাকলে নয়, রাত জাগলে শরীরটা অসুস্থ হতে পারে। শরীরের একটা সীমা আছে। প্রাণ অপর্যাপ্ত শক্তি

শান্তি ইত্যাদি পেতে পারে কিন্তু শরীরকে তার সামর্থ্যের বেশি বোঝা চাপান যায় না। এই ভুলটাই ঘটেছিল অনেক সাধকদের বেলায়। ম একসময় কাজে এত প্রচণ্ড বেগ অনুভব করত যে সমস্ত আশ্রমটাই যেন সে একা পরিষ্কার করতে পাবত। কাজ বাড়িয়েই চলল, ফলে এল প্রতিক্রিয়া। শক্তি আসে কোন বিশেষ কাজের জন্যে, কাজ বাড়াবাব জন্যে নয়। তুমি যদি বাড়াবাড়ি কর, তাহলে তার ফল ভোগ করতে হবে। সাধনায়ও কিছুটা কাণ্ডজ্ঞান বিচারবুদ্ধি থাকা চাই।

চম্পকলাল: আমিও মা'র সাথে কাজ করবার সময় অফুরন্ত জোর পেতাম—দিনরাত খেটেও ক্লান্তি আসত না। মাত্র ২।১ ঘন্টা ঘুমেব পর বেশ তাজা হয়ে উঠতাম।

শ্রীঅববিন্দ: তার কাবণ তুমি শক্তির উৎসের দিকে নিজেকে খুলে ধরেছিলে। আর ঘুম সম্বন্ধে, ১০ মিনিটের ঘুম হলেই যথেষ্ট। অবশ্য সেটা মোটেই সাধাবণ ঘুম নয়, বলতে পার একধরনের সমাধি। যদি কেউ সমতা বজায় রেখে শক্তি নামাতে পারে তবে এসব জিনিষ সম্ভব। এই যে বললাম, যখন প্রাণের স্তরে আমাদের কাজ চলত, অনেক সাধকের এরকম ভাব হত কিন্তু সাধনা দেহে নামার পর আর সেই বেগ রইল না। সাধকদের মাঝে এল অবসাদ, আলস্য, কাজে অনিচ্ছা। অতিরিক্ত খাটুনীর দোহাই দিয়ে শারীরিক অসুখের ধুয়া তুলল, আর তাতে যোগ দিল ডাক্তারেরা। হ'র মত কি জান ত? সে বলে যে, এখানে লোক এসেছে ধ্যান করতে, কাজ করতে নয়।

নীরদ: শুধু কি তাই? সে আরও বলছে যে সাধকের সংখ্যা বাড়িয়ে আপনারা প'র ও তার কাজ বাড়াচ্ছেন। সে আপনাদের সাহায্য করছে।

শ্রীঅরবিন্দ : সাহায্য করছে ? আমার ধারণা সে একাই আশ্রম চালাচ্ছে।

আমি জোর করে বলতে পারি যে দেহস্তরে না নেমে যদি আমরা অন্যান্য যোগাদের মত প্রাণ ও মনের স্তরে থাকতাম, রূপান্তরের চেষ্টা না করতাম, তাহলে সাধনাব চেহারা বদলে যেত।

এই সময় মা এসে কিছুক্ষণ ধ্যান করে চলে গেলেন। আমাদের কথা আবার আরম্ভ হল। কে যেন বলল যে আমার ধ্যান খুব জমেছে, কেননা মা'র চলে যাওয়া আমি টেবই পাইনি।

নীরদ : ভাল ধ্যান ? কি করে বুঝলে ?

শ্রীঅরবিন্দ : তোমার মাথা ঝুঁকে পড়া দেখে বোধ হয়।

নীরদ : জানি না, তবে নানারকম অসংলগ্ন জিনিষ দেখছিলাম বটে। উপরকার চেতনার কাজ বোধ হয়।

শ্রীঅরবিন্দ : উপরকার চেতনারই কিন্তু ভিতরের প্রাণ-সত্তায়। এ সব খুবই পরিচিত ব্যাপাব। যখন আরও ভিতরে যাবে, তখন এগুলি কিছুই দেখবে না। উপরকার চেতনা এবং ভিতরের প্রাণ-সত্তার মাঝামাঝি একটা এলাকা আছে যেটা এই সমস্ত অদ্ভুত কল্পনার ও স্বপ্নের রাজ্য। তারা বাহ্যতঃ অসংলগ্ন বটে, কিন্তু তাদের খেইটা পেলে দেখবে যে সমস্ত আবোল তাবোল একটা সামঞ্জস্যে বাঁধা রয়েছে। তার বহু দৃষ্টান্ত আমি পেয়েছি। যেমন বস্তুজগতে ইঁদুরের হাতী হবার কোন অর্থ নেই, কিন্তু প্রাণজগতে তার অর্থ আছে। এই জগৎ থেকেই আধুনিক বিদকুটে চিত্রকলা সব আসে, যেমন অমুকের। ইউরোপায়ানরা এই জগৎকে বলে **goblin world,** ভুতুড়ে জগৎ।

নীরদ : এরা কি ছবিগুলি আঁকবার আগে দেখতে পায় ?

শ্রীঅরবিন্দ : মনে ত হয় না, তবে কারও কারও সে ক্ষমতা থাকতে পারে।

নীরদ : কিন্তু অমুকের ছবিগুলির কি করে সবাই এত প্রশংসা করে ?

শ্রীঅরবিন্দ : সবাই বলে অদ্ভুত, চমৎকার! সেও শেষে বিশ্বাস করে, তাই ত!

এবার কথা আরম্ভ হল আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে। কে একজন বললে যে একবার ধ্যানে তার পরিষ্কার অনুভব হল যে তার মাথাটা শূন্যে ঝুলছে, বাকী দেহটার কোন অস্তিত্বই নেই।

শ্রীঅরবিন্দ : ওটা হল অন্যান্য অংশ হতে মানস-সত্তার পৃথক হয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা।

নীরদ : কোন সাধকের কখন কি অভিজ্ঞতা হয় আপনি কি জানতে পারেন, বিশেষতঃ সেগুলো যদি উঁচুধরণের হয় ?

শ্রীঅরবিন্দ : না, আমি জানি না, কারণ আমার সাথে সাধকদের সম্পর্ক নেই। কিন্তু মা জানেন। যখন চেতনার উপর কোন ক্রিয়া চলে, তখন মা সাধকের মাঝে পরিবর্তন লক্ষ্য করেন। সাধকের সাথে ধ্যান করলে কে কোন ধারায় চলছে তিনি বুঝতে পারেন; কখনও তাকে তার পথ বলে দেন এবং পরে কি কি পরিবর্তন হয়েছে তাও বুঝিয়ে দেন।

নীরদ : যে সমস্ত অভিজ্ঞতা হয়, সেগুলো কি আপনাদেরই দেওয়া জিনিষ ?

শ্রীঅরবিন্দ : তা কেন ? আমাদের জিনিষ তোমাদের উপর চাপাবার প্রয়োজন কি ? তোমাদের স্বাধীন বিকাশ হোক। কারও

কোন খারাপ অবস্থায় বা যার বরাবর ভুল পথে যাবার অভ্যাস, তাকে শক্তি দিয়ে আমরা সাহায্য করি। সাধক যদি নিজে অগ্রণী হয়ে সহযোগিতা করে, তাহলে কাজ বেশ সহজ হয়। কিন্তু যদি সে কোন সাড়া না দিয়ে জড়ভরতের মত বসে থাকে, তখন অনেক সময় নষ্ট হয়। শক্তি আসে যায়, আবার ফিরে আসে এবং আখেরে জয়লাভ করে। যদি সাধকের সহযোগিতা পাওয়া যেত, তাহলে দশভাগের এক ভাগ সময়ে কাজ সমাধা হত।

২৭-১২-৩৮

শ্রীঅরবিন্দ আজ নিজেই আলাপ সুরু করলেন। পুরাণীকে সম্বোধন করে বললেন, "অমুক নাকি তার গাড়ীতে চলাফেরা করছে পাশে একটা শরীররক্ষী এবং গাড়ীর সামনে পেছনে দুটো মটর পুলিশ নিয়ে?" এখন পণ্ডিচেরী-পলিটিক্স নিয়ে আলোচনা চলতে লাগল, কিছুক্ষণ পরে শ্রীঅরবিন্দ মন্তব্য করলেন, "যখন পণ্ডিচেরী ও কলকাতা করপোরেশনের অবস্থা দেখি, তখন আমি ভাবি কী করে স্বরাজের জন্যে আমি এত মরীয়া হয়েছিলাম। স্বায়ত্তশাসনের যে আমরা উপযুক্ত নই এই দুটি জায়গাই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। এদের কাণ্ড দেখে সমস্ত উৎসাহ উবে যায়।"

নীরদ: কংগ্রেস শাসনের পূর্বেও কি করপোরেশন এত খারাপ ছিল?

শ্রীঅরবিন্দ : না, এতখানি ময়লা ঢুকতে পারেনি, অন্ততঃ এরকম দুর্নামের কাহিনী আমাদের কানে আসেনি। অন্যান্য মিউনিসিপাল শাসনগুলিও একই জাতের, নিউইয়র্ক, চিকাগো পর্যন্ত। কখনও কখনও প্রতিষ্ঠানের কর্তাও বাদ যায় না। দু' একটা মেয়র এসে মাঝে-মাঝে আস্তাবল পরিষ্কার করতে চেষ্টা করে বটে কিন্তু আবর্জনা দূর করার পর বলা মুস্কিল আগের না পরের অবস্থা ভাল। চিকাগোর মেয়র Al Caponé ছিল নামজাদা গুণ্ডা কিন্তু সমস্ত জজ, পুলিশ-কর্মচারী ছিল তার কেনা।

ফ্রান্সেও একই অবস্থা। ডিমোক্রেসীর উপর যে মানুষ খাপ্পা হয়ে উঠবে আশ্চর্য কি? কেবল ইংলণ্ডে ততখানি অসাধুতা ছিল না। ওরাই হল একমাত্র জাতি যারা পার্লামেন্ট শাসন চালাতে পারে, ওটা তাদের একেবারে মজ্জাগত।

পুরাণী : আমাদের ভারতীয় পদ্ধতিই তাহলে শ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে। সেটা কি করে এমন কৃতকার্য হয়েছিল?

শ্রীঅরবিন্দ : ভারতীয় পদ্ধতির মূল ছিল জীবনের মাঝে, সেখান থেকে তার জন্ম ও বৃদ্ধি। শাসনকার্যে প্রত্যেক ব্যবস্থার, প্রত্যেক বৃত্তির ও প্রত্যেক পেশার স্থান দেওয়া হত। রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, সাধারণতন্ত্র সবই ছিল। কিন্তু ইউরোপের পদ্ধতি হল উল্টো। তার জন্ম হল মন থেকে, যুক্তিই তাকে চালায়। স্বাধীনতার বা বৈচিত্র্যের কোন অবকাশ সেখানে নেই, সমস্ত কিছু একেবারে কাটাছাঁটা মাপা-জোখা। সাধারণ-তন্ত্র যদি হয়, ত তাই; অন্য কিছুর জায়গা নেই। মোটেই নমনীয় হতে পারে না।

ভারতবর্ষ এখন সেই পশ্চিমের নকল করছে। পার্লামেন্ট

শাসন-পদ্ধতি মোটেই এ দেশের ধাতে সইবে না। স্যার আকবর হায়দ্রাবাদে এক নূতন ধরনের স্বায়ত্ত শাসন চালাবার চেষ্টা করে। তাতে রাষ্ট্রপতি হ'ত সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। হিন্দুরা সেখানে সংখ্যায় অধিক বলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে লাগল যে, তারা সংখ্যায় কম হয়েও অধিকাংশ চাকরী দখল করে নেয়। কিন্তু স্যার আকবরের পদ্ধতি অনুসারে প্রায় সকল শ্রেণীর (interest) শাসনযন্ত্রে স্থান হত; কাজেই হিন্দুরা অবাধে নিজেদের ন্যায্য অধিকার পেত, কিন্তু সেই পুরোণো দায়িত্বপূর্ণ শাসনের বুলি তুলে সমস্ত প্ল্যানটা পণ্ড করে দিল। লোকে ভাবে না ত মোটেই, মনের মাঝে যে একটা অচল ধারণা খাড়া করে রেখেছে, সব কিছুকে তার সাথে খাপ খাওয়াতে চায়। ইউরোপ যা বর্জন করছে আমরা তাই গ্রহণ করছি।

সত্যেন্দ্র : হায়দ্রাবাদে না হয় সেটা সম্ভব হত, নিজাম আছে বলে; কিন্তু ভারতবর্ষে? আপনার মতে ভারতবর্ষে আদর্শ শাসনযন্ত্র কি রকম হওয়া উচিত?

শ্রীঅরবিন্দ : কেন? স্যার আকবরের প্লান এখানেও চলতে পারে। রবীন্দ্রনাথ একসময় যা লিখেছিলেন তার সাথে আমার মতের অনেক মিল আছে। ধর, সকলের উপরে থাকবে রাষ্ট্রপতি, তার প্রচুর ক্ষমতা থাকবে যাতে কোন শাসনব্যবস্থা (policy) স্থির করা হলে বিনা বাধায় সেটা কাজ করে যেতে পারে। আর থাকবে জাতির প্রতিনিধি-দের নিয়ে একটি রাজ্যসভা। প্রদেশগুলি একত্র হয়ে ফেডারেশন গড়ে তুলবে। কিন্তু স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকবে তাদের সমস্যানুযায়ী আইনকানুন করবার। মুসোলিনী ভারতীয় পদ্ধতির সারাংশ নিয়েই সুরু করেছিল কিন্তু পরে জোর জবরদস্তি চালাল

এবং সাম্রাজ্যের লোভে অন্যান্য জাতির সাথে লাগাল ধাপ্পাবাজি। তার প্রথমকার আদর্শ যদি বজায় রাখত, তাহলে সে মস্ত এক স্রষ্টা হত।'

পুরাণী: ডাক্তার ভগবান রাও প্রস্তাব করেছেন যে চল্লিশ বছরের উর্ধ্বে হওয়া চাই ব্যবস্থাপক সভ্যদের বয়স! ঋষিদের মত তারা হবে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত।

শ্রীঅরবিন্দ: ঋষিদের ব্যবস্থাপক সভা? তাতে সুফল হবে বলে ত মনে হয় না, কারণ তারা সবাই মিলে ঝগড়া সুরু করে দেবে। নানা মুনির নানা মত। পুরোনো কালে ঋষিরা রাজাদের চালাতে পারত এই জন্যে যে তারা নানা জায়গায় ছড়িয়ে থাকত।

পুরাণী: তাঁর মতটা কতকটা ব'-এর মতের সামিল। সব বড় লোককে একজায়গায় জড়ো করানো।

শ্রীঅরবিন্দ: (হেসে) আর Kilkenny বেড়ালের মত কোন্দল করা?

কংগ্রেসের কথা নাও। এখন তাকে ফ্যাসিষ্ট প্রতিষ্ঠানেরই অনুরূপ কিছু মনে হয় না কি? সোসিয়ালিষ্টরা ছাড়া আর কেউ প্রতিবাদের বা মতানৈক্যের সুযোগ পায় না। আর সোসিয়ালিষ্টদেরও ভিন্ন মতের স্বাধীনতা দেওয়া হয় যতক্ষণ না সেটা প্রকৃত মতান্তরে পরিণত হয়। কংগ্রেসের সমস্ত প্রস্তাব সমস্ত প্রদেশ মেনে নিতে বাধ্য তাদের পক্ষে উপযোগী হোক আর না হোক। অন্য কোন স্বাধীন মতের কোন অবকাশ নেই। আগে থেকেই সব কিছু স্থির করা হয়ে গেছে, লোকজন তা নিয়ে আলোচনা করতে পারে মাত্র। ঠিক যেন ষ্টালিনের পার্লামেন্ট। আমরা যখন আন্দোলন আরম্ভ করি, আমরা প্রথমেই চেয়েছিলাম মুষ্টিমেয় কংগ্রেস নেতার শাসনতন্ত্র (Oligarchy) ভেঙ্গে

দিয়ে সমস্ত কংগ্রেসকে জনসাধারণের অধিকারে আনতে।

পুরাণী : শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার গান্ধিজীর সাথে একমত হতে পারলেন না বলে কংগ্রেস ছেড়ে দিলেন। গান্ধিজী কংগ্রেসকে ধর্মান্দোলন করে তুলছেন। রাজনীতিতে ধর্মকে টেনে আনা কেন এই তাঁর আপত্তি।

শ্রীঅরবিন্দ : চরকা হল বিশ্বাসের মূল মন্ত্র (article of faith)। যারা সূতা কাটবে না তারা কংগ্রেসের মেম্বর হতে পারবে না। কিন্তু গান্ধির দলের ক'জন সেই মন্ত্রে বিশ্বাস করে? সামান্য কয়েক আনা উপার্জনের জন্যে এতখানি শক্তির অপব্যয় দেখেছ কখনও?

পুরাণী : তাঁর এই আইন করার উদ্দেশ্য বোধ হয় সবাইকে নিয়মাধীন করার জন্যে।

শ্রীঅরবিন্দ : নিয়মাধীন কর কিন্তু একবার এভাবে জোর চালালে তার শেষ হবে না।

পুরাণী : কৃষিপ্রধান দেশে এটা চালু হয়নি ; যেসব দেশে বেশী লোক বেকার সেখানে কৃতকার্য হতে পারে।

নীরদ : বাংলায় ত হয়নি।

শ্রীঅরবিন্দ : না। দুর্ভিক্ষের সামান্য উপশম করবার জন্যে সেটা চালাতে পার কিন্তু তাকে ভারতবর্ষব্যাপী আন্দোলনের বিষয় করে তুললে হাস্যকর না হয়ে পারে না। যদি এমন কোন প্রোগ্রাম করা যায় যা কৃষিজীবীদের অবস্থার অনুকূল হবে, তাকে বলা যায় যুক্তিসঙ্গত। তাদের সাধারণ শিক্ষা দাও, শিল্পশিক্ষা দাও, কি করে সংঘবদ্ধ হতে হবে—রাজনৈতিক ব্যাপারে নয়, ব্যবসায় সম্পর্কে—সেটা শেখাও।

কিন্তু গান্ধি ত শিল্পানুষ্ঠান চান না, চান সেই পুরাতন সভ্যতায় ফিরে যেতে, তাঁর ম্যাজিক মন্ত্র হল "সূতা কাট, সূতা কাট।" এগুলো হল অন্ধ বুলি (**fetish**)। চিত্তরঞ্জন এবং অন্য কয়েকজন নেতা আছে বলে ভারসাম্য রক্ষা হচ্ছে।

ডেনমার্ক ও আয়ারল্যাণ্ড তাদের কৃষিকাজ কেমন সুশৃঙ্খলায় গঠন করে তুলল! এখন কেবল তাদের দুরবস্থা দেখা দিয়েছে অন্যান্য দেশগুলিও আত্মনির্ভরশীল হচ্ছে বলে। এ রকম একাধিপত্যে (**autarchy**) আমার কোন আস্থা নেই, কেননা সেটা হল জীবনের মূলনীতির বিরুদ্ধে। জাতির পক্ষে সেটা মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়।

পুরাণী : এখন ত আর এক সমস্যা দেখা দিয়েছে। হিন্দীকে সাধারণ ভাষা করা সম্বন্ধে আপনি কি বলেন? আমার ত মনে হয় ইংরেজী আমাদের এতখানি জায়গা অধিকার করে আছে যে তাকে তাড়ান শক্ত হবে, সমীচীনও হবে না।

শ্রীঅরবিন্দ : ইংরেজী রাখা ঠিকই হবে, এমন কি প্রয়োজনীয় হবে যদি ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক পর্যায়ভুক্ত হয়। তখন ইংরেজীকে সাধারণ ভাষা করতেই হবে, বিশেষত ফরাসী ভাষাকে বেদখল করে যখন ইংরেজী বিশ্বভাষায় দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের জাতীয়-ভাব তা বরদাস্ত করবে না। ইংরেজী আবার বিদেশী ভাষা। তবে হিন্দীও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীর স্থান নিতে পারবে না, প্রাদেশিক ভাষারও নয়। জাতীয় ভাব যখন জাগবে ও বাড়বে, তখন কি হবে বলা শক্ত। আয়ারল্যাণ্ডে বিদ্রোহের আগে তারা ইংরেজী তাড়িয়ে **Gaelic** ভাষা চালু করতে চায় কিন্তু কালক্রমে এবং পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার সাথে সাথে তাদের উৎসাহ উবে গেল, ইংরেজী ফিরে এল।

এর পরে ঈহুদীদের সম্বন্ধে কথা উঠল। কি সূত্রে জানি না। পুরাণী বলল যে ঈহুদীদের উপর কেন হিটলার এত অত্যাচার করছে বুঝতে পারছে না।

নীরদ: গতযুদ্ধের সময় নাকি ওরা জার্মাণীর প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করে?

শ্রীঅরবিন্দ: বাজে কথা! বরং তারা জার্মাণীকে বিস্তর সাহায্য করেছে। তারা খুব চতুর জাত কিনা, তাই সবাই তাদের হিংসা করে। কিম্বা কোন কিছু ভুল হলেই ঈহুদীদের দেখিয়ে বলবে, ওরাই নষ্টের গোড়া, কেষ্টাবেটাই চোর। গলদ কোথায় বের করার চাইতে এটা ঢের সোজা ত! কিম্বা মানুষের প্রকৃতি চায় একটা dummy যার উপর ঘুষি অভ্যাস করা যায়। তাই জনতার চীৎকার "ঈহুদী, ঈহুদী!" ঈহুদীদের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীর কথা তোমাদের ত বলেছি: যখন তারা অত্যাচারে বিপর্যস্ত ও বিতাড়িত হয়ে Jerusalem-এ গিয়ে পৌঁছবে তখন স্বর্ণযুগ দেখা দেবে।

ঈহুদীরাই তো জার্মাণীর বাণিজ্য-জাহাজ ও নৌশক্তি তৈরী করেছে। আর এদের দানই পৃথিবীকে সর্বদিকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়েছে অনেকখানি।

কিন্তু অন্যান্য জাতির মাঝেও এ ধরনের বিরাগ দেখা যায়। ইংরাজরা স্কচদের পছন্দ করত না, বাণিজ্যে ব্যবসায়ে তারা স্কচদের কাছে সর্বত্র হেরে গেছে বলে। Punch-এ একটা বিখ্যাত গল্প আছে। দুজন বলাবলি করছে 'Bill, ওই লোকটি কে?' Bill উত্তর দিল, 'চল্ ওকে ধরে মার দিই, লোকটা বিদেশী।'

তারপর বাংলায় কি? পশ্চিম বাংলার লোকেরা পূর্ব বাংলার

লোকদের ডাকে বাঙাল, এমন কি একটি ছড়াও তৈরী করেছে, বাঙাল মনুষ্য নয়, ওই এক জন্তু। একসময় আমি সারা বছর ধরে মোজা পরতাম, পশ্চিম বাঙালীরা নাক সিঁটকিয়ে বলত যে আমি বাঙাল। তারা মনে করে তারাই সারা দুনিয়ার একমাত্র সভ্য জাতি। এটা হল আমাদের জান্তব উত্তরাধিকার, এক পাড়ার কুকুর যেমন অন্য পাড়ার কুকুর দেখলে ঘেউ ঘেউ করে।

সত্যেন্দ্র : কিন্তু এসব অবস্থার উন্নতি হবে আশা করা যায়।

শ্রীঅরবিন্দ : এ সব জিনিষ দূর হলে নিশ্চয় জানবে সত্যযুগের দেরী নেই। অবশ্য আমার এই সমস্ত মতামত নির্ভর করছে বর্তমান অবস্থার উপর। অতিমানস নামলে গোটা চেহারাই বদলে যাবে।

নীরদ : আপনি আপনার অতিমানস দিয়ে আমাদের বড্ড বেশি ভোলাচ্ছেন। সত্যি, সমস্ত মানুষের উপকার হবে এতে?

শ্রীঅরবিন্দ : সবাইকে উপরের দিকে একটা জোর টান দেবে কিন্তু বিশেষ কার্য্যকরী হতে হলে এবং বহুল পরিবর্তন আনতে হলে আশ্রমের দু'শ সাধক যথেষ্ট নয়। হাজার হাজার লোক চাই যাদের প্রভাব সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে, যারা প্রকৃত পরীক্ষায় টিঁকে থেকে সপ্রমাণ করবে যে এই শক্তি অধুনা ব্যবহৃত অন্যান্য শক্তির চাইতে শ্রেষ্ঠ।

পুরাণী : এই শক্তি সমস্ত মানবজাতির উপর কাজ করবে?

শ্রীঅরবিন্দ : এই প্রশ্ন অতিমানসের হাতেই ছেড়ে দেওয়া যাক, যখন সে নামবে, নিজে উত্তর দেবে।

নীরদ : জড়বাদী ও বৈজ্ঞানিকদল বলছে যে যোগীরা মানুষকে সুখী করবার জন্যে কিছু করেনি। বুদ্ধ ও অন্যান্য অবতারেরা এলেন, গেলেন; মানুষের দুঃখ ত তথৈবচ।

শ্রীঅরবিন্দ : অবতারেরা কি মানুষের দুঃখ ঘুচাতে এসেছেন ? বুদ্ধই শুধু দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণের পথ দেখিয়েছেন কিন্তু তাঁর পথ ছিল সংসার পরিত্যাগ এবং নির্বাণে লয়। কই, কেউ নিচ্ছে কি তাঁর পথ ? যদি না নেয় এবং দুঃখ এড়াতে না পারে সেটা কি বুদ্ধের দোষ ?

নীবদ : তারা বলছে, দেখ, আমাদের আবিষ্কারে দুনিয়ায় কত উপকার হয়েছে। কলেরা বসন্তের টিকা দিয়ে মৃত্যুর হার কত কমিয়েছি আমরা।

শ্রীঅরবিন্দ। তাতে মানুষ সুখী হয়েছে ? vaccination ? অনেক চিন্তাশীল লোক ত উল্টো কথা বলছে, বলছে তাতে ঢের বেশী ক্ষতি হয়েছে।

নীরদ : সেটা চিন্তাশীলদের মত, ডাক্তারদের নয়।

শ্রীঅরবিন্দ : কেন ? তারা তাদের মত দেবার আগে বিষয়টা তলিয়ে দেখেনি, পরীক্ষা করেনি ? কলেরা না হয় কমাল, কিন্তু আরো বহু নূতন জিনিষ যে আমদানী করেছে ? দুঃখকষ্টের কথা যদি বল, যতদিন অবিদ্যা, অজ্ঞান রয়েছে ততদিন তা থাকবেই। অতিমানসের অবতরণের পরেও থাকবে। তুমি যদি দুঃখযন্ত্রণার মাঝে বাস করতে চাও, কি করে সেটা যাবে ?

নীরদ : তারা বলছে যে তারা মানুষকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে ইনজেকশন দিয়ে তার ভাল করতে পারে। আধ্যাত্মিক শক্তির সে ক্ষমতা আছে কি ? যোগীরা তাদের মুক্তি নিয়েই ব্যস্ত, দুনিয়া বাঁচল কি মরল সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

শ্রীঅরবিন্দ : আমি জিনিষটা সেভাবে দেখি না। ক্রমবিবর্তন

আরম্ভ হয়েছে জড় প্রকৃতি থেকে, ধাপে ধাপে পশু, তারপরে দেহধর্মী মানুষ, প্রাণধর্মী, মননধর্মী এবং শেষে আধ্যাত্মিক মানুষ হল। মনন-ধর্মী বা আধ্যাত্মিক মানুষের আবির্ভাবের সাথে সাথে অন্যদেব লোপ পায়নি। বাঘ আব সাপও মানুষ হয না। মানবচেতনার এই উর্ধ্ব-গতিব পথে বুদ্ধ, যীশুখৃষ্ট ইত্যাদি মহাপুরুষেবা কোন সাহায্য কবেননি, তাঁদেব কোন অবদান নেই এমন কথা তুমি বলতে পাব না।

আমার বিবেচনায় অতিমানস হল আধ্যাত্মিক মানুষেব পরিণতি। যখন সেই অতিমানস পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে কাউকে সংসাব থেকে পালিয়ে যেতে হবে না। সেটা হল প্রবলভাবে সক্রিয় শক্তি (dynamic) যা' জীবন ও প্রকৃতির পবিবর্তন ঘটায। প্রাণ মন এমন কি দেহও সে শক্তিব প্রভাবে সম্বোধি (intuition) ও অধিমানসের দিকে খুলে ধরবে।

তোমবা চাও আরাম ও সুখ। তার পাশে সত্য ও জ্ঞানের কোন মূল্য নেই?

আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার তার প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে গেছে, মানুষের শক্তি তাকে কাজে লাগাতে পারছে না। বৈজ্ঞানিকেবা বুঝতে পারছে না এই আবিষ্কার দিয়ে তারা এখন কি করবে। তাই তাদের ব্যবহার করা হচ্ছে মারণ অস্ত্ররূপে। এখন বলা হচ্ছে এরোপ্লেন থেকে মারাত্মক বীজাণু ছড়িয়ে দিয়ে মানুষ মারবে। কলেরা বসন্ত ইত্যাদির যন্ত্রণা মৃত্যুতে শান্তি পায় কিন্তু বোমার আঘাত আজীবন অঙ্গহানি করে রাখে।

রাজনীতি বল, বিজ্ঞান বল, এমনকি সোসিয়ালিজমও যন্ত্রণার হাত থেকে অব্যাহতির উপায় খুঁজে পায়নি। তারা মানুষ মেরেছে, পরে

পরস্পরকে ধ্বংস করেছে এবং রাজশক্তিকে (State) বিপদে জড়িয়েছে। অবশ্য তুমি যদি বল যে ধ্বংসের ও হত্যাকাণ্ডের প্রয়োজন আছে তাহলে অন্য কথা। এই অরাজকতা ও যন্ত্রণা হতে উদ্ধারের পথ দেখান হয়েছে এবং যারা দেখিয়েছে তারা তোমাদের মতে কাজের লোক নয়, যদি অবশ্য তোমার যুক্তি মেনে নিই যে সবাইকে কাজের লোক হতে হবে।

না, না, এ সমস্ত হল একেবারে পল্লবগ্রাহিতা। কোন মত দেবার আগে গোটা সভ্যতার ইতিহাস বিবেচনা করতে হবে। ইউরোপীয় সভ্যতায় ঘুণ ধরেছে বলেই না Aldous Huxley-র মত লোক যোগের দিকে ফিরছে?

২৮।১২।৩৮

বিকেল ৫।।০টা। চম্পকলাল আবার জোরে হেসে উঠল। শ্রীঅরবিন্দ বিছানা থেকে জিজ্ঞেস করলেন, "ব্যাপার কি? এই ডিনামাইট ফাটানো কেন?" আমাদের আমোদটা সংযত করতে হল। পরে ৬।।০টায় যখন সকলে একত্র হয়েছি, সে শ্রীঅরবিন্দের কাছে নালিশ করল যে আমি তাকে হাসাচ্ছি। শ্রীঅরবিন্দ বললেন, "সাবধান কিন্তু। দেখো যেন সে তোমায় হাউইবাজির মত উড়িয়ে না দেয়।"

এখন আমরা বিছানা ঘিরে বসলাম। পরিবেশ কি রকম থমথমে হল, ফলে আমার হাই উঠতে লাগল। তাতে চম্পকলালের মজা লাগল খুব। আমরা দুজনেই হেসে উঠলাম।

শ্রীঅরবিন্দ: রসিকতার বিষয়টা কি?

নীরদ : হাই তোলায় চম্পকলাল আমায় বিদ্রূপ করছে।

শ্রীঅরবিন্দ : চম্পকলাল জানে না বুঝি যে হাইতোলা এক সাংঘাতিক রোগের লক্ষণ?

(আশ্রমে একজন বায়ুগ্রস্ত রোগী আছে ; সে খুব ঘন ঘন মা'কে ড্রামাটিক ভাষায় তার নানা অদ্ভুত লক্ষণের কথা লেখে, তার মধ্যে রাত্রে হাই তোলা নাকি একটি। শ্রীঅরবিন্দ তার সম্বন্ধেই উল্লেখ করছেন। আপাতত তার হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা চলছে। সত্যেন্দ্র সামান্য হোমিওপ্যাথি জানে, তার বন্ধু একজন ভাল ডাক্তার।)

—এখন তাকে কি ওষুধ দেওয়া হচ্ছে ?

সত্যেন্দ্র . সেটা হল, স্যার, পেশাদারের গূঢ় কথা (professional secret)।

শ্রীঅরবিন্দ : এতে আমার গ্রীসের সেই শাকুনবিদ্যার (Science of augury) কথা মনে পড়ল। অশুভ লক্ষণ বা সঙ্কেত দেখলে তার ব্যাখ্যা করতে গণক বা দৈবজ্ঞদের ডাক পড়ত। তাতে স্বষ্টি হল এক শাকুন-বিদ্যার কলেজ। সেখানে অধ্যাপকেরা গম্ভীর গলায় লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিত এই বিদ্যা সম্বন্ধে, আর বক্তৃতার শেষে সবাই মিলে নিজেদের মাঝে খুব হাসাহাসি করত।

(কিছুক্ষণ পরে)

শোন, আজ সকালে যুদ্ধের একটা বিকলাঙ্গ খবর এসেছে। রেডিও দুটো জরুরি কথা বাদ দিয়েছে। 'ইটালিয়ানেরা এগুবার মতলব করছে' বলার পরিবর্তে বলছে তারা এগুচ্ছে। তারা যদি Djibouti-র দিকে রওনা হয় তাহলে ফরাসীরা Tripoli-র দিকে উল্টা আক্রমণ চালাতে পারে।

পুরাণী: ফরাসীরা আবিসিনিয়ানদেরও ইটালীর বিরুদ্ধে দলবদ্ধ করতে পারে।

শ্রীঅরবিন্দ: তার জন্যে যথেষ্ট সময় থাকবে না।

নীরদ: ইটালিয়ানরা ভাল যোদ্ধা বলে ত মনে হয় না।

শ্রীঅরবিন্দ: না। তারা ফরাসীদের হারাতে পারলে আমি খুব আশ্চর্য হব। তখন বলতে হবে মুসোলিনি তাদের মধ্যে মস্ত পরিবর্তন এনেছে।

নীরদ: আবিসিনিয়াতে ওদের ত অনেক ঘোল খেতে হয়েছে।

শ্রীঅরবিন্দ: হাঁ, **Air bomb, mustard gas** ইত্যাদি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ছিল বলে বেঁচে গেছে।

নীরদ: কিন্তু জার্মাণী তাদের সাহায্য করবে।

শ্রীঅরবিন্দ: সে ত বটেই, ইটালি ও জার্মাণী ছাড়া চলতে পারবে না।

পুরাণী: **Fisher**-এর মতে গত যুদ্ধে জার্মাণসৈন্যই ছিল পৃথিবীর মধ্যে সেরা ও সুশৃঙ্খল।

শ্রীঅরবিন্দ: হাঁ, তারা সে বিষয়ে পৃথিবীতে সবচেয়ে দক্ষ ও সুশৃঙ্খল সন্দেহ নেই, জাপানীদের কথা বাদ দিয়ে। কিন্তু জাপানীরা সংখ্যায় কম আবার গরীব। তবুও গত যুদ্ধে জার্মাণরা ত **Foch**-এর মত অদ্ভুত সামরিক প্রতিভা দেখাতে পারে নি। **Foch**কে প্রথমেই যদি সেনাপতির পদ দেওয়া হত, তাহলে যুদ্ধ কবে শেষ হয়ে যেত। **Balkan** এবং **Turk** সৈন্যরাও ভাল যোদ্ধা। **Austrian**-রা তেমন ভাল নয়।

নীরদ: শিখ এবং গুর্খা?

শ্রীঅরবিন্দ: তারা ত অতুলনীয়, কিন্তু যুদ্ধ ত যোদ্ধাদের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে সেনাপতিদের উপর।

পুরাণী: ব্রিটিশ কনসাল বলে যে চীনারা তেমন ভাল যোদ্ধা নয়। রাশিয়ানরা আত্মরক্ষায় ভাল (defensive)। জার্মানরা এখন Ukraine-এর দিকে এগুচেছ, পরে Hitler মধ্য ইউরোপে এসে পড়বে।

শ্রীঅরবিন্দ: সম্ভব, কিন্তু তখন Russia, Poland, Rumania, Jugoslavia সকলে একজোট হবে। এই সমস্ত ক্ষুদ্র জাতেরা নিজেদের নিরাপত্তার জন্যে বাধ্য হবে সংঘবদ্ধ হতে।

পুরাণী: কিন্তু জার্মাণী কেন ইটালির সাথে মিলেছে ফরাসীদের বিরুদ্ধে?

শ্রীঅরবিন্দ কেন? হিটলার নিজেই তার Mein Kemp-এ বলেছে ফ্রান্সের ধ্বংস বিনা জার্মাণী নিরাপদ নয়। আর ফরাসীরা সেই সুরে উল্টো জবাব দিচেছ্।

নীবদ: এরা যেভাবে যোগাড়যন্ত্র করছে যুদ্ধ যেন অনিবার্য।

শ্রীঅরবিন্দ: মনে হচেছ্ যেন তাই; আমরা ভেবেছি আগামী বছরের প্রথম দিকে তারা কিছু করবে, তার আগে নয়। কিন্তু এখনি যদি জার্মাণী হানা দিতে চায় তবে তার কারণ এই যে ফ্রান্স এখন দেশ-ব্যাপী হরতাল নিয়ে বিব্রত আছে; কিন্তু তারা ভুলে যাচেছ্ যে তাদের আক্রমণ তৎক্ষণাৎ সমস্ত দেশকে একজোট করবে। যাই হোক, আপাতত দেখা যাচেছ্ জার্মানরা Christmas নিয়ে মেতে আছে।

নীরদ: যুদ্ধ লাগলে ইংরেজদের আসতে হবে ফরাসীদের সাহায্যে, নয় কি?

শ্রীঅরবিন্দ : আজ Chamberlain কি বলছে দেখনি? ইটালীর সাথে ফরাসীদের যুদ্ধ বাধলে ইংলণ্ডের ফরাসীকে সাহায্য করবার মত কোন চুক্তি নেই। তবে জার্মানী যদি ইটালির পক্ষ নেয়, বলতে পারি না ইংলণ্ড কি করবে।

নীরদ : মহাযুদ্ধ লাগলে আমাদের স্বাধীনতার সুবিধে হবে।

শ্রীঅরবিন্দ : কি রকম?

নীরদ : কেন? আমরা ইংরেজদের কোন সাহায্য করব না। এই যে কংগ্রেস-মন্ত্রী গঠন হচেছ এটা কি ইউরোপে যুদ্ধের মেঘ ঘনাচেছ বলে নয়?

শ্রীঅরবিন্দ : সম্ভব। তারা কংগ্রেসকে তুষ্ট করতে চায়।

২৯।১২।৩৮

আজ সত্যেন্দ্রের 'দিন'। সত্যেন্দ্র আলাপে ক্রমশঃ বেশি অংশ নিচেছ। সে জিজ্ঞেস করল, কারণ-শরীর ও চৈত্যপুরুষের (psychic being) মাঝে কোন সম্পর্ক আছে কি না। শ্রীঅরবিন্দের উত্তর আমার ঠিক মনে নেই। তিনি বললেন, "psychic being হল অন্তরাত্মা, চৈত্যপুরুষ, কারণ-শরীর হল ইন্দ্রিয়াতীত—Superconscious। আবার আত্মা আর চৈত্যপুরুষও এক নয়। আমাদের মাঝে কে একজন বলল যে রমণ মহর্ষির আত্মোপলব্ধি হয়েছে। Brunton লিখেছেন যে মহর্ষি তাঁর অন্তরে বাণী শুনতেন।

শ্রীঅরবিন্দ বললেন, ওটাকে তাহলে ঠিক আত্মোপলব্ধি বলা যায় না। হৃদয়গুহায় বাণী শুনলে তার মানে চৈত্যপুরুষের উপলব্ধি।

এই সময় মা এলেন এবং শ্রীঅরবিন্দকে জিজ্ঞেস করলেন "আজ তোমাদের কি নিয়ে আলোচনা ?"

শ্রীঅরবিন্দ : সত্যেন্দ্রের একটা প্রশ্ন একটু খাপছাড়া লাগছে। (প্রশ্নটা সত্যেন্দ্র বলল) সে যেন বলতে চাইছে নানা কোষশুদ্ধ সূক্ষ্ম-শরীরের কথা ।

পুরাণী এখন রমণ মহর্ষির অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কপালী শাস্ত্রীর বিবরণ শোনাল। কপালী শাস্ত্রীর শোনা খোদ মহর্ষির মুখ থেকে : "একদিন আমার অন্তরে ওটা (?) খুলে গেল এবং আমি শুনতে লাগলাম 'আমি' 'আমি'। সর্বত্র দেখতে লাগলাম সেই 'আমি'।

সত্যেন্দ্র : নানা গুরুর নানা মত। কি করে বলা যায় কোনটি সর্বোচচ ? আমরা নিজেরা যেটা বেছে নিই তাকে ত সর্বশ্রেষ্ঠ বলা চলে না।

মা : প্রত্যেকে তার চেতনার যতটুকু সীমা ততটুকু পৌঁছায়। ইউরোপে, জাপানে, ভারতবর্ষে বহুলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে যারা বিভিন্ন গুরুর নির্দ্দেশে যোগাভ্যাস করছে। প্রত্যেকেরই মুখে এক কথা : আমার উপলব্ধিই সর্বশ্রেষ্ঠ। সে সম্বন্ধে তারা একেবারে নিশ্চিত এবং প্রত্যেকে নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট। তবুও, প্রত্যেকে একই চেতনার আলাদা আলাদা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে মাত্র, অথচ বলছে যে সে সর্বোত্তম সিদ্ধিলাভ করেছে।

সত্যেন্দ্র : কিন্তু কতকগুলো প্রমাণ আছে ত ? যার দ্বারা মাপা যায় ?

মা : কি রকম প্রমাণ ? তাদের জিজ্ঞেস কর, তারা বলবে "ওঃ,

কী চমৎকার অবস্থা, কিন্তু মন দিয়ে তা ব্যক্ত করা যায় না—অবাঙ্‌-মানসগোচর!" জাপানে র'এর সাথে আমার দেখা হয়। তিনি নাকি নির্বাণের শান্তি লাভ করেছেন। মুখ আনন্দে উজ্জ্বল। আমি ভাবলাম "এই যে ভদ্রলোকটি বলছেন তাঁর নির্বাণলাভ হয়েছে, দেখা যাক না ব্যাপারটা কি।" আমি তাঁকে আমার সঙ্গে ধ্যান করতে ডাকলাম এবং ধ্যানে তাঁর পিছনে পিছনে চলতে লাগলাম। দেখি, ঠিক মনের পিছনে একটা শূন্যময় অবস্থায় গিয়ে উপস্থিত, আমি বসেই আছি কিন্তু ভদ্রলোকের সেখান থেকে এগুবার কোন লক্ষণ নেই। ওই নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট আর বলছেন নির্বাণে প্রবেশ করেছেন।

সত্যেন্দ্র: কিন্তু এমন উপলব্ধি ত আছে যাকে বলা যায় মূলগত (fundamental) বা অত্যাবশ্যক?

শ্রীঅরবিন্দ: অর্থাৎ চেতনার একটা সার সত্য আছে কিন্তু সেখানে পৌঁছা ত সোজা নয়।

সত্যেন্দ্র: তাহলে গুরু বরণ করা যায় কি করে? বরণ করার আগে ত জানা চাই?

পুরাণী: মন দিয়ে তুমি জানবে গুরুর কি উপলব্ধি?

সত্যেন্দ্র: আমরা ত অন্তরাত্মার সাহায্যে বরণ করি না।

মা: সেটা অন্য কথা। প্রথমত চেতনার সীমা কোথায় তোমায় জানতে হবে এবং কোন কোন বিভিন্ন স্তরে প্রত্যেকে উঠেছে তাও জানা চাই।

গুরুবরণ যেটা বলছ, সেটা প্রায়ই তোমার প্রয়োজন অনুসারে হয়ে থাকে, তোমার ভিতরের প্রয়োজনই সেটা স্থির করে। কখনও সহজ-বোধই (instinct) নির্বাচণ করে, সেই সহজবোধ যার দ্বারা

পশুরা তাদের খাদ্য বস্তুর জায়গাটির ঠিক হদিশ পায়। মানুষের বেলায় সেই দিশাটা আসে অন্তর থেকে। (মা আঙুল দিয়ে দেখালেন) তোমার মনকে যদি এ নিয়ে মাতামাতি তর্ক করতে দাও, সহজজ্ঞান গুলিয়ে যায়, ঢাকা পড়ে।

যখন তুমি কোন জিনিষ বেছে নিয়েছ, মন তখন বিশ্বাস করতে চাইবেই যে এর বড় আর কিছু হতে পারে না, কিন্তু সেটা ত তোমার নিজের ব্যক্তিগত কথা, subjective.

সত্যেন্দ্র : বরণটা যদি ঠিক হয়, তাহলে একটা শান্তি ও সন্তোষ আসে ত?

মা : সন্তোষ ? ভাবাবেগ আর ইন্দ্রিয়ানুভূতির দ্বারা চালিত হওয়া ত বাঞ্ছনীয় নয়, কেননা বহু ক্ষেত্রে তারা ভুল পথে নিয়ে যায়। তবে সন্তোষ অন্য জিনিষ। কিন্তু তার বেলায়ও দেখা যায় খুব চমৎকার পরিবেশে থেকেও মানুষ সুখী নয়, আবার অত্যন্ত মন্দ অবস্থার মাঝেও কেউ কেউ পরম সুখী। দুনিয়ার দিকে একবার তাকিয়ে দেখ। দেখবে তারা বেশ সুখে দিন কাটাচ্ছে, তাদের অবস্থা যাই হোক। আবার অন্যদের সুখ দুঃখ নির্ভর করছে তাদের উদরের উপর— একেবারে নিরেট জড়বাদী। অন্যদিকে, এমন লোকও আছে যারা ঘোরতর যন্ত্রণা ভোগ করলেও তাদের অন্তঃপুরুষ জানে যে তাদের পক্ষে ওটাই সত্য।

সত্যেন্দ্র : কিন্তু শাস্ত্রের কতকগুলো লক্ষণ আছে ত যার দ্বারা বিচার করা যায়?

শ্রীঅরবিন্দ : কোন শাস্ত্র? শাস্ত্রে যা বলে সব কি বিশ্বাসযোগ্য?

মা : তাছাড়া সেগুলো ভারতীয়দের পক্ষে উপযোগী হতে পারে,

ইউরোপীয়ানদের পক্ষে ত তা খাটবে না। তুমি বলতে পারবে না যে তারা সত্য উপলব্ধি করেনি। নয় কি? মা শ্রীঅরবিন্দকে জিজ্ঞেস করলেন।

শ্রীঅরবিন্দ: ঠিকই ত!

মা এখন ধ্যানের জন্যে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীঅরবিন্দ জিজ্ঞেস করলেন, ''তুমি কোন লক্ষণের কথা বলছ?''

সত্যেন্দ্র: সেগুলো সর্বত্র পরিচিত, স্যার। যেমন গীতায় আছে, সমতা, সমান প্রেম ইত্যাদি।

শ্রীঅরবিন্দ: সেগুলো ত বরং সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত। সব অভিজ্ঞতায় সত্য আছে, তাদের নির্দিষ্ট স্থানও আছে। একটি সত্য বলে অন্যটি মিথ্যা এমন বলা যায় না। সত্য অসীম, পথও অনন্ত, যত বিশাল হবে, যত উপরে উঠবে, তত দেখতে পাবে আরো, আরো আছে। ধর, রমণ মহর্ষির সেই 'আমি' ভাবের উপলব্ধি। আমার যখন নির্বাণ লাভ হল, কই আমি ত এই 'আমি'র কথা ভাবতে পারলাম না, যতই চেষ্টা করি না কেন, সেই 'আমি'কে খুঁজে পেলাম না। শব্দটাই সম্পূর্ণ তলিয়ে গেছে। তাকে 'আমি' বলা যায় না, হয় 'সে', নয় 'তৎ' বলতে পার। সেটাকেই আমি বলি 'লয়'। আত্মার উপলব্ধি বেশ ভালই। লয় হল অত্যন্ত ব্যাপক অভিজ্ঞতা।

আমি যদি কোন উপলব্ধিকে চরম বলে না মানি, তার অর্থ এই নয় যে আমি সত্য কি জানি না বা সর্বভূতে এক বা একের মাঝে সর্বভূতের উপলব্ধি লাভ করিনি। আমার অন্যান্য যেসব গুরুতর উপলব্ধি হয়েছে তাদের আমি কি করে নাকচ করি? মহর্ষি যেমন ঠিক, অন্যরাও তাই।

মন দিয়ে বিচার করতে বসলে মন কতকগুলো টুকরো নিয়ে

ভাবে সেগুলো সমগ্র। তারপর নানা মিথ্যা ভেদাভেদ সৃষ্টি করে। কেউ বলে নির্গুণই সার বস্তু, সগুণ হল গৌণ। কিন্তু নির্গুণ-গুণ, অনন্ত গুণ বলতে উপনিষদ কি বোঝায়? সেসব কি আলাদা আলাদা? তুমি যদি বল নির্গুণ (impersonality) একমাত্র সার সত্য, সগুণ তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে কাজেই গৌণ, তোমার মন দ্বিখণ্ড করল একটা সত্যকে, যা দুটোরই ঊর্ধ্বে। সগুণ আর নির্গুণ দুইই এক অদ্বিতীয় সত্যের দুটো দিক মাত্র।

শঙ্কর যেমন ঠিক, নিম্বার্ক তেমনি ঠিক, কেবল যখন তারা সত্যকে মনের ভাষায় ব্যক্ত করে তখনই সব গোলমালেব সৃষ্টি হয়। শঙ্কর বলছেন দ্বৈত কিছু নেই, সবই ব্রহ্ম। নিম্বার্ক বলছে ভেদাভেদ আছে, আর মাধ্বমতে দ্বৈত রয়েছে।

উপনিষদ বলছে তিনি আছেন, যাঁকে জেনে সব কিছু জানা যায়। এর অর্থ কি? এই বিজ্ঞান আর একের (The One) মূল উপলব্ধি, দুটো এক জিনিষ নয়। এর অর্থ হচ্ছে ভাগবত সত্তার, সৎ পুরুষের (Divine Being) নানা তত্ত্বের (principles) জ্ঞান, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ য.কে বলেছেন বেত্তি তত্ত্বতঃ। অতিমানসে পৌঁছলে পবে সমগ্র ভগবানকে জানা যায়। এই জন্যে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন তাঁকে তাঁর প্রকৃত তত্ত্বে জানে এমন লোক খুব কম। উপনিষদ আবার ব্রহ্মকে বলছে চতুষ্পাদ্—চারটি অংশ অর্থাৎ চারটা দিক। বলছে না যে সবই ব্রহ্ম—ব্যস! —ইতি শেষ। আত্মজ্ঞান সব নয়, তার উপরে অনেক জিনিষ আছে। আমার অন্তর্যামী আমায় নির্দেশ দিলেন 'এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও!' অভিজ্ঞতার পর অভিজ্ঞতা জড়ো হল, ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধ্বে উঠলাম, কোথাও থামলাম না যতক্ষণ না অতিমানসের আভাস পেলাম, সেখানে

দেখলাম সত্য অবিভাজ্য, সব কিছুরই নিজস্ব স্থান আছে, সগুণ নির্গুণ, সাকার, নিরাকার আলাদা নয়, সবই এক অখণ্ড সত্যের ভিন্ন দিক।

অধিমানস স্তরে জ্ঞান যেন তোমার দিকে ছুটে আসে চারপাশ থেকে ; সমস্ত এবং প্রত্যেকটি বস্তুর সমগ্র দৃষ্টি পাও। তাদের মাঝে একটা যোগসূত্র থাকে। সেখানে বিশ্বচেতনা শুধু নিষ্ক্রিয়, নিশ্চল নয়, সক্রিয়ও বটে, তা হল আবার ঊর্ধ্বের অতিমানসের অভিব্যক্তি মাত্র।

• তুমি যখন বিশ্বচেতনায় স্থিত হও, যদিও তখন 'আমি' শব্দটা প্রয়োগ কর, সেটা কিন্তু অহংএর আমি নয়। 'আমিত্ব' আর থাকে না ; মন, প্রাণ, দেহ সেই চেতনার প্রতিনিধি বলে বোধ হয়। শ্রীরাম-কৃষ্ণ এই অবস্থার আমির নাম দিয়েছেন অহংএর একটা বাহ্য রূপ, কাজের জন্যে বাহাল রাখা হয়েছে। অতিমানসে যখন উপস্থিত হও, তুমি শুধু বিশ্বভূত নও, বিশ্বাতীতও। সেখানে অখণ্ডত্ব, একত্ব, ব্যক্তিত্ব, বিশ্বাতীত, বিশ্ব ও ব্যক্তি সমস্ত একসাথে বাস করতে পারে।

জড়বিজ্ঞানেও দেখবে একই তত্ত্ব কাজ করছে। বিজ্ঞান একসময় বলত ঈথারই একমাত্র উপাদান, অন্যান্য বহুবিধ খণ্ড উপাদানের জনক। এবং তার নানা বিপরীত ও স্বতোবিরোধী বর্ণনা দিতে লাগল। এখন বলছে যে বিদ্যুৎ-কণাই জড়ের ভিত্তি। তার স্থান ও সংখ্যাভেদে এই বিশ্ব বৈচিত্র্যের লীলা। এখানেও তাহলে সেই এক সত্য রয়েছে : একই হয়েছে বহু, এই দুটো আলাদা জিনিষ নয়। এক আর বহু দুইই সত্য এবং এই দুইএর সাহায্যে তোমায় পৌঁছতে হবে একমাত্র সত্যে।

রাজনীতিতে দেখ গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র—সবই সত্য। এমন কি হিটলার, মুসোলিনীও কোন সত্যের মুখপাত্র।

তাহলে বুঝলে আমাদের যোগ একটা অতিকায় ব্যাপার। তোমায় হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হবে (হাতের ভঙ্গি দিয়ে তিনি দেখিয়ে দিলেন) নীরদ বোধহয় এত কষ্ট স্বীকারে রাজি নয় (হঠাৎ বলে বসলেন)।

নীরদ : কখ্‌খনো না, স্যার! ও সমস্ত কষ্ট করতে পারব না বলেই ত এখানে আসা!

শ্রীঅরবিন্দ : না, না, তোমাদের কেউ তা বলছেও না। আমায়ও যদি একলা চলতে হত, আমার পক্ষেও অসম্ভব হত বই কি! কিন্তু এক জায়গায় এসে স্বর্গের দুয়ার খুলে গেল, আর আমায় কিছু করতে হল না, যা করবার সবই করে দিল।

এখানে কথা প্রায় শেষ হচ্ছিল কিন্তু পুরাণী বলে বসল যে শাস্ত্রী মহর্ষিকে জিজ্ঞেস করেছে মানুষ অমর হতে পারে কি না। মহর্ষি নীরব। কিন্তু শাস্ত্রী জোর করায় বললেন, "সম্ভব, ভাগবত কৃপায়।"

শ্রীঅরবিন্দ : ওটা ত কোন উত্তর হল না। কৃপায় সবই সম্ভব। এই অমরত্বের দুটো দিক আছে : একটা হল মৃত্যুকে জয় করা, কিন্তু তা বলে কখনও যে মৃত্যু হবে না এমন নয়। বলব, ইচ্ছামৃত্যু। আর একটা দিক হল, দেহকে বদলান বা নূতন করা। একই দেহ বছর বছর ধরে রাখার ত অর্থ হয় না। ওটা হবে সাংঘাতিক বন্ধন। সেজন্যে মৃত্যুর প্রয়োজন, যাতে আর একটা দেহ গ্রহণ করা যায় এবং সতেজ ও সবুজ উন্নয়ন হয়। দশরথ নাকি ৬০,০০০ বছর বেঁচে ছিলেন। ভগবান জানেন এত দীর্ঘায়ু নিয়ে করলেন কি, শেষমেষ বোধ হয় সন্তানেরই জন্ম দিলেন। **Shaw** এর **Back to Methusela** পড়েছ ত? বুদ্ধিজীবীরা কি রকম বোকা হতে পারে, এখানে তার পরিচয় পাবে। **Joan of Arc**কে নিয়ে দেখ কি রকম হাস্যাস্পদ

প্রহসন করেছেন! তাঁর সব vision নাকি তাঁরই মনের, চিন্তার ও সিদ্ধান্তের ছায়া (projection)। Shaw যখন ইংলণ্ড, আয়ারলণ্ড ও সমাজসম্বন্ধে কথা বলেন, তখন নিজের নাগালের মাঝে থাকেন। কিন্তু কোন কিছু সৃষ্টির বেলায়, একেবারে শোচনীয়ভাবে 'ফেইল'। Russel সম্বন্ধেও একই কথা. এই সমস্ত বুদ্ধিজীবীরা যখন কোন বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলতে যান যা তাঁদের নাগালের বাইরে, নিজেদের বোকা বানিয়ে ছেড়ে দেন। Introvert সম্বন্ধে কি লিখেছেন দেখ!

কোন শূন্যতা বা চিন্তার বিরতি তাঁদের বরদাস্ত হয় না। সংসারের আকর্ষণ কাটাও সহ্য হয় না। তাঁদের যদি বল চিন্তার ক্রিয়া থামাতে, দেখবে তাঁরা মোটেই রাজী হবেন না। আর যদি বা শূন্যতার স্পর্শ পান, তখখনি সেখান থেকে ফিরে আসবেন। অথচ এই শূন্যতার ভিতর দিয়ে তোমায় যেতেই হবে, যদি তুমি পূর্ণতা চাও।

৩০।১২।৩৮

বলা হয়েছে যে আমাদের কথাবার্তা সাধারণত সুরু হয় সন্ধ্যাকালে, পরে শ্রীঅরবিন্দের অবস্থা ভাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি সময় আমরা পাই। সেটা হল তাঁর স্নানের সময় এবং সেটাই পরে মুখ্য আসর হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তাঁর রীতিমত স্নান করবার পূর্বে বহুদিন তাঁকে sponge দেওয়া হয়েছে, প্রথমে বিছানার উপরেই, পরে মেঝেতে নামিয়ে। সেই সময় একাধারে চলছে sponge,, অন্যধারে চলছে কথাবার্তা। Sponging-টা সাধারণতঃ দুপুরের খাবারের পরই

হত। সময় বোধ হয় বারটা হতে সরতে সরতে চারটা, সাড়ে চারটায় গিয়ে দাঁড়ায়।

এই sponging-এর সময় আজ সামান্য কথা হয় হোমিও-প্যাথি সম্বন্ধে। কে একজন জিজ্ঞেস করল হোমিওপ্যাথিতে ওষুধকে যে অনন্তগুণ মিশ্রিত করা হয় (infinitesimal dilution) তাতে কাজ হয় কি করে।

শ্রীঅরবিন্দ : ওটা আমার কাছে এমন কিছু হেঁয়ালি নয়। কখনও কখনও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বৃহতের (mass) চাইতে বেশী শক্তি ধরে। কেননা সে জড়াবস্থা থেকে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হতে হতে উত্তীর্ণ হয় সক্রিয় অথবা সতেজ অবস্থায় (dynamic or vital) এবং সেই সূক্ষ্মাবস্থায় তার কাজও প্রবল হয়।

বিকেল বেলা। আগে একটি সাধক রোগীর কথা বলেছি, রোগটা তার মানসিক, hypochondria জাতীয়। এখন রূপ নিয়েছে persecution maniaতে। সে শ্রীঅরবিন্দকে তার অবস্থা জানিয়ে চিঠি লিখেছে। চিঠিগুলোর বিশেষত্ব এই যে, তাদের ভাষা অশুদ্ধ হলেও খুব জোরালো এবং জীবন্ত। অনেক সময় বিশেষণ ক্রিয়াবিশেষণের ছড়াছড়ি। ইংরেজীও ভাল জানে না বলে বাক্যের অর্থ অনুমান করে নিতে হয়। মাঝে মাঝে ভুল হয় যেন James Joyce-এর ভূত তার ঘাড়ে চেপেছে। চিঠিগুলো পড়ে আমাদের সমবেদনার চেয়ে মজা লাগে বেশি।

নীরদ : আচ্ছা, এই রোগটা কি আসলে এক ধরণের ভূতে পাওয়া (possession) ?

শ্রীঅরবিন্দ : হাঁ। স্নায়ুযন্ত্রের এবং প্রাণজ মনের (vital mind) উপর তার প্রভাব বিস্তার বলতে পার, কিন্তু তাকে উন্মাদরোগ বলা যায় না। রোগীদের কোন রোগ নেই বা কেউ তাদের নিগ্রহ করছে না বললে তারা বিশ্বাস করে না। আসলে সমস্ত তাদের মিথ্যা ধারণাপ্রসূত। এদেব আবার দুটো টাইপ আছে, একটি নানা অদ্ভুত কল্পনাব আশ্রয় নেয়। শতকরা ৮০ জন এই টাইপের। অন্য টাইপ সব-কিছুই বিকৃত করে দেখে।

আমার ভাই মনোমোহনের এই ধরণের ব্যাধি ছিল : সবাই যেন তাকে নিগ্রহ করতে ব্যস্ত (persecution mania) ; সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকত বুঝি বা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবে, এমন কি ব্রিটিশরাজ বুঝি গ্রেপ্তার করবে তাকে!

নীরদ : তিনি নাকি চমৎকার পড়াতেন। কী রকম স্তব্ধ হয়ে ছাত্রেরা তাঁর বক্তৃতা শুনত!

শ্রীঅরবিন্দ : সে নিজে খুব খাটত। অধিকাংশ অধ্যাপকেরাই এতখানি পরিশ্রম করে না। আমি দেখেছি তার বই নোটে ভর্তি থাকত। কত সাদা কাগজ যে নোট সমেত তার বইতে বিরাজ করত! (এবার পুরাণীর দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন) আমার বোধহয় ততখানি কর্তব্যনিষ্ঠা ছিল না (conscientious)।

পুরাণী : যারা আপনার ক্লাসের বা রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনেছে তাদের মত কিন্তু আলাদা। তারা ত প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত!

শ্রীঅরবিন্দ : আমি কিন্তু বই টই দেখতাম না ; বইএর নোটের সাথেও আমার ব্যাখ্যা অনেক সময়ই মিলত না। জানই ত আমি ইংরেজি এবং কিছুকালের জন্যে ফরাসী পড়াতাম। আমার দেখে

অবাক লাগত যে ছেলেরা বক্তৃতা হুবহু নোট করে নিয়ে সেগুলো মুখস্থ করত।

নীরদ: কেন, আমরাও ত ইংলণ্ডে তাই করেছি।

শ্রীঅরবিন্দ: কি করেছ?

নীরদ: নোট টুকে মুখস্থ করা।

শ্রীঅরবিন্দ: সেটা অন্য জিনিষ। নোট নিয়ে সেগুলো প্রয়োজনমত ব্যবহার করায় কোন আপত্তি নেই।

নীরদ: না, তা নয়। একেবারে হুবহু নোট করা যাকে বলে। কারণ অধ্যাপকেরা নানা মত, নানা নতুন আবিষ্কারের কথা বলতেন। তাছাড়া, প্রত্যেক প্রফেসরের আবার নিজস্ব সখ (fad) থাকত।

শ্রীঅরবিন্দ: ডাক্তারীর কথা আলাদা। সেখানে নিজস্ব চিন্তার বিশেষ অবকাশ নেই। সাহিত্যে তা নয়। প্রফেসরদের কথা মন দিয়ে শোন, নোটও নাও এবং তার সদ্ব্যবহার কর। বরাবরই ছাত্রদের নিজস্ব মতামতের মূল্য দেওয়া হত। এখানে ছাত্ররা শুধু আমার নোট নিয়ে ক্ষান্ত নয়, বোম্বাই প্রফেসরদেরও নোট সংগ্রহ করত, বিশেষতঃ তারা যদি পরীক্ষক হত।

একবার আমি Southey-এর Nelson পড়াচ্ছিলাম। কিন্তু আমার বক্তৃতার সাথে বইএর নোটের কোন মিল ছিল না। তা নিয়ে ছাত্রেরা অভিযোগ করল! আমি বললাম যে আমি মোটেই ওসব নোট পড়িনি। যাই বল, নোটগুলো একেবারে রাবিশ! আর, এত খুঁটি-নাটিতে যাওয়া আমার ধাত নয়। আমি পড়াতাম আর মনকে দিতাম ছেড়ে, যা এবং যতটুকু পারে সে সার সংগ্রহ করে নিত। তাই ত আমি পণ্ডিত (scholar) হতে পারলাম না।

পনের বছর বয়স পর্যন্ত St. Paul-এ উজ্জ্বল ছাত্র বলে আমার নাম ছিল, তারা আমার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করত কিন্তু পনেবর পর সে সুনাম নষ্ট হল। মাষ্টারেরা বলতে লাগলেন যে আমি কুঁড়ে হয়ে পড়েছি, ফলে অবনতি হচ্ছে।

নীরদ: সেটা কি করে হল?

শ্রীঅরবিন্দ: কাবণ আমি নভেল আর কবিতাই পড়তাম। কেবল পরীক্ষার সময় একটু আধটু পড়াশুনা করতাম। কিন্তু যখন খেয়ালের বশে মাঝে মাঝে গ্রীক এবং লাটিন কবিতা লিখতাম, আমার শিক্ষকেরা আপশোষ করে বলতেন যে আমার এমন চমৎকার প্রতিভা আমি হেলায় নষ্ট করছি।

যখন কেম্ব্রিজের King's College-এ স্কলারশিপ পরীক্ষার জন্য উপস্থিত হলাম, Oscar Browning আমার কাগজ দেখে বললেন যে এরকম কাগজ বহু বছর ধরে তিনি দেখেননি। তাহলে দেখ আলসেমি সত্ত্বেও আমার অবনতি ঘটেনি।

নীরদ: সে সময় কি ভারত-বিদ্বেষ ছিল?

শ্রীঅরবিন্দ: না, সাদাকালোর কোন তফাৎই ছিল না। শুধু নীচু শ্রেণীর লোকেরা 'Blacky, Blacky' বলে চীৎকার করত। কিন্তু বিদ্বেষের সূত্রপাত হচিছল বটে, Anglo-Indian আর উপনিবেশ-ফেরতা ইংরাজদের গুণে। সাধারণতন্ত্রের ফল বোধ হয়। কিন্তু ভদ্র ইংরাজদের মাঝে তার কোন আভাস ছিল না, তারা আমাদের সমান চোখেই দেখত।

ফরাসী দেশে কিন্তু এরকম বিদ্বেষের কথা শোনা যায় না। তোমরা কাগজে পড়েছ কি না জানি না, একবার কোন ফরাসী হোটেলে আমে-

রিকানদের পাল্লায় পড়ে কতগুলো নিগ্রোকে হোটেল ত্যাগ করতে বলে। যেই সে খবর প্রেসিডেন্টের কাণে এল, তক্ষুণি আদেশ পাঠান হল যে, যদি হোটেল-মালিক এরকম অসদ্ব্যবহার করে, তার লাইসেন্স নাকচ হবে। তাদের নিগ্রো গভর্ণর, কর্মচারী রয়েছে; এমন কি একজন Senegalise ডেপুটি পর্যন্ত ছিল; তার ভয়ে গভর্ণরেরা কাবু হয়ে থাকত। কিন্তু পণ্ডিচেরী হতে কোন ভারতীয় ডেপুটি নেয়নি কেন জানি না। ইংরাজদের আছে কিছু উদারতা আর কাণ্ডজ্ঞান।

নীরদ: উদারতা?

শ্রীঅরবিন্দ: উদারতা মানে বদান্যতা নয়, চেতনার প্রসার আর নিরপেক্ষতা। এই গুণগুলো আর তাদের স্বদেশহিতৈষিতা (public spirit) আছে বলে তাদের রাজনৈতিক জীবন দূষিত নয়, যেটার অভাব ফ্রান্সে বা আমেরিকায়। তারা কাগজে পরস্পরের তীব্র সমালোচনা করে, ব্যক্তিগতভাবেও, কিন্তু তাতে তাদের বন্ধুত্ব বা আত্মীয়তা ক্ষুণ্ণ হয় না। Brailsford Chamberlainকে কী রকম গালাগালি করল, দেখলে ত, কিন্তু তাদের বন্ধুতা বা আত্মীয়তা ঠিক বজায় থাকবে।

নীরদ: সেটা বোধ হয় ভদ্রতার মুখোস!

শ্রীঅরবিন্দ: না, না! একেবারে খাঁটি। ইংলণ্ডে প্রচুর বাক্-স্বাধীনতা আছে।

নীরদ: বিবেকানন্দ বলতেন যে ইংরাজদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়া বড় কঠিন, কিন্তু একবার হলে সেটা চিরস্থায়ী থাকে।

শ্রীঅরবিন্দ: ঠিক কথা।

পুরাণী: হার্বার্ট বলত যে জাপানীরাও এই ধরনের লোক। খুব ভদ্র ও শিষ্টাচারী কিন্তু একবার বন্ধুত্ব হলে তা খুবই খাঁটি হয়।

শ্রীঅরবিন্দ : সে জাপানে গেছে নাকি ?

পুরাণী : হাঁ, চীনেও।

শ্রীঅরবিন্দ ঠিক বটে, জাপানীরা কথাবার্তায় ও ব্যবহারে অতি ভদ্র। কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে তোমার প্রবেশ নিষেধ। অদ্ভুত তাদের আত্মসংযম। মাথা গরম করে না বা ঝগড়া করে না কিন্তু একবার তাদের আত্মসম্মানে আঘাত করেছ ত তোমায় হত্যা করতে পারে, তোমার ঘোরতর শত্রুও হতে পারে। তাদের আত্মমর্যাদাজ্ঞান যেমনি প্রবল, দুঃখের বিষয়, অমর্যাদাজ্ঞানও তেমনি। যে কোনটার বেলায় হয় তোমায় তারা হত্যা করবে, নয় তোমার দুয়ারে নিজেদের হত্যা করবে। ধর, কোন জাপানী যদি কোন ইংরাজের দরজায় এভাবে আত্মঘাতী হয়, তাহলে সেই ইংরাজের পক্ষে সে দেশে বাস করা আর সম্ভব হবে না। কোন ডাকাত যদি জাপানীর ঘরে চুরি করে আর মালিক তাকে বলে যে তার কিছু টাকার প্রয়োজন আছে, ডাকাত চোরা টাকার কিছু অংশ ফেরৎ দেবে কিন্তু মালিক যদি বলে যে তার কোন ঋণ আছে, শোধ না দিলে মান যাবে, তখন ডাকাত পুরো টাকাটাই দিয়ে চলে যাবে। ইংলণ্ডে কি আমেরিকায় এই জাতীয় সিঁদেল চোরের (house-breaker) কথা ভাবতে পার ?

তাদের শিভ্যালরী জ্ঞানও খুব টনটনে। রুষ-জাপান যুদ্ধে রুষেরা যখন হারল, রুষের জার এর দুর্দশার কথা ভেবে মিকাডো প্রায় চোখের জল ফেলে—সত্যিকারের শিভ্যালরী বটে।

একবার যখন কোন ধর্মানুষ্ঠানে প্রায় ৫০।৬০ হাজার লোক জড় হয়, হঠাৎ তখন ভূমিকম্প হয়ে চারধারে আগুন লেগে বিরাট জনসমুদ্র আটকা পড়ে কিন্তু আশ্চর্য, বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য নেই, একটু কান্না নেই।

সকলে দাঁড়িয়ে বৌদ্ধগাথা পড়ছে ! বীরজাতি বলে একেই, কী অদ্ভুত আত্মসংযম !

নীরদ : এরকম সংযম থাকলে ত তারা চমৎকাব যোগী হবে।

শ্রীঅরবিন্দ : আঃ ! আত্মসংযম যোগের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তারা হল নীতিপরায়ণ (ethical) জাত এবং সে সব নীতি মেনে চলা সাংঘাতিক কঠিন।

কিন্তু এসব এখন অতীতের কাহিনী। মস্ত পরিতাপের বিষয় এই, যে জাত এমন উঁচু আদর্শে জীবন বেঁধেছে, এখন পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে সেগুলো তারা হারিয়ে ফেলেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতাব সস্তা প্রচার (vulgarisation) জাপানের এই মারাত্মক ক্ষতিটা করেছে। এখন দেখতে পাবে বহু জাপানীর দৃষ্টিভঙ্গী হয়েছে ব্যবসাযী, টাকার জন্যে তারা সব কিছু করতে পারে। নাকাসীমার মা জাপানী প্রথামত যখন আমেরিকা থেকে দেশে ফিরল, জাপানের বর্তমান অবস্থা দেখে এমন হতাশ হল যে দেশ থেকে ফিরে গেল।

জাপানীবা যে আধ্যাত্মিক জাতি নয়, একটা দৃষ্টান্ত দিলেই বুঝবে। মা'র এক জাপানী বন্ধু ছিল বড় স্বদেশপ্রেমিক ; ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা আকাশকুসুম ভাবত কিন্তু এদিকে জাপানের বর্তমান মতিগতি মোটেই পছন্দ করত না। কিন্তু আবার বলত, "আমার কি হল ? আমার আত্মা নিশ্চয় বিশ্বাসঘাতক হয়েছে।"

পুরাণী : রবীন্দ্রনাথকে লেখা Noguchi-র চিঠিগুলি পড়েছেন ? তাতে জাপানের আক্রমণনীতির (aggression) সমর্থন করা হয়েছে।

শ্রীঅরন্দি : আমি পড়িনি। কিন্তু সব বিষয়েরই দুটো দিক আছে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এতখানি হট্টগোলে আমার সায় নেই।

এ ধরনের দেশ জয় করা এক সময় রাজনৈতিক জীবনের সাধারণ ধর্ম বলে গণ্য করা হত, এখন তা করে নানা ছুতোয় ও কপট ছলে। কোন জাতই বাদ পড়েনি। চীন কি করেছে? Khasgar এ ভাবে নেয়নি? Khasgar নামই তো যথেষ্ট পরিচয় যে চীনের ওখানে মাথা ঢোকাবার কোন প্রয়োজন ছিল না। নূতন কলাকৌশল মারণাস্ত্র বাদ দিলে যুদ্ধের বিরুদ্ধে কোন যুক্তি নেই। Anglo-Saxon ভণ্ডামিই যুদ্ধের বিরুদ্ধে গলাবাজি করছে, ফরাসীরা করে না।

পুরাণী: ফরাসীরা নাকি সহজে ক্ষেপে ওঠে না কিন্তু একবার ক্ষেপলে একেবারে চরমে পৌঁছে।

শ্রীঅরবিন্দ: তাই। ভারতবাসীদেরও খ্যাতি ছিল তারা হাতীর ন্যায় খুব নম্র ও বাধ্য, কিন্তু একবার সে মাতাল হয়েছে ত সাবধান!

এখন নূতন হাওয়া বইছে: pacificism, anti-nationalism, anti-militarism ইত্যাদি। এসব বুলি তাদেরই মুখে যাদের মুরদ নেই। সময়ের কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখতে হবে তাদের কী মূল্য।

পুরাণী: জে তো ইংরাজদের মুণ্ডপাত করত, যখন তারা ইটালী Abyssinia যুদ্ধের বিরুদ্ধে হৈ চৈ করত। অবশ্য সে ইটালীর সমর্থন করত না কিন্তু বলত যে ইংরাজরা কোন মুখে বড় গলায় সাধু সাজে?

শ্রীঅরবিন্দ: ঠিক কথা। পাঠানদের উপর যখন air-bombing হল তখন একমাত্র ইংরেজ জাতিই তো তা সমর্থন করল। তারা পাঠানদের নিঃশেষ করতে চেয়েছে কি না!

নীরদ: পাশ্চাত্য সভ্যতায় ভাল জিনিষ কিছু নেই?

শ্রীঅরবিন্দ: এই সভ্যতা মানুষের নৈতিক ধাত (tone) ভয়ানক নামিয়ে এনেছে। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানজাতীয় কতগুলো ভাল জিনিষ করেছে

বটে কিন্তু উনিশ শতাব্দীব ইংলণ্ড তার নানা দুর্বলতা সত্ত্বেও ঢের ভাল ছিল যেন। ইউরোপ গত যুদ্ধের পরীক্ষায় টিঁকতে পারল না। প্রাচীন জাতিরা তাদের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রেখেছে এবং তাকে উঁচুতে তুলতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু ইউরোপ যুদ্ধের পর তার সমস্ত আদর্শে জলাঞ্জলি দিয়েছে। লোকগুলি কি রকম স্বার্থপর, সংশয়ী (**cynical**) হয়েছে দেখ। যুদ্ধোত্তর ইউরোপ সম্বন্ধে যা শোন নেহাৎ মিথ্যা নয়। **Arjava** এই যুগের ইংলণ্ডেব বিরুদ্ধে কি রকম ক্ষেপে উঠত শোননি? এই সবই বোধ হয় বাণিজ্যতন্ত্রের (**commercialism**) ফল।

৩১-১২-৩৮

আজ কথা কি নিয়ে বা কি ভাবে আরম্ভ করা যাবে ভেবে পাচ্ছিলাম না। শ্রীঅরবিন্দও চুপ করে আছেন, ভাবটা 'আমি তৈরি!' এদিকে অমূল্য সময় বয়ে যাচ্ছে। আমরা একে অন্যের প্রতি ইঙ্গিত করছি. কিন্তু তারও কোন সাড়া মিলছে না। তখন পুরাণী হঠাৎ **Picasso**-র চার পাঁচখানা ছবি উপস্থিত করল, একটি হল একজন পুরুষ ও স্ত্রীর, দ্বিতীয়টি একজন মানুষের, মুখটা পাখীর মত, মাথায় যেন একটা টিকি, তিনটি চোখ!

শ্রীঅরবিন্দ: পুরুষ ও স্ত্রীর ছবিটায় ব্যঞ্জনাটি বেশ ফুটেছে (**power of expression**)। অন্য লোকটিকে দেখাচ্ছে যেন টিকিওয়ালা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। মুখের চেহারায় এখনও তার আদিম

পুরুষের ছাপ রয়েছে। একটি চোখ যেন প্রজ্ঞাচক্র, অন্যটি অন্য কোন চক্র হবে। (অন্য ছবিগুলো সম্বন্ধে কি বলেছেন মনে নেই।) এই শিল্পীব দল যখন কিছু বলতে বা বোঝাতে চায়, তখনই অনর্থ বাধে। কি করে আমরা বুঝব শিল্পীর কি উদ্দেশ্য, যদি অবশ্য উদ্দেশ্য কিছু থাকে ? যদি কিছু অর্থ বোঝাতে না চাও, কোন গোলমাল নেই। দর্শক তার ভাবানুযায়ী বুঝে নেবে। তখন একটা ছাপ পড়ে এবং সেটাকে মনের ভাষায় রূপ দিতে না পারলেও অনুভূতিটা অন্ততঃ থাকে, যেমন হয়েছে এই দুটো ছবির বেলায়। কিন্তু একদিকে যেন তোমার কিছু বক্তব্য আছে অথচ **Surrealist** কবিদের মত বলছ "শিল্পের কোন অর্থ থাকবে কেন ? বুঝতে চাও কেন ?" তখন লোক ধাঁধায় পড়ে যায়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছবিটাই নাও : ওই চোখগুলো বাদ দিলে সবই মানানসই হত কিন্তু চোখগুলিই—চোখের মত যেগুলি,—তোমায় ভাবতে বাধ্য করছে তাদের কী অর্থ !

(পুরাণীর দিকে তাকিয়ে) তুমি সেই **Futurist** ছবিটা দেখেছ যেখানে একটি মানুষকে নানা ভঙ্গীতে দেখান হচ্ছে ? তার উদ্দেশ্য হল নাকি ছবিতে গতি দেখান—একেবারে হাস্যকর ! আমাদের **Golconda building**-এর তেমনি ছবি এঁকে দেখাতে পার, যেন ঘরটা ঘুরে বেড়াচেছ !

প্রত্যেক আর্টেরই কতগুলো রীতি ও সীমা আছে ; সেগুলো তোমায় মেনে চলতে হবে।

পুরাণী : মস্ত আর্ট সমালোচক **Elie Faure**-এর মতে ফ্রান্স তার ৫০০ বছরের একটানা স্থাপত্য গৌরব জলাঞ্জলি দিয়েছে চিত্র-শিল্পে শীর্ষস্থান পাবার জন্যে।

শ্রীঅরবিন্দ : ফ্রান্স যে আর্টে সকলের সেরা তাতে সন্দেহ নেই। সে যা আরম্ভ করে, অন্যেরা তাই মেনে চলে। কিন্তু স্থাপত্য তো সর্বত্রই থেমে গেছে।

পুরাণী : Elie Faure বলছে কলও নাকি স্থাপত্যবিশেষ।

শ্রীঅরবিন্দ : কি করে?

পুরাণী : নানা অংশ দিয়ে তৈরী বলে এবং কোন উদ্দেশ্য পূর্ণ করছে বলে।

শ্রীঅরবিন্দ : তাহলে তুমিও একটি স্থাপত্যবিশেষ, মোটরগাড়ীও।

পুরাণী : অমুকের এই ছবিগুলো খুব পছন্দ হয়েছে, কি বুঝেছে সেই জানে। বোধহয় যত রহস্যময় হবে, ততই চমৎকার লাগবে।

শ্রীঅরবিন্দ : এখন মানুষ না জেনে মিষ্টিক হচ্ছে। জান ত হিটলার একজন মিষ্টিক। তাকে নাকি ভিতরের কোন বাণী চালায়। তার প্রাসাদে সে নীরব নিস্তব্ধ হয়ে এই বাণীর অপেক্ষা করে, সে বাণী যাই বলবে তাই সে করবে। স্বজন্তির ছেলের বন্ধু (পাশ্চাত্য) লিখেছে যে হিটলারের উপর মোটেই নির্ভর করা যায় না, তার সেনাপতি, রাজস্ব-পতি ইত্যাদি কেউ জানে না পরের মুহূর্তে সে কি করে বসবে। আজ যা বলবে কাল বলবে ঠিক তাব উল্টো, আর সমস্ত দেবে ওলটপালট করে। কথার ঠিক নেই, কাজের ঠিক নেই। জবরদস্ত এক অতি-প্রাকৃত শক্তি তার উপর আবিষ্ট হয়েছে ; সেই শক্তির কাছ থেকে আসে, যাকে সে বাণী (voice) বলছে, সে সমস্ত আদেশ। একটা অদ্ভুত জিনিষ লক্ষ্য করবে যে যারা একসময় তার শত্রু ছিল তার সংস্পর্শে এসে তার মস্ত ভক্ত হয়ে চলে যায়। এটা স্পষ্ট সেই শক্তির দ্বারা বশীভূত হবার প্রমাণ। এই শক্তির কাছ থেকে সে অনবরত নির্দেশ পাচ্ছে,

আর বারবার সেগুলো আওড়াবার ফলে সারা জার্মানজাত কী রকম তার দ্বারা সম্মোহিত হচ্ছে। আরও একটা জিনিস নজর করবে যে সে একই মতামত যেন ঘা মেরে মেরে বসাচ্ছে। এটাও পরিষ্কার সেই দানবীয় শক্তির আবির্ভাবের (vital possession) চিহ্ন। কিন্তু মনে রেখো সে উন্মাদ নয়। সে যা বলে সবই যুক্তিসম্মত, খাপছাড়া নয় মোটেই।

কোন একটা কাগজে—illustration ?—ওদের তিনজনের হিটলার, গোয়েবল্‌স আর গোয়েরিং—ছবি বের হয়। এই ত্রয়ীর চরিত্র এমন চমৎকার ফুটেছে সেখানে! অন্যান্য ছবিগুলি তেমন স্পষ্ট নয়। ভাবগুলি ফোটেনি। এখানে হিটলারকে দেখে মনে হয় যেন প্যারিসের রাস্তার গুণ্ডাবিশেষ, গোয়েবল্‌স-এর দেখা যাচ্ছে সরু, তীক্ষ্ণ নাক মুখ এবং ধূর্ত চোখ ; গোয়েরিংকে তো মস্তিষ্কবিকৃতির জন্যে পাগলা গারদে থাকতে হয়েছে। অদ্ভুত এই ত্রয়ী, তিনজনকেই সমগোত্রের শক্তিতে 'পাওয়া'।

হিটলারকে বলতে পার পাকা গুণ্ডামী আর শয়তানি বুদ্ধির প্রতি-মূর্তি, পিছন থেকে উঁকি মারছে লণ্ডনের কোচম্যানের অন্তর-পুরুষ —যেমনি স্থূল তেমনি অপরিপক্ক অর্থাৎ এই চৈত্যিকভাবটা (Psychic-ness) কতগুলো সস্তা ও ভ্যাপসা ভাবুকতার (Sentimentalism) নামান্তর মাত্র। এই ভাবুকতাই প্রকাশ পেয়েছে তার নিজের আঁকা দুটো ছবিতে।

Munich pact-এর একটা ছবিতে আমি চেম্বারলেন ও হিট-লারকে একসঙ্গে দেখি। লোকটির চোখে শয়তানী বুদ্ধি জ্বলজ্বল করছে আর সেই দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে চেম্বারলেনের দিকে। চেম্বার-

লেনকে মনে হচ্ছে যেন মাকড়শার সামনে সামান্য মাছি, জালে ধরা পড়ল বলে—পড়লও ঠিক।

মুসোলিনি বেশ শক্তিমান পুরুষ কিন্তু এই দুই dictator-এর ছবি যখন Munich-এর পর দেখলাম, আশ্চর্যের বিষয় যে মুসোলিনিকে তুলনায় বোধ হল কত দুর্বল, হিটলার যেন তাকে পকেটে পুরে নেবে। Daladier তো নিজেকে ফ্রান্সের শক্তিধর পুরুষ বলে ভাবে কিন্তু হিটলারের পাশে সে কি?

নীরদ : ষ্টালিন?

শ্রীঅরবিন্দ : ষ্টালিনের চেহারা দেখলে মনে হয় সে একজন বিচক্ষণ ও আত্মপ্রত্যয়ী গুণ্ডাবিশেষ। অসুরের অবতার বলতে পার।

হিটলারের ভিতর কোন পদার্থ আছে বলে কেউ ভাবেনি। আস্তে আস্তে বাড়ল তার জীবনীশক্তি এবং গিয়ে পড়ল শেষে দানবীয় শক্তির (vital power) কবলে। মুসোলিনি অন্ততঃপক্ষে মানুষ, মানুষের প্রকৃতি তার আছে। হিটলার নৃশংস, নিষ্ঠুর—এই লক্ষণটাও তার ফটোতে অবিকল ফুটে উঠেছে। ১৯শ শতাব্দীর বিশ্বমানবতার পরে এই নিষ্ঠুরতার বিস্ফোরণ অবাক লাগে। খ্রীষ্টান অত্যাচারকেও যেন ছাড়িয়ে গেছে। পুরাকালে মানুষের অন্ততঃ গর্ব, আত্মমর্যাদাজ্ঞান ইত্যাদি ছিল যার জন্যে তারা মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করত। আমরা বলি, গ্রীক ও রোমানরা কী নিষ্ঠুর কিন্তু তারাও মানবহিতৈষী না হলেও মানুষ ছিল। জার্মানীর বর্তমান নৃশংসতা দেখে—যেমন করে তারা ইহুদীদের মারছে—তারা হতভম্ব হত!

পুরাণী : Von-এর হত্যার কথা শুনে আমি তো হতবুদ্ধি!

শ্রীঅরবিন্দ : হিটলার তার লেফ্‌টেন্যান্টকে মারে কোন এক

দুর্নীতির অপবাধে, অথচ সেই কিনা হিটলারকে এই ক্ষমতার পদে তুলেছে। এটা হল সেই লণ্ডন কোচম্যানের নীতিজ্ঞান, কিন্তু আসলে এটা তাব শয়তানী বুদ্ধিব দৃষ্টান্ত, কেননা হিটলাব বরাবরই তার **homosexuality** দোষের কথা জানত।

পুরাণী: ব্রিটিশ কনসাল আমায বলে "দেখ পুবাণী, আমরা শুধু কথা বলতেই জানি কিন্তু কাজ করতে জানি না।"

শ্রীঅরবিন্দ: মনন প্রবৃত্তির ধরনই তাই। মানবতার দৌড় ঐ পর্যন্ত, কাজেব বেলায কিছুই নয়। ভাবতে অদ্ভুত লাগে যে একটিমাত্র লোকের উপব সাবা বিশ্বের ভাগ্য নির্ভর করছে! এটা তো সত্যি কথাই যে সবাই তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে মানুষ কখনও এতখানি নীচে নামেনি। কতগুলি মুষ্টিমেয় ভীষণ লোক সমস্ত মানবজাতির ভাগ্য বিধান করবে আর একজন লোকের পদানত হবে সবাই—এই যেন অদৃষ্টের লেখা!

পুরাণী: কলির সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল বোধ হয়।

১-১-১৯৩৯

বিকেলবেলা। আন্দাজ ৫৷৷০টা।

আজ বেচারলাল কথা আবম্ভ কবেন। তাঁর মুখের বিশেষ ভঙ্গী ও লক্ষণ দেখে স্পষ্ট মনে হয় যে কোন প্রশ্ন তৈরী হচ্ছে। পরেই "উপবাসের ফল কি?"

শ্রীঅরবিন্দ: কপাল ও ভ্রূ কুঁচকিয়ে—বেচারলালের আকস্মিক

প্রশ্নে তাঁর এই প্রতিক্রিয়া ঘটে থাকে—জিজ্ঞেস করলেন "ফল ?"

বেচারলাল : অর্থাৎ যোগে তার ফল আছে কি না।

শ্রীঅরবিন্দ : ওঃ, যোগে! প্রাণশক্তিকে সামান্য উত্তেজিত করে, বলতে পার কিন্তু ফল তেমন শুভ বলে মনে হয় না। আমি দুবার উপবাস করি : একবার আলিপুর জেলে ১০ দিন অবধি, আর একবার পণ্ডিচেরীতে ২৩ দিন। আলিপুরে তখন আমার যোগ চলছে পুরা-মাত্রায় ; আমি সমস্ত খাদ্য বালতিতে ফেলে দিতাম, অবশ্য সুপারিন-টেণ্ডেন্টের অজান্তে। Warder শুধু জানত, অন্যদের বলত, "ভদ্র-লোকের নিশ্চয় খুব অসুখ। বেশিদিন বাঁচবে না।" কিন্তু আমার শরীরের জোর মোটেই কমেনি : ভর্তি যে বালতি সুস্থ অবস্থায় তুলতে পারতাম না, তাই আমি মাথার উপর তুলে নিতাম। পণ্ডিচেরীতে এই উপবাসের অবস্থাতেই আমার মন, প্রাণের কাজ ও সাধনা পুরাদমে চলতে থাকে। আট ঘণ্টা ধরে হাঁটতাম, তবুও কোন ক্লান্তি আসত না। উপবাস ভাঙলাম ও একেবারে সাধারণ নিত্যকার খাবার খেয়ে।

নীরদ : উপবাস করেও এতখানি কাজের ক্ষমতা কি করে সম্ভব ?

শ্রীঅরবিন্দ : প্রাণজগৎ হতে সেই শক্তি টানা যায়, খাদ্যের উপর নির্ভর করতে হয় না। কলকাতায় এক কালে আমি শুধু ভাত ও কলা খেয়েই থাকতাম। খুব পুষ্টিকর ও উপাদেয় খাবার!

সত্যেন্দ্র : মুশকিল এই যে আপনার দৃষ্টান্তে কোন কিছু প্রমাণ করা যায় না।

শ্রীঅরবিন্দ : (হেসে) অন্ততঃ এটা প্রমাণ করা যায় যে জিনিষটা করা সম্ভব। একবার রমেশ দত্ত (I. C. S.) আমায় নেমন্তন্ন করেন, দেখে অবাক হলেন যে আমি নিরামিষাশী অথচ মাংস না হলে তাঁর

চলেই না ! নিরামিষ আহারে শরীর খুব হাল্কা ও পবিত্র মনে হত। মাংস না হলে যে চলে না, এটা সংস্কার ; তার থেকে আসে অভ্যাস।

এক সাহেব নাকি ৪০ দিন উপোস করে এবং তার উপকার সম্বন্ধে খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে কিন্তু উপোসের পর তার শরীর ভেঙে পড়ল।

আমরাও জৈনদের উপোস সম্বন্ধে নানা গল্প করলাম।

শ্রীঅরবিন্দ : তাদের উপোস কি উদ্দেশ্যে ?

সত্যেন্দ্র : আত্মার মুক্তির জন্যে শরীরকে কষ্ট দেওয়া বোধ হয়।

নীরদ : উপোসে রোগ সারাতে পারে ?

শ্রীঅরবিন্দ : পারে ; তবে প্রণালী জানা চাই। সাহেবরা উপোস করে ওই উদ্দেশ্যে। প্রায়ই মনের ধারণা যেমন, ফলও হয় তদ্রূপ। যেমন তুমি ভাবতে সুরু কর—হাঁ, আমি বেশ আছি, অথবা না, না, আমার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। দেখবে ঘটবেও ঠিক তাই। রোগ সারাতে হলে উপোসের ঠিক ক্রিয়াটা জানা চাই। অসুখ আসে বাইরের থেকে। সূক্ষ্ম শরীর—মা যাকে বলেন **nervous envelope**—ভেদ করে সে শরীরে ঢোকে। যদি এই সূক্ষ্ম শরীর বা খোল সম্বন্ধে সচেতন হও, তাহলে রোগকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পার, চিন্তার বেলায় আমি যেরকম করেছি। **Neurasthenia** রোগীদের এই খোলটা নষ্ট হয়ে যায়।

বেচারলাল : **Neuralgia**ও কি এভাবে হয় ?

শ্রীঅরবিন্দ : (হেসে) হাঁ। নিজের কথা ভাবছ বুঝি ?

বেচারলাল : ওটাকে কি করে তাড়ান যায় ?

শ্রীঅরবিন্দ : ওই যে বললাম তোমায় প্রথম সূক্ষ্মশরীর সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে।

পুরাণী : আমার যখন Dengue হল, বেশ বুঝতে পারলাম যে রোগটা আসছে ; যেই একটা স্পন্দন (vibration) অনুভব করলাম, অমনি তাকে ঠেলে ফেলে দিলাম। ফলে সামান্য মাত্র ভুগতে হল।

শ্রীঅরবিন্দ : ঠিক তাই, এভাবেই রোগ আসে।

চম্পকলাল : ক বলছিল যে সে একসময় অদ্ভুত ধরনের মাথা ধরায় ভুগত। মাথা ধরাটা যেন মাথার উপরেই থাকত, অথচ যন্ত্রণা হত ভীষণ। আমরা ত তাকে হেসেই উড়িয়ে দিতাম। এটা আবার কোন ধরনের মাথা ধরা ?

শ্রীঅরবিন্দ : কি করে জানলে যে এধরনের মাথা ধরা নেই ? চেতনা যদি মাথার উপরে তুলে সেখানে রাখা যায়, মাথা ধরাও সেখানে হবে না কেন ?

শরীরটা হল নানা প্রকার স্পন্দনের বস্তুপিণ্ড মাত্র। বাইরের যে কোন আঘাতে বা স্পর্শে সে অনবরত সাড়া দিচ্ছে। তাই তো আমাদের কপালে এই সব ভোগ।

সত্যেন্দ্র : সবই যদি বাইরে থেকে আসে, আমরা তবে কি ? আমাদের বলতে কি আছে ?

শ্রীঅরবিন্দ : এক হিসাবে কিছুই নেই আমাদের। শরীরটা বলতে পার, নানা প্রবৃত্তির (predisposition) সমষ্টি, নানা কর্মশক্তি (energy) দিয়ে তৈরী। সেগুলো বংশগত, অতীত জীবনের জের (অতীত জীবনের কর্মসমুদয়ের ফল) এবং বর্তমান জীবনের অর্জিত সম্পত্তি। অনুকূল অবস্থার সংযোগে তাদের ক্রিয়া চলে, প্রকৃতির চাপে—বিশ্বপ্রকৃতির। সেটাই 'অহং' বা 'আমি কর্তা' বোধ জন্মায়। এই 'আমি' ও 'আমার' জ্ঞান একেবারে ভুয়ো, অন্য এক অর্থে ছাড়া।

সত্যেন্দ্র : আপনি সেদিন মূল ব্যক্তিসত্তা (fundamental personality)) সম্বন্ধে যা বলেছিলেন বুঝতে পারিনি।

শ্রীঅরবিন্দ : দুটো জিনিষ আছে, ব্যক্তিসত্তা আর ব্যক্তি বা পুরুষ (personality and person); দুটো এক নয়। ব্যক্তি হল সনাতন চিন্ময় পুরুষ, যে নানা ব্যক্তিসত্তার পরিচ্ছদ গ্রহণ করে এবং কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে বা কাজের জন্যে বিশ্বপুরুষ এবং ব্যষ্টিসত্তারূপে (cosmic and individual) আবির্ভূত হয়। সর্বদা বিশ্বপুরুষের সাথে একত্ব সম্বন্ধে এই ব্যষ্টিসত্তা সচেতন বলে তার মুক্তি সম্ভব হয়।

সত্যেন্দ্র : এই বিশ্বমুক্তি সক্রিয় না নিষ্ক্রিয়?

শ্রীঅরবিন্দ : দুইই। নিষ্ক্রিয় অবস্থায় আত্মা (Self), অসীম, নিষ্ক্রিয়, নির্দ্বন্দ্ব, নিশ্চল একক। সক্রিয় অবস্থায় কোন অংশের সাথে তোমার একত্বের অভিজ্ঞতা হয়েছে, তার উপর নির্ভর করবে তোমার বোধ। মন বোধ করবে তুমি বিশ্ব মনের সাথে এক, প্রাণ বিশ্বপ্রাণের সাথে এবং শরীর, যেন স্থূল বিশ্বের কণা।

বহিঃপ্রকৃতি ও চৈত্যপুরুষের মাঝে যেমন একটি দেয়াল আছে, তেমনি দেয়াল রয়েছে মাথার উপর। সে দেয়াল অথবা ঢাকনা (lid) তুমি ভেঙ্গে দাও আর তোমার বোধ হবে অসীমের, তোমার ব্যক্তিসত্তা সেই অসীমেই বিধৃত। এই আত্ম-উন্মীলন (opening) হতে পারে উপরের দিকে, বাইরের দিকে প্রসারে অথবা অন্তরের, প্রাণের বিভিন্ন স্তরে।

চম্পকলাল : সাধনা থেকে অসুখবিসুখ হতে পারে, একথা সত্যি?

শ্রীঅরবিন্দ : সাধনা থেকে ?

নীরদ : বলতে চাচ্ছে যে সাধনার সময় আধার শুদ্ধ করবার জন্যে অসুখ বিসুখ হতে পারে কি না।

শ্রীঅরবিন্দ : সে ত অন্য জিনিষ। সাধনার সময় একটি অবস্থা-মাত্র সেটা।

চম্পকলাল : আমি যখন এখানে সবে এসেছি, মাঝে মাঝে এই ওই অসুখে ভুগতাম। বন্ধুরা বলত যে ওসব সাধনার ফল। সেজন্যে আপনাদের কাছে গোপন করতাম আপনাদের শক্তি দেওয়া বন্ধ করবেন এই ভয়ে।

সত্যেন্দ্র : সুফিদের ও ভক্তদের মাঝে অনেকে অসুখবিসুখ ইত্যাদি মেনে নেয় ভগবানের দান হিসাবে।

শ্রীঅরবিন্দ : ঠিকই করে। তাদের কাছে সব কিছুই ভগবানের দান। চমৎকার ভাব সেটা, যদি আন্তরিকভাবে নেওয়া যায়। যা কিছু ঘটে পরমের সমর্থন ছাড়া তা ঘটতে পারে না, যদি মধ্যবর্তী কারণশৃঙ্খল তুমি না মান বা তাকে উপেক্ষা কর। সব কিছুরই একটা উপরের হেতু আছে।

বেচারলাল : আমাদের অবহেলার দরুণ কিছু ঘটলেও বলব ভগবানের সমর্থন রয়েছে ?

শ্রীঅরবিন্দ : এই যে বললাম যদি মধ্যবর্তী কারণপরম্পরা বাদ দাও ?

বেচারলাল : এই ভাব নিয়ে চললে বিপদ নেই ? আমাদের দায়িত্ব এড়িয়ে ভগবানের উপর সেটা চাপান হবে না ?

শ্রীঅরবিন্দ : আমি ভক্তের কথা বলছি। ভক্তের কাছে যা কিছু

ঘটে মঙ্গলের জন্যেই ঘটে এবং সে এই আলোতেই তা গ্রহণ করে। এ সমস্ত জিনিষ আসে যোগীর সেগুলোকে জয় করবার জন্যে। তা না হলে জয় করবার আছে কি ? তাদের কাছে বাধাবিপত্তি হল সুযোগ, বিরুদ্ধশক্তিবা বিরুদ্ধ হলেও অন্যদৃষ্টিতে তারা দেখে সেগুলিকে। অর্থাৎ তারা কেবলই বিরুদ্ধে নয়। শেষ পর্যন্ত সমস্ত শক্তিই হল ভগবানের, তারা তাঁর কাজের সহায়। বাধাবিপত্তি সৃষ্টি করে আমাদের শক্তির পরীক্ষা করতে।

এই বিরোধ ভগবানেরই সৃষ্টি। তোমায় পরাজয় পাঠিয়ে দেন যাতে পরে জয়ী হতে পার। এটা দরকার তোমার অহংএর দায়িত্ব-জ্ঞান লোপ করবার জন্যে। এক সময় আমার বোধ হত এই বিরুদ্ধ-শক্তিগুলো যেন সব দেবতা, সাধনায় আমার শক্তি পরীক্ষা করে দেখছে।

ফলের জন্যে তুমি কাজ করবে না, ভগবানের জন্যে করবে, যদিও ফল চাইবে না এমন নয়। অর্জুন এই হেঁয়ালী বুঝতে না পেরে অভিযোগ করলেন, শ্রীকৃষ্ণ দ্ব্যর্থবোধক কথা বলছেন। তিনি বলছেন 'ফলের জন্যে আকুল বা আসক্ত হবে না' কিন্তু পরে বললেন 'যুদ্ধ কর, জয়ী হও।'

২-১-১৯৩৯

আজ পূর্বের হোমিওপ্যাথ ভদ্রলোকটি বৈঠকে হাজির। শ্রীঅরবিন্দকে প্রণাম করে তিনি নানা গল্প করছেন, প্রথমে হোমিও-প্যাথি, পরে কি করে তিনি নিজে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আরম্ভ করলেন ইত্যাদি। তাঁর মতে রোগীদের ওষুধের দামের কথা

জানাতে নেই। হোমিওপ্যাথিক ওষুধ যে রকম সস্তা, তার দাম জানলে রোগীদের বিশ্বাস জন্মে না ইত্যাদি ইত্যাদি। ইত্যবসরে মা এলেন। ভদ্রলোক মাকে যেন একটা প্রশ্ন করলেন। প্রশ্নটা আমার মনে নেই। তবে ভাবটা হল, মা বা আধ্যাত্মিক গুরু যাঁরা, তাঁরা শিষ্যদের পরীক্ষায় ফেলেন কি না।

মা : ওটা এখানে আমাদের রীতি নয়। ওটা হল শক্তিদের খেলা, অথবা বলতে পার বিরুদ্ধশক্তিদের কাজ। তারা তোমার ক্ষমতা কি রকম পরীক্ষা করে দেখতে চায়। তুমি যদি তাদের আমল না দিয়ে দৃঢ়চিত্ত থাক, তারা সরে পড়ে।

এমনি ত মানুষের বাধাবিপদের অন্ত নেই, আরও বাড়ান কেন? যদি বল যে আমরা ইচ্ছা করে এরকম পরীক্ষা করে থাকি, সেটা ভুল। আমরা তা কখনো করি না, কখনো না!

অতিথি শুনে খুসী ও নিশ্চিন্ত হলেন যেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি চলে গেলেন। মার আজ ধ্যানে যেতে ভয়ানক দেরী হচ্ছে দেখে আমি পুরাণীকে ইসারা করলাম কথা চালাতে কিন্তু সে উল্টো আমায় ইসারা করল ধৈর্য ধরতে। যেই মা চলে গেলেন—

পুরাণী : আশ্রমের স্বাবলম্বী (self-sufficient) হওয়া অভিপ্রেত নয় কি?

শ্রীঅরবিন্দ : স্বাবলম্বী? কি হিসাবে?

পুরাণী : এই যেমন দৈনন্দিন খরচ ও প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা করা। যেমন নিজেদের কাপড় চোপড় তৈরী করা। বোম্বে থেকে

বিবৃজি এসেছে। তার ইচ্ছে এখানে তাঁত বসাতে। এখন স্বাবলম্বী হবার উদ্দেশ্যে এসব করা উচিত কি না সেটাই প্রশ্ন।

শ্রীঅরবিন্দ : অভিপ্রেত কি না সেটা প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হল সাধ্য (practicable) কি না। তাঁতে বা কাপড় বোনায় কোন আপত্তি নেই। (হঠাৎ নীরদের দিকে তাকিয়ে হেসে) সূতো কাটা কি তাহলে প্রথমে নীরদকে দিয়েই সুরু করবে ?

নীরদ : আমি ত, স্যার, সারাক্ষণই সূতো কাটছি! (হাস্য)

শ্রীঅরবিন্দ : মন ত কত জল্পনা কল্পনাই করে, তার কিছু যে চেষ্টা করা যায় না এমন নয়। কিন্তু এখানে মন নয়, মা'র সম্বোধির আলোতেই ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে সব কিছু।

নীরদ : দয়ালবাগে নাকি এজাতীয় জিনিষ বেশ প্রতিষ্ঠালাভ করেছে।

শ্রীঅরবিন্দ : শুনেছি, কিন্তু তখন তোমার সমস্ত শক্তি সেদিকে ব্যয় করতে হয়, সেটাই হয়ে ওঠে মুখ্য।

আমারও এক সময় ওই ধরনের মতলব ছিল। ম-কে তার কিছু প্রেরণা দিয়েছি। বাংলায় আমার Sein Fein অভিসন্ধিটা ত্যাগ করার পরে যেমন Ireland সেটা গ্রহণ করল, এটাও তেমনি চন্দননগরে কার্যে পরিণত হল। কিন্তু তার জন্যে আমাদের আশ্রম উপযুক্ত জায়গা নয়।

নীরদ : কি হিসাবে ?

শ্রীঅরবিন্দ : প্রথমতঃ, তাঁতীরা তৎক্ষণাৎ নিজেদের মাঝে ঝগড়া বাধাবে। (হেসে) এই হল একটি 'হিসাব' যেজন্যে ওটা এখানে চলতে পারে না। বাইরে নিয়ম, শৃঙ্খলা, বাধ্যতামূলক আইন ইত্যাদি

কত কি আছে এবং সকলকে উপরিওয়ালার হুকুম মেনে চলতে হয়। কিন্তু আমরা ত সেরকম বাইরের বাধ্যতা চাই না, চাপাই না। সাধকদের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।

আর, ও-ধরনের কাজ চালালেও অন্যান্য ভয়ের কারণ আছে। সে দিকে নজর রাখতে হবে। যেমন একবার কলকারখানা চালু করলে সেই যান্ত্রিক প্রবৃত্তির নেশা বেড়ে যায়, পরে এসে পড়ে নীচ ব্যবসাবুদ্ধি। দ্বিতীয় ভয় হল, নামডাক। সাধকদের মাঝে প্রবল আকাঙ্ক্ষা রয়েছে আশ্রমের ও সাধকদের খুব খ্যাতি প্রতিপত্তি হোক। সেটা যাওয়া চাই। তারপর সত্যেন্দ্রকে রাজী হতে হবে সবাইকে হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিয়ে সুস্থ সবল করতে।

আমরা যে এসব কাজ করতে চাই না, তা নয়। আমাদের প্রচুর মতলব, কল্পনা আছে। কিন্তু গোড়াপত্তন না হলে এসবে হাত দেওয়া যাবে না। এখনই ত দুতিনজন মিলেমিশে কাজ করতে পারে না, বাগানে, খাবার ঘরে বা অন্যত্র। তাদের অহং তেতে ওঠে আর চায় স্বাধীন মন।

কাজ হবে আধ্যাত্মিক ভাবের বশে (spiritual), সৃষ্টি মানসে নয়। ভিতরের সব বাধা দূর হলে তবে কাজ আধ্যাত্মিক সৃষ্টির অঙ্গ-হিসাবে নেওয়া যেতে পারে। মনগড়া সৃষ্টি নয়, মা'র সম্বোধির আলোতে যে সৃষ্টি তাই। তবুও বাধা অসুবিধা থাকবে প্রচুর। কর্মীর অভাবে নয়, বরং শক্তিসামর্থ্যশালী লোক আমাদের যথেষ্ট আছে।

এবার কথার মোড় ঘুরে গেল, হঠাৎ হাল্কা সুরের হাওয়া বইল। শ্রীঅরবিন্দ জিজ্ঞেস করলেন, "হোমিওপ্যাথিতে টাকের কোন ওষুধ আছে কি? নলিনীর (আশ্রম সম্পাদক। তখন তিনি শ্রীঅরবিন্দের

বই পরিষ্কার করছিলেন) টাক মাথা দেখে আমি ভাবছিলাম তার কোন প্রতিকার আছে কিনা।" টাক সম্বন্ধে অনেক গল্প হল।

এই প্রসঙ্গে এল র-এর কথা। শ্রীঅরবিন্দ বললেন ব-এর প্রাণশক্তি ছিল অপরিসীম। এতখানি যার প্রাণশক্তি সে কী যে করতে পারত না জানি না। কিন্তু তেমনি ছিল শৃঙ্খলা ও সংযমের অভাব। কতগুলো সুন্দর ইংরেজী কবিতাও সে লিখেছে। ডাক্তার হিসাবে ত পণ্ডিচেরীতে বেশ নাম করেছিল। যেই আশ্রমে ঢুকল, সহরের বাসিন্দারাও তার পিছু নিল। রোগীরা তার কড়া নিয়ম ও শাসন মানতে বাধ্য হত বলে বাইরে তার এত সুনাম হয়েছিল।

এবার ডাক্তার বেচারলাল হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন, "শান্তি ও নীরবতার মাঝে কি তফাৎ?

শ্রীঅরবিন্দ: (আশ্চর্য হয়ে) কি রকম?

বেচারলাল: নীরবতার মাঝে শান্তিও থাকবে কি? কিম্বা শান্তির মাঝে নীরবতা?

শ্রীঅরবিন্দ: নীরবতা যদি থাকে, শান্তি থাকবেই; কিন্তু উল্টোটা বলা চলে না। শান্তি একবার পেলে অনেক কাজ করা যায়।

নীরদ: তাতে নীরবতা নষ্ট হবার ভয় নেই? কাজে অটুট থাকবে সেই নীরবতা?

শ্রীঅরবিন্দ: কেন থাকবে না? নীরবতা বলতে আমি ভিতরের নীরবতা বুঝছি। সেই অবস্থায় যত ইচ্ছা কাজ করতে পার। আমি তো আমার নীরবতার অভিজ্ঞতার কথা তোমাদের বলেছি। তা এখনও আমার ভিতরে রয়েছে, কোন কাজে তার ব্যাঘাত হয়নি।

বেচারলাল: নীরবতা সক্রিয় না নিষ্ক্রিয়?

শ্রীঅরবিন্দ: নীরবতা সক্রিয় নয়; নীরব অবস্থায় তুমি পুরোদমে কাজ করতে পার, এই যা। আবার কোন কাজ না করে বসেও থাকতে পার। যারা স্বভাবতঃ বেগপ্রবণ (dynamic) বা মননশীল তারা কাজ না করে পারে না। মেয়েরাও বোধ হয় তাই।

এখানে একবার কতকগুলো মারাঠি আমায় দেখতে আসে। তারা জিজ্ঞেস করল আমি কি করছি। বললাম, কিছুই না! একজন মন্তব্য করল কিছু না করা মস্ত বড় জিনিষ। সত্যি কথা!

নীরদ: সেই নীরবতা কি এক ধরনেব শূন্যতা নয়?

শ্রীঅরবিন্দ: শূন্যতা বলতে কি বোঝ? এক ধরনের শূন্যতা আছে যা ভগবানের সান্নিধ্যে ভরাট; সেটাকে শূন্যতা বলা অনুচিত। আর এক ধরনের শূন্যতা হল নিরপেক্ষ (neutral)। আবার তুমি যখন নিজেকে খালি করে ফেলেছ এবং কোনকিছু এসে তোমায় ভর্তি করে দেবাব প্রতীক্ষায় থাক, সেটাও শূন্যতা।

নীরদ: সেই শূন্যতা ত শুষ্ক মনে হবে।

শ্রীঅববিন্দ: কেন? সেটা বরং বেশ আরামপ্রদ মুক্তির অবস্থা। নিরপেক্ষ নীরবতা বা শূন্যম্ কতকটা শুষ্ক হতেও পারে—সাধারণ মনের কাছে।

নীরদ: আপনি বারীনকে তাঁর এই শুষ্ক শূন্য অবস্থায় বলেছিলেন যে এই অবস্থা সবাইর আসে এবং তা পার হয়ে যেতে হবে।

শ্রীঅরবিন্দ: সবাইর আসে এমন কোন কথা নেই কিন্তু আসলে তা' পার হতে হবে। **Bertrand Russel**-এর মত লোক ওই শূন্যতার কথা সহ্য করতে পারে না। ভিতরে গেলেই নাকি এই শূন্যতার অনুভূতি পায়, আর তাড়াতাড়ি ফিরে আসে। বোকামি

নয় কি? কেননা এই শূন্যতা ত চমৎকার জিনিষ। সাহেবদের চিন্তা করা চাইই আর চাই জীবনের বহিরাকর্ষণ। তারা ভাবে যে চেতনার বিকাশের জন্যে বাইরের সংস্পর্শ অত্যাবশ্যক।

সত্যেন্দ্র: আমাদের পরিচিত এক ভদ্রলোক নিজেকে চুপ রাখার জন্যে ঠোঁট দুটি সেলাই করে দিতেন। গান্ধিজীর অনুরোধে তিনি সে অভ্যাস ছেড়ে দেন।

শ্রীঅরবিন্দ: গীতার মতে ওটা আসুরিক তপস্যা।

নীরদ: এই ধরনের তপস্যায় কোন লাভ হয়?

শ্রীঅরবিন্দ: কেন হবে না? কিন্তু কোন প্রকারের লাভ এবং কতখানি? শারীরিক ও প্রাণিক (vital) তপস্যা সে সব অংশের উপরই দেবে প্রভুত্ব কিন্তু এগুলো কতকটা নিগ্রহের সামিল।

নীরদ: এসবের সঙ্গে ভাগবত উপলব্ধির কোন সম্বন্ধ আছে বলে ত মনে হয় না।

শ্রীঅরবিন্দ: ভাগবত উপলব্ধি বলতে কি বোঝ?

নীরদ: অর্থাৎ শান্তি, আনন্দ, ভগাবনের সান্নিধ্য ইত্যাদি—

শ্রীঅরবিন্দ: দুটো জিনিষ আছে, ভাগবত উপলব্ধি (divine realisation) অর্থাৎ আধ্যাত্মিক উপলব্ধি। আর ভগবানকে উপলব্ধি realisation of the Divine)। আত্মার প্রভাবে প্রাণ-প্রকৃতির উপর যে প্রভুত্ব আসে, সেটা হল ভাগবত উপলব্ধি।

নীরদ: সেটা ত মনের প্রভাবেও সম্ভব?

শ্রীঅরবিন্দ: সম্ভব বই কি! আর সেটাই সুরুতে শ্রেয় ও সাধারণ উপায় বলে মনে হয়। যেমন, হঠযোগ, হঠযোগের পর রাজযোগ। এগুলো হল ভগবানকে পাবার পথে এক একটা ধাপ। অবশ্য পথে

যত এগুবে তত নানা গলতি চোখে পড়বে। অমুক যোগাদের খুত খুঁত দেখিয়ে লম্বা লম্বা চিঠি লিখত। যোগীদেব খুত দেখতে নেই, কেননা তাদের খুঁতই বড় জিনিষ নয়। যা কিছু উপরের দিকে নিয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে সত্তাকে সমৃদ্ধ করে তাই মানুষের উন্নতিপথে সঞ্চয়। কোন উর্ধ্বগতি অবহেলার বস্তু নয়।

তোমার সেই বন্ধুটির কৃচ্ছ্রসাধনে কিছু লাভ হয়েছে কি? এ ধরনের সাধনায় আমার সায় না থাকলেও কিছু লাভ হলে ভালই।

সত্যেন্দ্র: বোধ হয় হচেছ। ভদ্রলোক নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াত, কারও কাছে খাবার চাইত না।

শ্রীঅরবিন্দ: সে ত যোগীদের পুরোনো প্রথা। ওটা একটা মস্ত নিয়ম, বাসনাদমনে খুব উপকারী: আমিও একসময় তা করেছি, কারও কাছে কিছু চাইতাম না। দয়ানন্দ ঠাকুরও নাকি ভবিষ্যতের জন্যে সঞ্চয় করতেন না; যখনই আশ্রমে খাবার দাবার কিছু আসত, সব কিছু তারা খরচ করে ফেলত, পরের দিন কি হবে সে ভাবনা ছিল না।

৩।১।৩৯

নীরদ: আশ্রমে একটি চলতি ধারণা যে কোন অসুখ হতে সেরে ওঠবার পর সাধনায় একটা উন্নতি দেখা যায়। সত্যি কি?

শ্রীঅরবিন্দ: তেমন কোন কথা নেই। তোমার সর্দিতে বুঝি তোমার সাধনার উন্নতি হবে?

নীরদ: সর্দি তো আর রোগ নয়।

শ্রীঅরবিন্দ : যোগীদের মতে প্রত্যেক রোগের মূলে কোন না কোন মানসিক কারণ আছে, সেটা যদি বের করে তাকে সারান যায়, তাহলে উন্নতি সম্ভব।

নীরদ : শিশুদের সম্বন্ধে কি বলবেন তাহলে ?

শ্রীঅরবিন্দ : কেন ? তাদের কোন মনস্তত্ত্ব নেই ? তুমি বলতে চাও যে এই পৃথিবীতে তারা আসে একেবারে সাদাপাতার জীবন নিয়ে, আর পরে সেগুলো লেখায় ভরে ওঠে ? মোটেই নয়, মনস্তত্ত্বে ঠাসা তারা, প্রত্যেকে অন্যের থেকে আলাদা।

শরীর হল আমাদের প্রকৃতির কর্মক্ষেত্র ; যদি গোপন মানসিক কারণটা ধরা যায়, সেটা অবশ্য মোটেই সোজা নয়, তাহলে কাজের অনেক সাহায্য হয়।

এখন হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে সামান্য কথার পর আলোচনা আরম্ভ হল দীর্ঘায়ু বিষয়ে। আমাদের মধ্যে কেউ একজন বলল যে, তিব্বতি বাবা অনেককাল বেঁচে ছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ : কিন্তু তা ত যোগের ফলে নয়, তিনি বলেছেন যে কোন ওষুধের গুণে তার শরীর বদলায় এবং লম্বা আয়ু হয়। ব্রহ্মানন্দ ত বহু বছর বাঁচেন, কারও মতে ২০০-৩০০ বছর। তাঁর সঠিক বয়স কেউ জানে না, তিনি কাউকে বলেনওনি। একবার যখন তাঁর দন্তশূল হয়, সর্দার মজুমদার তাঁর কাছে কিছু ওষুধ নিয়ে যান। ব্রহ্মানন্দ বলেন, "এই দাঁত ব্যথা ত আজকের নয়, সেই ভান গিরদি (পাণিপথের যুদ্ধ) থেকে রয়েছে।" এই সূত্র থেকে তাঁর বয়সের আন্দাজ পাওয়া যায়। অদ্ভুত ছিল তাঁর চোখ! সাধারণতঃ চোখ দুটো হয় বন্ধ, নয় আধ-খোলা থাকত। যখন আমি দেখা করতে যাই,

ফিরে আসার সময় চোখদুটো পুরো খুলে আমার দিকে তাকান। মনে হল আমার ভিতরের সবটা পরিষ্কার দেখে নিলেন।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে বাংলার গভর্ণর Sir Edward Baker-এর কথা। আমার চোখের তিনি খুব প্রশস্তি দিয়েছেন। আলিপুরে আমাদের পরিদর্শন করে তিনি চারু দত্তকে বলেন, "অরবিন্দ ঘোষের চোখ দেখেছ?"

"দেখেছি। কি বলতে চাও?"

"ওগুলো পাগলের চোখ।" (হাস্য)

চারু দত্ত অনেক কষ্টে তাকে বোঝাতে চাইল যে আমি মোটেই পাগল নই বরং কর্মযোগা ইত্যাদি।

পুরাণী: Manchester Guardian-এর লেখক Nevinson বলেছেন, আপনি কখনো হাসতেন না।

শ্রীঅরবিন্দ: জানি। তাঁর সাথে আমার দুবার দেখা হয়। একবার বাংলায় সুবোধ মল্লিকেব বাড়ীতে, তখন আমার গুরুতর অসুখ। আর একবার সুরাটে, যখন আমি Nationalist Conference-এর সভাপতি। সভাপতি বলে সেবারেও হাসতে পারিনি। সুতরাং তিনি লিখলেন, "The man who never laughs"—যে লোক কখনো হাসেনা। (হাস্য)

নীরদ: Taggart তো আপনাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পয়লা নম্বরের শত্রু মনে করত। সরকার মহলে যখন আপনার উপর নিষেধাজ্ঞা জারির (ordinance) আলোচনা হয়, তখন তা রদ করার প্রস্তাবে সে ভয়ানক আপত্তি করে।

শ্রীঅববিন্দ: কই, সেরকম নিষেধাজ্ঞা কিছু ছিল না ত। শেষবার

আমার নামে অভিযোগ হল কর্মযোগিনে আমার দুটো সই করা চিঠি নিয়ে। কিন্তু সেগুলো বিদ্রোহমূলক নয় বলেই ত রায় দেওয়া হল। এই নিষেধাজ্ঞা তাহলে উপকথা মাত্র।

নীরদ : ভারতবর্ষে অন্ততঃ ওটাই সাধারণের ধারণা। সবাই বলে আপনিই বিদ্রোহআন্দোলনের নেতা।

শ্রীঅরবিন্দ : ইংরাজদের ধারণা তাই। **Olive Maitland**-কে জান ত? রাজপরিবারের সাথে তাঁর বেশ বন্ধুত্ব। যখন এখান থেকে তিনি ফিরে যান, তখন তাঁদের বোঝাতে চেষ্টা করেন যে আমি নেহাৎ ভাল মানুষ, আমার আশ্রম অত্যন্ত মনোরম জায়গা, ইত্যাদি। কিন্তু তিনি টের পেলেন যে তাঁদের বিশ্বাস করান দূরে থাক, তাঁরাই ওঁকে পর্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখছেন। লর্ড মিন্টো ত বলেছেন অ, ঘোষকে পিষে না মারা পর্যন্ত বালিশে নিশ্চিন্তে তিনি মাথা রাখতে পারবেন না। তাঁর ভয় যে আবার আমি বিদ্রোহ সুরু করব। হত্যাও চলছিল তখন মাঝে মাঝে; কিন্তু কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না। বরং **Lord Carmichael** তাঁর লোক মারফৎ যে একটি প্রস্তাব পাঠান, তাতে বলেন যে আমি যেন দার্জিলিং গিয়ে থাকি। সেখানে তাঁর সাথে দর্শন আলোচনায় আমাদের দিন কাটবে ভাল। আমি রাজী হলাম না।

সরকারের ভয়ানক তাক লেগে গিয়েছিল। তাঁরা ভাবতেই পারেননি যে ভারতবাসীরা এরকম বিদ্রোহ আন্দোলন করতে পারে।

নীরদ : চারু দত্তও কি যোগ দিয়েছিলেন'?

শ্রীঅরবিন্দ : অবশ্য। সবাই সে খবর জানত, সেজন্য ইংরেজ-মহলে তাকে বলত, "রাজভক্তিহীন (disloyal) জজ।" সাহসী,

তেজস্বী, শক্তিমান ও সাদাকথার (frank) লোক ছিল সে। এই রকম লোকই আমাব পছন্দ। সে তার স্বদেশীভাব ইংরেজদের কাছে খোলাখুলিভাবে প্রকাশ কবত।

নীরদ : ইংরেজরাও তাঁকে পছন্দ করত?

শ্রীঅববিন্দ : হাঁ, তাবা এধবনেব লোক পছন্দ করে। D. Souza বলে আর একজনকে আমি খুব চিনতাম। তিনি এখন Mysore Stateএ কাজ করছেন। এরকম বুদ্ধিমান লোক আমি খুব কম দেখেছি। স্বাধীন মন তাঁব। জাতে দেশী খৃষ্টান কিন্তু খৃষ্টানত্ব কিছুই নেই।

নীরদ : Taggartই ত নাকি বিদ্রোহ দমনের মূল কারণ। কিছুদিন আগে সে Palestineএ কোনমতে প্রাণে বেঁচে যায়।

শ্রীঅরবিন্দ : হাঁ। আশ্চর্য যে, সবচেযে সেরা বদমায়েস যারা, তারাই এ রকম রক্ষা পায়।

নীরদ : চারু দত্ত তাঁব 'পুরাণো কথা'য় দুটো ঘটনা উল্লেখ করেন। আপনি নাকি তাস খেলতে ও গুলি ছুঁড়তে জানতেন না অথচ এতে আপনাকে যখন যোগ দিতে ডাকা হল, দুটোতেই আপনি তাঁদের অবাক করে দিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ : তাস খেলতে জানতাম না ঠিকই, Bridge আবার শক্ত খেলা। আমি জিততাম বলে সে মনে করত যে আমি সকলের তাসগুলি দেখতে পেযেছি। আর গুলি ছোঁড়া ত তেমন শক্ত কিছু নয়, ছোট ছোট পাখী শিকার করতে পারতাম সহজে।......

নীরদ : তিনি ফিরে যেতে পারবেন না ভয়ে এখানে আসতে চান না।

শ্রীঅরবিন্দ : শেষ যাত্রা ?

নীরদ : তিনি আপনার বিশেষ বন্ধু ছিলেন?

শ্রীঅরবিন্দ : হাঁ।...Beechcroft (আমার কলেজবন্ধু, আমরা Tripos একত্রে পাশ করি) কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতেন না আমি বিদ্রোহী হতে পারি। আর একজন ঘনিষ্ঠ ইংরেজ বন্ধু Ferrer বিচারের সময় আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। আমাদের তখন খাঁচায় বন্দী করে রাখা হয় জজসাহেবকে গুলি করে মারব ভয়ে। রেঙ্গুন কি সিঙ্গাপুরে তিনি ছিলেন ব্যারিষ্টার। আমায় এই খাঁচায় দেখে তাঁর খুব কষ্ট হয় কিন্তু বের করে আনবার কোন উপায় খুঁজে পান না। ইংরেজীতে Hexameter ছন্দের সঙ্কেত তাঁর কাছেই আমি পাই। তাঁর ধারণায় যেটি ইংরেজীতে Hexameter ছন্দে লেখা উৎকৃষ্ট লাইন সেটি তিনি আমায় আবৃত্তি করে শোনান। তাতেই ছন্দের দোলটি পেয়ে গেলাম। ইংরেজীতে সত্যিকারের ভাল Hexameter নেই, বড় বড় সমালোচকেরা একবাক্যে রায় দিয়েছেন ইংরাজীতে Hexameter চলবে না। Matthew Arnold এবং তাঁর বন্ধুরা চেষ্টা করেছেন বটে কিন্তু সফল হননি।

নীরদ : ইয়েটস্ লেখেননি?

শ্রীঅরবিন্দ : কই? আমি ত জানি না। তুমি বোধ হয় Alexandrine-এর কথা ভাবছ।

নীরদ : হাঁ, হাঁ, তাই।

শ্রীঅরবিন্দ : ওটা অন্য জিনিস। অনেকেই তা লিখেছে। এটা হল Dactyl Hexameter, যাতে Homer ও Virgil তাঁদের মহাকাব্য লিখেছেন। চমৎকার এর দোলা। মহাকাব্যের উপযুক্ত বটে। এখানেই সুরু করি লিখতে, অমল ও আর্জব পড়ে বলল যে ছন্দ ঠিকই হয়েছে। দুটো লাইন মনে পড়ছে :

Old and alone he arrived, insignificant,
feeblest of mortals,
Carrying Fate in his helpless hands
and the doom of an empire.

(*Ilion*)

নীরদ : আপনি কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন কখন ?

শ্রীঅরবিন্দ : যখন আমরা তিন ভাই Manchester-এ। Fox Family Magazine-এর জন্যে প্রথম কবিতা লিখি—হুবহু অনুকরণ, কার মনে নেই। তারপর লণ্ডনে নিয়মিত লিখতে থাকি, তার কিছু Songs to Myrtilla-তে ছাপান হয়েছে।

নীরদ : ছন্দ কোথায় শিখলেন ? স্কুলে ?

শ্রীঅরবিন্দ : না, না। স্কুলে ত ছন্দ শেখায় না। কবিতা জোরে জোরে পড়তাম, আর ধ্বনি শুনে লিখতাম। অবশ্য অমুকের মত আমি ছন্দবিদ (prosodist) নই।

নীরদ : মনোমোহন কি তখন কবি তকমা পেয়ে গেছেন ?

শ্রীঅরবিন্দ : হাঁ। Binyon, Philips, Cripps ও সে—ওরা চারজন। অবশ্য পরে সে তেমন বড় কিছু হতে পারেনি। বন্ধুদের সঙ্গে মিলে একটা কবিতার বইও বের করে, তার বেশ নামও হয়েছে। আমার ভাইই যে কবিতা লিখতে প্রেরণা দেয় এতে সন্দেহ নেই।

নীরদ : Oscar Wilde তাঁর বন্ধু ?

শ্রীঅরবিন্দ : হাঁ। প্রত্যেকদিন বিকেলে তার সাথে দেখা করতে যেত আর Wilde তার Wildish ঢঙে বলত, "সন্ধ্যার পিঙ্গল বেশে

এই যে ভারতীয় যুবা-চিতাবাঘ।''* Wilde লেখায় যেমনি চমৎকার, আলাপেও তেমনি। একবাব তার কয়েক বন্ধু তার সঙ্গে দেখা করতে আসে এবং জিজ্ঞেস করে সকালবেলাটি সে কি করে কাটাল। সে বলল সে চিড়িয়াখানা দেখতে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে চিড়িয়াখানার পশুদের এক মনোরম বর্ণনা দেয়! তার স্ত্রী কোণায় বসে তার কথা শুনছিল, সে আস্তে আস্তে বলল, "দেখ, কি করে এসমস্ত মিথ্যে কথা বললে? সারা সকাল ত তুমি আমার সঙ্গে কাটালে।"

"প্রিযে, মাঝে মাঝে কল্পনাব ঘুড়ি না ওড়ালে চলবে কেন?" বলল সে। (হাস্য)

তখন আমিও Wilde-এর কমা-র (Comma) গল্পটি বললাম, কি কবে ভদ্রলোক প্রায ঘন্টাখানেক ধরে কমাকে বদলাচেছ্ন সেমিকোলনে, আবার কমায়, তারপর আবার দাঁড়িতে। এমনি করে শেষ পযন্ত তিন কমাই বজায় রাখলেন, শ্রীঅরবিন্দ গল্পটি খুব উপভোগ করে বললেন, "হাঁ, ঠিক Wilde-এর মার্কা বটে।"

এবার পুবাণী মহাকাব্য সম্বন্ধে কথা তুলল। বলল যে গুজরাটে বহু পবীক্ষা চলেছে মহাকাব্যের ভাষা কি রকম হবে তা নিয়ে। সে দুঃখ করল যে কোন ভারতীয় ভাষায় সত্যিকারের এপিক নেই।

শ্রীঅরবিন্দ কেন? মধুসূদন? তিনি ভাল এপিক লিখেছেন। তাঁর কাব্যের গতি, ছন্দ ও রূপ চমৎকার, কেবল অভাব হল বিষয়বস্তুর। আশ্চর্য যে তিনি মহাকাব্য লিখতে পারলেন, কারণ বাঙালীর এপিক-মন নেই। বাংলা রামায়ণ মহাভারত বিশেষ কিছু নয়। তবে

* A young Indian panther in evening brown.

মধুসূদন Homer, Virgil খুব পড়েছেন কি না, সেজন্যে এই গুণ পেয়েছেন।

নীরদ : এপিক-মন কি রকম ?

শ্রীঅরবিন্দ : অর্থাৎ উঁচু, বিশাল, বৃহৎ ও শক্তিমান বলতে পার। কিন্তু বাঙালীমন হল সুকুমার ও সুষম ললিত। বাংলা চিত্রের সাথে পহ্লব ভাস্কর্যের এপিক মূর্তির তুলনা করে দেখ। একই কারণে ফরাসিরাও এপিক লিখতে পারেনি। তাদের ভাষাও অতিরিক্ত স্বচ্ছ, নিয়মাধীন ও সুললিত। ওতে এপিক লেখা চলে না।

নীরদ : মধুসূদনের কাব্যে বিষয়বস্তুর গৌরব নেই কেন বলছেন ?

শ্রীঅরবিন্দ : বিষয়গৌরবের জন্যে চাই উন্নত ও মহৎ মন, মহৎ চিন্তার প্রতি সংবেদন-ক্ষমতা, উদার ও বিশাল হৃদয়। জানই ত মধুসূদনের এসব গুণ দেখা যায়নি। (হেসে বললেন)

নীরদ। তবুও স্রেফ প্রতিভাবলে রাবণের প্রতি আমাদের সহানুভূতির উদ্রেক করেছেন, রামের জন্যে নয়। এটা কম কথা ?

শ্রীঅরবিন্দ : কিন্তু বাল্মীকির দারুণ রাবণচরিত্র অথবা মিল্টনের শয়তান চরিত্রের সাথে পাশাপাশি তুলনা কর, মধুসূদনের রাবণের চরিত্রকে মনে হবে না কত তুচ্ছ ? আর রামকে কী রকম ছোট করেছেন তিনি। (পুরাণীর দিকে তাকিয়ে) মহারাষ্ট্রের কোন এপিক নেই ?

পুরাণী : জানি না, Moropant বলে একজনের নাম শুনেছি।

শ্রীঅরবিন্দ : শ্রীধর বলে কেউ চেষ্টা করেছেন শুনেছি। জ্ঞানদেব নাকি চমৎকার কিছু লিখেছেন, কিন্তু বেচারা মাত্র একুশ বছরে মারা যান। তিনি ত জ্ঞানেশ্বরী গীতা লেখেন ১৫ বছর বয়সে।

পুরাণী : তুলসীদাসের মানস নাকি হিন্দীতে বেশ নামকরা এপিক।

শ্রীঅরবিন্দ : দক্ষিণীদের মতে কাম্বানের এপিক খুব উঁচুস্তরের। (নীরদের দিকে তাকিয়ে) নিশিকান্তও শুনছি এপিক লিখতে চায়।

নীরদ : পারবে না ? তার ত উপযোগী ক্ষমতা রয়েছে।

শ্রীঅরবিন্দ : অসম্ভব নয়।

নীরদ : তার দুইই আছে, যেমনি তেজ তেমনি লালিত্য।

শ্রীঅরবিন্দ : হাঁ, কিন্তু তার লিরিকই হল চমৎকার।

নীরদ : ইকবালের কবিতা পড়েছেন ? কারও মতে রবীন্দ্রনাথ থেকেও ইকবাল নাকি বড়।

শ্রীঅরবিন্দ : জানি না ; আমি তাঁর কবিতা অনুবাদে মাত্র পড়েছি ; তাতে মনে হয় না বস্তু-সম্পদে রবীন্দ্রনাথের চাইতে বেশি মৌলিক বলে।

পুরাণী : বর্তমান অবস্থায় এপিক লেখা সম্ভব কি ? কেউ কেউ বলে এপিক বিষয়ের অভাব নেই কিন্তু এপিক কবিরই অভাব।

শ্রীঅরবিন্দ : কি জানি! বহু শতাব্দী পরে নাকি এপিক কবি আসে। এপিক কবি তো গোণা যায়। আর বিষয়ের কথা যদি বল, নেপোলিয়ানের জীবনের চাইতে বড় বিষয় কি হতে পারে ? কিন্তু সংস্কৃতে দেখ কত এপিক কবি রয়েছে! ভাষাটাই যে এপিক! বাল্মীকি, ব্যাস, এমন কি ক্লাসিকাল কবি কালিদাস, ভারবী ইত্যাদি সবাই এপিক শীর্ষে উঠেছেন।

নীরদ : আপনার এপিক 'সাবিত্রী' মহাভারতের গল্পের মত ?

শ্রীঅরবিন্দ : না। আমি শুধু সূত্রটা সেখান থেকে নিয়েছি। আমার কাব্য হল প্রতীকী। আমার বিশ্বাস মহাভারতের গল্পও মূলে প্রতীকী ছিল, পরে দাম্পত্য প্রেমের নিদর্শন করা হয়েছে তাকে।

আমার কাব্যে সত্যবান হল আত্মার প্রতীক, মৃত্যুর আঁধার রাজ্যে সে নেমে এসেছে। আর সাবিত্রী হল দিব্য আলো ও জ্ঞানের ঈশ্বরী, নেমে এসেছে মৃত্যুর কবল থেকে সত্যবানকে উদ্ধার করবার জন্যে। অশ্বপতি হল তপঃশক্তির প্রভু। দ্যুমৎসেন হল প্রোজ্জ্বল অক্ষৌহিণীর অধিনায়ক। এই কাব্যে বাইরের ঘটনা কিন্তু খুবই কম, সব ঘটনা ঘটছে ভেতরে, অন্তরে। আরম্ভ হয়েছে প্রথম উষায়। যখন সাবিত্রীর ঘুম ভাঙল, তার নিয়তির দিনে, সেদিন সত্যবানের মৃত্যুদিন। আদ্যাশক্তি সাবিত্রীকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তাঁর পরম দান হিসাবে। অশ্বপতি হল যোগী, পৃথিবীকে অজ্ঞান থেকে উদ্ধার করা তার সাধনার উদ্দেশ্য।

নীরদ ; কতদূর এগিয়েছে আপনার লেখা ? প্রথম খসড়া কি শেষ হয়েছে ?

শ্রীঅরবিন্দ : হাঁ, কিন্তু সংশোধন বাকী। তোমায় ত বলেছি যে ১২ বার সংশোধনের পর মাত্র প্রথম বই শেষ করেছি।

নীরদ : ছন্দটা কি রকম ?

শ্রীঅরবিন্দ : Shakespeare-এর অমিত্রাক্ষর কাটিয়ে Marlowe-র দিকেই আমি ঝুঁকেছি। প্রত্যেক লাইন স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং প্রত্যেক বাক্য বড় জোর ৫।৬ লাইনে শেষ। কিন্তু মিল্টনের মত প্রবহমান নয়। মাঝখানে কোন যতিও নেই। Shakespeare বা মিল্টনের অনুরূপ নয়। এদের পরে অমিত্রাক্ষর ছন্দ তেমন উচ্চাঙ্গের হয়নি। এদের ষ্টাইলে লিখতে গেলে মিল্টনের নকল ছাড়া উপায় নেই কিন্তু মিল্টন শুধু একটিই। Yeats কতগুলি আখ্যায়িকা-মূলক কবিতা লিখেছেন Celtic বিষয় নিয়ে, Tennyson-এর

ছাঁচ অবলম্বনে। একটির বিষয় হল যেন রাজা, রাণী ও তার দিব্য প্রেমিক—ঠিক মনে নেই। কিন্তু তাঁর হাতে ছাঁচটা ঢের বেশি সুন্দর হয়েছে, Tennyson-এব ক্ষমতায় তা কুলাত কিনা সন্দেহ।

৪।১।৩৯

শ্রীঅরবিন্দ আজ নিজেই কথা সুরু করলেন। প্রথমে সত্যেন্দ্রকে সেই বায়ুরোগী সাধকটির খবর জিজ্ঞেস করলেন। পরে আমাদের বিশেষ পরিচিত এক কবি সাধক-বন্ধু অ-এর অসুখের খবর দিয়ে বললেন যে সে নাকি বম্বেতে boxing প্রতিযোগিতা দেখতে যায়। খেলা দেখতে দেখতে এমন মত্ত হয়ে ওঠে যে তাব হৃদবোগের কম্পন বৃদ্ধি পায়; প্রায় মূর্ছার অবস্থা, কোন মতে বাড়ী ফিরে আসে। এখন লিখছে যে আবাব দেখতে গেলে এরকম উত্তেজিত হবে না কিছুতেই।

মূর্ছার প্রসঙ্গে আমি আশ্রমে কতগুলো সাধকের মূর্ছা যাওয়ার কথা উল্লেখ কবলাম; সামান্য আঙুলকাটা dress করতে গিয়ে দেখি তারা খাবি খাচেছ! এমন কি ড'ও।

শ্রীঅরবিন্দ: ড'ও?

নীরদ: হাঁ, ভদ্রলোক খুব বুক ফুলিয়ে এগিয়ে এলেন, যেই ব্যাণ্ডেজটা খুলেছি, ব্যস, ধর ধর। অদ্ভুত!

শ্রীঅরবিন্দ: হয়ত তাদের যৌগিক দশায় পেয়েছিল (yogi-cised), অথবা অবচেতনারই প্রতিক্রিয়া, নয়ত নির্বিকল্প সমাধিতে পৌঁছবার চেষ্টা। সে অবস্থায় নাকি জ্বলন্ত লোহার দাগও টের পাওয়া

যায় না। একজন যোগীকে এভাবে পরীক্ষা করা হয়, আমার মনে আছে, তার কাছ থেকে যখন কোন সাড়া পাওয়া গেল না, সবাই ভাবল সে নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেছে, কিন্তু আমার বিশ্বাস কোন গভীর সমাধিতেও (trance) এইরূপ বাহ্যজ্ঞান লোপ সম্ভব।

নীরদ: হিপনটিজমও ত মানুষকে অবশ করতে পারে, গায়ে সূচ ফোটালেও লাগে না।

শ্রীঅববিন্দ: ঠিকই। আমি এই রকম এক হিপনটিক কেস্ জানি। আদেশ মত তাব হাতটি সে উপরে তুলল, আর চার পাঁচজন লোকও সে হাত নামাতে পারল না।

নীবদ: তার কোন ব্যাখ্যা আছে?

শ্রীঅববিন্দ: এসব হল অতিপ্রাকৃত ব্যাপাব, সাধাবণ জগতেব আইন কানুন দিযে তার ব্যাখ্যা চলে না।

হিপনটিজমেব প্রভাবে চিনি নাকি তেতো লাগে। তা যদি হয়, প্রশ্ন হল, চিনিটাই কি বিস্বাদ হয়, না মানুষেব অনুভূতি বদলে যায়? অর্থাৎ কোন দ্রব্যের গুণ নির্ভর করে দ্রব্যের উপব না দ্রষ্টাব মনের উপর (subject)? সৌন্দর্যের কথাই ধব না কেন। যখন কাউকে সুন্দর বলা হয, সে কি পাত্রটি সুন্দব বলে, না দ্রষ্টা মন বা subject-এর তাই মনে হচেছ বলে? অর্থাৎ জিনিষটা কি সম্পূর্ণ মানসিক (subjective), বস্তুনিবপেক্ষ?

নীরদ: সৌন্দর্য সম্বন্ধে বলা যায় ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ। আমার চোখে যা সুন্দর, অন্যের তা না হতে পারে কিন্তু চিনি ত সবারই মুখে মিষ্টি, সাধারণ অবস্থায় অবশ্য। এটা যখন মানুষের সার্বজনীন প্রতিক্রিয়া, তখন বলব না যে জিনিষের মাঝেই গুণটি রয়েছে?

শ্রীঅরবিন্দ : কিন্তু এই প্রতিক্রিয়া কি শুধু মনুষ্যসমাজে আবদ্ধ ?
সত্যেন্দ্র : আপনার কি সিদ্ধান্ত, স্যার ?
শ্রীঅববিন্দ : জানি না।

এই সময় মা এলেন ও জিজ্ঞেস করলেন, "আজ তোমাদের কি নিয়ে কথা চলছে ?"

সত্যেন্দ্র মাকে সব বৃত্তান্ত শোনাল এবং বলল, "শ্রীঅরবিন্দ কোন মত দিচ্ছেন না। আপনার কি মত, মা ?"

মা : আমার হিপনাটিজমে কোন আস্থা নেই। আমি প্রচুর কেস্ দেখেছি। এসব হল নানা শক্তির খেলা। শক্তিগুলো পিছনে অদৃশ্য থাকে আর আধারগুলো তাদের হাতে নিজেদের সঁপে দেয়, তখন শক্তিগুলো তাদের খেলায়।

আসলে হিপনাটিজমটা কি ? একজনের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা অন্যের ইচ্ছাশক্তিকে বশীভূত করা নয় কি ? বহির্নিষ্ক্রমণের (exteriorisation) একটা ঘটনা আমার জানা আছে। প্রযোজক (operator) সম্মোহিত ব্যক্তির প্রাণসত্তাকে (vital being) বাহিরে নিয়ে এসে প্রায় স্থূল শারীরিক রূপ দিল। অন্যদিকে, আর এক ব্যক্তির প্রাণসত্তাকে তার খালি জায়গায় ঢুকিয়ে দিল। এ সমস্ত ক্রিয়া ভয়ানক বিপজ্জনক। চারধারে এত শক্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে যে তারা স্বচ্ছন্দে শরীর দখল করে বসতে পারে, তাতে মৃত্যু ঘটাও বিচিত্র নয়। কোন নিপুণ শিক্ষকের অধীনে ছাড়া এসব ক্রিয়া চেষ্টা করা ঠিক নয়।

কিছুক্ষণ পরে মা চলে গেলেন। তখন শ্রীঅরবিন্দ বলে চললেন, যখন সূক্ষ্মশরীর বাইরে চলে যায়, স্থূল শরীরের সাথে সামান্য সূতার

সাহায্যে যেন তার যোগাযোগ থাকে। সেই সূতা যদি কোনমতে কেটে যায়, তাহলে মৃত্যু।

নীরদ: শুনেছি **Algeria**তে মারও এ রকম দুর্ঘটনা হয়েছিল?

শ্রীঅরবিন্দ: (আশ্চর্য হয়ে) কি করে জানলে? মা গিয়েছিলেন **Theon**-র কাছে। **Algeria**তে। তিনি মস্ত **occultist**। তাঁর স্ত্রী তাঁর চাইতেও পণ্ডিত। সেখান থেকে মা সূক্ষ্মশরীরে যান প্যারিসে তাঁর বন্ধুদের কাছে এবং পেনসিল দিয়ে তাদের সামনে কাগজের উপর কি কি লেখেন। কাগজটা সেদিন পর্যন্ত এখানে ছিল।

তারপরে কথা সুরু হল নানা অলৌকিক ঘটনা সম্বন্ধে। শ্রীঅরবিন্দ বললেন যে বিজয় গোস্বামীর একটি জীবনী অলৌকিক ঘটনায় ভর্তি। এর পরে চলল পাগল হরনাথের অলৌকিক ঘটনার কথা, বিশেষ করে তাঁর মৃত্যুব পর।

সত্যেন্দ্র: একবার কাশ্মীর থেকে ফিরবার পথে তাঁর গুরুতর অসুখ হয় এবং তিনি দুতিন ঘন্টা ধরে অজ্ঞান থাকেন। জ্ঞান যখন ফিরে এল, দেখা গেল তাঁর শরীর সোনাব রঙ হয়ে গেছে। এটা সম্ভব কি, স্যার?

শ্রীঅরবিন্দ: সম্ভব। যদি অজ্ঞান হয়ে থাকে, তাহলে সে অবস্থায় কিছু অবশ্য নেমে এসেছে। আমি একটি কেস জানি যেখানে লোকটি লম্বা হয়ে যায়।

সত্যেন্দ্র: আপনার রঙও নাকি বদলায়?

শ্রীঅরবিন্দ: (কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে) হ বলত যে সেটা ছায়ায় থাকার জন্যে। কিন্তু যোগীর কেন, সাধারণ মানুষেরও ত রঙ বদলায়। আমি বিলেতে হেশ বলে একজন বাঙালীকে জানতাম;

রঙ কালো, নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। কয়েকবছর পরে যখন সে ইউরোপ থেকে ফিরে আসে, দেখে মনে হল সে যেন সাহেব। বরোদায় সে আমার সাথে দেখা করতে আসে; আমি ত চিনতেই পারিনি। সে বলল, "বাঃরে, তুমি আমায় চিনতে পাচ্ছ না? আমি হেশ।"

আমি যখন প্রাণায়াম করতাম, নিশ্বাস যেন মাথার ভেতর জমাট হত। চামড়া হল মসৃণ ও ফরসা। বাড়ীর মেয়েদের চোখে পড়ে প্রথম, তাদের এ সব বিষয়ে নজর খুব তীক্ষ্ণ কিনা। এই সময় আমার ওজনও বাড়তে থাকে, আগে ছিলাম ছিপছিপে। তারপর আমার লালাতে কিছু একটা অদ্ভুত দ্রব্যের আস্বাদ পেতাম। বোধ হয় এটাই রঙ বদলাবার হেতু। এক ধরনের অমৃত নাকি মস্তিষ্ক থেকে ঝরতে থাকে যার ফলে অমরত্ব লাভ করা যায়।

একবার দর্শনের সময় এক আমেরিকান আমায় খুব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পরখ করে যেন দেখতে লাগল। সে নাকি দর্শনে আলো দেখতে পায় আমার চারপাশে। সেটা প্রাকৃতিক আলো কি না তাই পরখ করা তার উদ্দেশ্য। *দেখল* যে না, তা নয়; তখন ভাবল আমি একজন মহাত্মা বটে!

পুরাণী: এক সাধুর কথা আমি জানি। সে কতবার তার জিব কেটেই চলল ওই অমৃতরস পাবার আশায়। পরিণামে লোকটি পাগল হয়ে গেল।

শ্রীঅরবিন্দ: ওঃ, ওটা ত খেচরী মুদ্রা। সে বোধহয় ভুল রসটা পেয়ে থাকবে। এই দলের একটির পাল্লায় পড়ে বারীন। সে তাকে কত যে প্রতিশ্রুতি দিল, প্রলোভন দেখাল, তার জিব কাটবার জন্যে।

বারীন রুখে বলল, "কিছুতেই না।" তারপর চলল প্রচুর কাকুতি মিনতি। তাতেও যখন বারীন টলল না, তখন তারা শ্লেষ ঢেলে বললে, "বেটা ভীরু বাঙালী।" সেও উত্তরে বলল, "বাঙালী হই কি অবাঙালীই হই, কিছুতেই আমি কাটছি না, বাবা।" (হাস্য)

এখন কথা আবার তিব্বতী Occultism-এ ফিরে এল, সাহেবরা কি করে এত সহজে বিশ্বাস করে ঐ সব, অথচ আধ্যাত্মিকতায় তাদের যত সন্দেহ।

শ্রীঅরবিন্দ এই সাহেবরা হয় সবই বিশ্বাস করবে, না হয় কিছুই নয়। তাদের বল যে তিব্বতে ও মহাভুটানে এমন অনেক যোগী আছে যাদের বয়স ২০০০ বছর, মহাত্মারও অভাব নেই, তারা ছুটবে দেখতে। কে একজন অদ্ভুত যৌগিক নভেল লিখেছে নাকি, শুনেছ বোধ হয়, তিব্বত আর তার occultism নিয়ে। একটা পড়ে দেখেছি, যোগের চিহ্নও নেই।

নীরদ আমি দুটো পড়েছি, লেখিকা A. Beck.

শ্রীঅরবিন্দ ওঃ, মহিলা?

নীরদ . হ্যাঁ জাপান সম্বন্ধে একটি লিখেছে, জাপানী যুযুৎসু নাকি মিষ্টিক শক্তির প্রতীক এবং তারই এক ধরনের প্রকাশ।

শ্রীঅরবিন্দ আমার ত ধারণা যে জাপানী ধর্ম—Zen Buddhism হল তার আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্রশক্তি। সেখানে গুরুরা শিষ্যদের কি ভাবে পরীক্ষা করে জান? প্রথমে দেখে গুরুর ঘুষি সহ্য করবার কার কতখানি ক্ষমতা আছে। (হেসে) এখানে সে পরীক্ষা বোধ হয় শিষ্যদের বিশেষ মনঃপূত হবে না।

নীরদ আপনি কোন গল্প লেখেননি?

শ্রীঅরবিন্দ: লিখে থাকব হয়ত কিন্তু সব হারিয়ে গেছে। যখন আমাদের ঘর খানাতল্লাসী করবার গুজব ওঠে, আমার ট্রাঙ্কটি ডেভিডের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিছু কাল পরে যখন নিয়ে আসা হল, দেখা গেল যে সব গল্পগুলি সাদা উইপোকার আহারভুক্ত হয়েছে। ভবিষ্যতে নামজাদা গল্পলেখক হবার আশাও মাটি হল। (হাস্য)

কিন্তু আপশোষের বিষয় এই যে সাথে সাথে দুটো কবিতার অনুবাদও নষ্ট হল। একটা মেঘদূতের অনুবাদ। খুব ভাল হয়েছিল অনুবাদটা।

নীরদ: আহা!

শ্রীঅরবিন্দ: কিন্তু গল্পগুলো তেমন কিছু হয়নি, একটি ছাড়া। এটির দুটো পাতা এখনও রয়েছে কি না, তাই বলছি। অবশ্য গল্পগুলো সবই occult. Jules Romains-এর নাম শুনেছ? সে একাধারে ডাক্তার, ঔপন্যাসিক, নাটকলেখক ও occultist. তার সম্বন্ধে মার খুব উচচ ধারণা। সে নাকি বাইরের ঘটনা বা পরিবেশ বর্ণনা না করে ভিতর থেকে তাদের দেখে এবং সেই vision-এর রূপ দেয়। ইংরাজীতে তাকে বলা হয় Unanimist, অর্থাৎ সর্বভূতে একটিমাত্র আত্মায় বিশ্বাসী।

একটি নভেলে সে দেখাচেছ একটি স্ত্রীলোক সূক্ষ্মশরীরে তার স্বামীর সাথে সাক্ষাৎ করছে এক জাহাজে। স্ত্রী এসে সামনের চেয়ারে বসল। যেই স্বামী দেখল যে চেয়ারে দস্তুর মত তার বসার ছাপ পড়েছে, সে ভয়ানক ভয় পেল। ভাবল যে এগুলি ভগবানের আইনবিরুদ্ধ কাজ, তার অভ্যাস করা উচিত নয়।

এই হল পাশ্চাত্য মনের ধারা, তারা বেশি দূর এগুতে পারে না।

৫।১।৩৯

পুরাণী আজ খবর দিল যে পণ্ডিচেরীর এক নাম করা শ্রমিক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শ্রীঅববিন্দ শুনে খুব আশ্চর্য হলেন। পুরাণী বলল যে অতি অল্প বযসেই লোকটি নেতা হয়ে উঠেছে। তখন সত্যেন্দ্র সুযোগ পেয়ে শ্রীঅরবিন্দকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি যখন জাতীয আন্দোলন সুরু কবলেন, তখন আপনাব বয়স কত, স্যার ?"

শ্রীঅরবিন্দ: ৩৩ বছর, যদিও তাব বহু আগে আমরা স্বদেশী কাজ আরম্ভ কবেছি।

সত্যেন্দ্র: আপনার নির্বাণের উপলব্ধি হতেই কি যোগ আরম্ভ হল ?

শ্রীঅরবিন্দ: তাই; ১৯০৫ সালে বোধ হয। কিন্তু তাব আগে আমার অন্যান্য অভিজ্ঞতা হযেছে। বোম্বেতে নামামাত্র এক বিরাট স্তব্ধতা (calm) অনুভব করি। পরে হল আত্মার, পুরুষের অভিজ্ঞতা। মনে রেখো যে তখন আমি যোগ সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। শুধু তাই নয়, আবাব ছিলাম এক ধরনের সন্দেহবাদী (agnostic)। অসীমের দুটো অনুভূতি হয়, একটা পুণায়, পার্বতী পাহাড়ে; অন্যটি কাশ্মীরে শঙ্করাচার্য পাহাড়ে। বিরাট ভূমার উপলব্ধি।

হাঁ, কারনালীতে (Karnali) নানা মন্দির দেখতে দেখতে

একটি কালীমন্দিরে মূর্তিতে জীবন্ত কালীকে দেখলাম। তখন থেকে আমার ভগবানে বিশ্বাস জন্মাল।

নীরদ: যোগে টান হল কি করে?

শ্রীঅরবিন্দ: যোগে টান হল কি করে? ভগবান জানেন! বরোদায় থাকতে দেশপাণ্ডে ও অন্যান্য বন্ধুরা আমায় যোগে ভিড়াতে চেষ্টা করে। পাহাড়ে পর্বতে গিয়ে নির্জনে বসে থাকাই ছিল যোগ সম্বন্ধে আমার ধারণা। তা করতে আমি রাজী ছিলাম না, কেননা দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য কাজ করাই ছিল আমার কাম্য।

১৯০৫ সালে আমি প্রাণায়াম আরম্ভ করি। বরোদার এক ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন ব্রহ্মানন্দের শিষ্য, তিনিই আমায় প্রাণায়ামের ক, খ, শেখান, পরে আমি নিজেই অভ্যাস করতে থাকি এবং কতগুলো আশ্চর্য ফল পাই—যেমন (১) আমাব চাবদিকে একধরনের বিদ্যুৎ অনুভব করি, (২) অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র visions দেখি, (৩) খুব দ্রুত গতিতে কবিতা লিখতে পারি। আগে কবিতা লেখা ছিল কষ্টসাধ্য, একবার উৎসটা খুলত, অন্য সময়ে শুকিয়ে যেত। এবার যেন বান ডাকল এবং পদ্য, গদ্য দুইই দারুণ বেগে লিখতে লাগলাম। সেই বেগ আর থামেনি। পরে যদি না লিখে থাকি, তার কারণ আমি অন্য বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম বলে কিন্তু যখনই লিখতে যাই, তখনই সেই স্রোত নেমে আসে। (৪) এই সময় আমি মোটা হতে আরম্ভ করি; গায়ের রংও ফর্সা হয়। তোমাদের বলেছি যে লালাতে কি একটা অদ্ভুত রসের আস্বাদ পাওয়া যেত যার জন্যে এসব পরিবর্তন হয়েছে। আর একটা অদ্ভুত জিনিষ লক্ষ্য করেছি যে যখনই প্রাণায়ামে বসতাম, একটা মশাও কামড়াত না, হাজার মশার গুনগুনানি সত্ত্বেও। ক্রমশঃ

প্রাণায়াম বেশি বেশি অভ্যাস করতে লাগলাম কিন্তু ফলের কিছু তারতম্য হল না। এই সময় আমি নিরামিষ আহার নিলাম, তাতে শরীরে বেশ হাল্কা ও শুদ্ধ ভাব হল।

নীরদ: মাংস সম্বন্ধে কি বলেন? বিবেকানন্দ ত মাংস খেতে বলেছেন।

শ্রীঅরবিন্দ: মাংস হল রাজসিক আহার; শরীরে বেশ জোর ও তেজ সঞ্চার করে, সেজন্যে ক্ষত্রিয়দের মাংসাহার বিধেয় ছিল। বিবেকানন্দ সমর্থন করেছেন সাধারণকে তামস থেকে রজসে তোলবার জন্যে। তিনি কিছু ভুল করেন নি। তখন এক নাগা সন্ন্যাসীর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। আমি তাকে বললাম যে বিদ্রোহের কাজের জন্য আমি শক্তি পেতে চাই। সে আমায় একটা সাংঘাতিক কালীর স্তোত্র দিয়ে বলল, "জহি, জহি' বলে আবৃত্তি করবে।" করলাম; যাই ভেবেছিলাম, ফল কিছুই হলনা।

এই সময় বারীন automatic লেখার চেষ্টা করছে। একবার নাকি আমার বাবার এক ভূত এল এবং কতগুলো ভবিষ্যদ্বাণী করল। বলল যে তিনি বারীনকে একটা সোনার ঘড়ি দিয়েছিলেন। বারীন ত কিছুতেই স্মরণ করতে পারে না, পরে মনে পড়ল, ঠিকই। আর একটা বলল, লর্ড কার্জন শীগ্‌গীর ভারতবর্ষ ত্যাগ করবে। লর্ড কার্জন নাকি নীল সাগরের ওপারে তাকিয়ে রয়েছেন, দেখল। তখন তাঁর দেশে ফেরার কোন কথাই নয়, কিন্তু বাণী ফলল: লর্ড কিচেনারের সাথে তাঁর ঝগড়া বাধল, ফলে তাঁকে ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে হল। আর একটি মজার খবর দিল যে Devadar-এর বাড়ীতে দেয়ালে হনুমানের একটি ছবি আঁকা ছিল। Devadar নিজে বৈঠকে উপস্থিত ছিল,

সে বলল, কই, না ত! আমার ত মনে পড়ছে না। বাড়ী গিয়ে তার মাকে জিজ্ঞেস করতে বলল, 'ঠিকই কিন্তু এখন ছবিটা plaster করে ফেলা হয়েছে।' শেষ উক্তি হল, যখন সবাই আমাদের ত্যাগ করে যাবে, তখন তিলক (তিলক তখন উপস্থিত ছিলেন) আমাদের পাশে থাকবেন। এটাও ফলেছে।

আর একবার একটি স্পিরিট আসে, সেটা নাকি রামকৃষ্ণের। শুধু বললেন, "মন্দির গড়ো।" আমরা তখন পলিটিকেল সন্ন্যাসীদের জন্যে একটা মন্দির গড়ার প্লান করছি, তার নাম করেছি ভবানীমন্দির। আমরা ভাবলাম নিশ্চয় ওই মন্দিরের কথা উল্লেখ করছেন। পরে বুঝলাম, তা নয়। আমাদের অন্তরে মন্দির তৈরীর কথা বলছেন।

এটাই আমাকে যোগের দিকে শেষ প্রেরণা দেয়। আমি ভাবলাম মহাপুরুষেরা নিশ্চয় মরীচিকার পেছনে ছোটেননি। যদি সত্যি এমন কোন শক্তি থাকে তাকে পাব না কেন এবং পেলে দেশের কাজে লাগাব না কেন?

দেশের কাজে আমি দু তিনবার বাংলায় যাই। দেখলাম কর্মীরা নিজেদের মাঝে ঝগড়ায় ব্যস্ত; একটু ক্ষুণ্ণ হলাম।

বরোদায় থাকার সময় এক বাঙালী সন্ন্যাসী এসে আমার কাছে কিছু অর্থ সাহায্য চায়। দিলাম বটে কিন্তু দেখলাম লোকটি ভয়ানক রাজসিক, হিংসাপরায়ণ, দেমাকী এবং যারাই তার চাইতে বড়, তারা তার পক্ষে অসহ্য এবং তাদের সকলকে সে শাপান্ত করত। একদিন সে ব্রহ্মানন্দকে দেখতে গিয়ে তাঁকেও শাপ (curse) দিল, যেহেতু তিনি মহাপুরুষ। কিছুদিন পরেই ব্রহ্মানন্দ মারা যান, একটা পেরেক ফুটে'। মৃত্যুর জন্যে বাহাদুরী নিল সেই সন্ন্যাসী। আসল ব্যাপার

হল, ব্রহ্মানন্দের মৃত্যু আসন্ন হওয়ার দরুণ সেই ইঙ্গিতটা (suggestion) সূক্ষ্ম স্তর থেকে সন্ন্যাসী বোধ হয় পেয়ে থাকবে।

দেশের কাজে যখন বাংলায় গেলাম, প্রাণায়ামে মহা অনিয়ম ঘটতে লাগল। ফলে মরণাপন্ন অসুখ হল, প্রায় শেষ অবস্থা। এবার হালে পানি না পেয়ে যখন কোথাও নির্দেশ খুঁজছি, তখন দেখা হল লেলের সাথে। সর্দার ম'র বাড়ীতে, উপরের তলায়।

লেলের সাথে ছাড়াছাড়ির পর আমাকে নির্ভর করতে হল আমার ভিতরের গুরুর উপর। সে নানা ভুলভ্রান্তির ভিতর দিয়ে আমায় এগিয়ে নিল। কতদিন ধরে যে ভুল পথে চলেছি। কেবল পথের শেষে পৌঁছে বুঝতাম সে ভুল। তখন নানা ধরনের পরীক্ষা (experiment) করতাম, কোথায় কতটুকু সত্য আছে দেখতে।

দুবার উপোস করি, একবাব আলিপুর জেলে, দ্বিতীয়বার এখানে। প্রথমটায় বেশি ফল পাই। দশদিনের উপোস কিন্তু ১০ পাউণ্ড ওজন কমল অথচ এখানে ২৩ দিনের উপোসে তেমন কমল না। আলিপুরে কত যে কিছু দেখতাম, vision আর imagination, কী দারুণ সেসব প্রাণজগতেব দৃশ্য। আমার মনের একাংশ সতর্ক (critical) থাকত বলে নির্বিচারে সব কিছু গ্রহণ করত না। পণ্ডিচেরীতে উপোস করেও আমি দিনে আট ঘন্টা করে হাঁটতাম।

নীরদ: আমরা Guest House-এ আপনার পায়ের দাগ দেখেছি।

শ্রীঅরবিন্দ: Guest House? কোন ঘরে?

নীরদ: অমলের।

শ্রীঅরবিন্দ: না, না। আমি বলছি শঙ্কর চেট্টির বাড়ীর কথা। প্রাণজগতের যেসব অভিজ্ঞতা তাতে যেমন একটা উল্লাস ও

উদ্দীপনা (exalting) থাকে তেমনি থাকে সমূহ বিপদ। ফাঁদ আছে বিস্তর, সত্য কিছুই নেই। যেসব যোগী প্রাণ-স্তরে বাস করে, তারা তাদেব উপলব্ধি বাস্তব জীবনে ফলাতে পারে না। শক্তি অবশ্য অর্জন করা যায় কিন্তু এসব শক্তি আবার মানুষকে হিটলারের মত অধিকার করে বসে এবং যন্ত্রের মত চালায়। যন্ত্রটির কাছে অনবরত ইঙ্গিত, প্রেরণা (suggestion) আসে আর তাদের সত্য বলে সে গ্রহণ করে। ন'ও এই রকম অপপ্রেরণা শুনত আর ভাবত ওগুলো হল সম্বোধি, মা'ই তাদের পাঠাচ্ছেন। মা কতবার সাবধান করে দিলেন যে ওগুলো তা নয়। ফল হল উল্টো ; সে চটে গেল, মার কথা বিশ্বাসই করল না। শেষকালে আশ্রম ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হল।

ব'-এরও ওই দশা। সে বলত যে মা ও আমি নাকি তার অন্তরে রয়েছি, তারাই সত্যিকারের মা ও শ্রীঅরবিন্দ। দেহধারী আমরা মিথ্যা। এক্ষেত্রেও মা বহুবার সাবধান করে বলেছেন "ওসব মায়ার ফাঁদে পড়ো না।" কিন্তু এমনি গোঁয়ারগোবিন্দ সে, কিছুতেই শুনল না। চলে যেতে বাধ্য হল। বাইরে নাকি আমাদের নামে শিষ্য করছিল।

নীরদ : তার হঠাৎ মৃত্যু হল কেন?

শ্রীঅরবিন্দ : হঠাৎ কেন? সে ত এখানে বহুবছর পেটের যন্ত্রণায় ভুগছিল ; তা সত্ত্বেও যাকে বলে নাভি উল্টিয়ে খেত। যতদিন এখানে ছিল, আমরা তাকে রক্ষা করে এসেছি। মা তাকে বহুবার বলেছেন যে পণ্ডিচেরী ছাড়া মানে তার মৃত্যু। তবুও যখন সে চলে গেল, নিজের উপর নিজে মৃত্যুদণ্ড ডেকে আনল।

৬।১।৩৯

সন্ধ্যা ৭টা অবধি সম্পূর্ণ নীরবতার মধ্যেই কাটল। আলাপ আলোচনা করা বা কোন প্রসঙ্গ উত্থাপনের মত মনের ভাব সেই সময়টা কারুরই ছিল না। সকলের এই অবস্থা দেখে শ্রীঅরবিন্দ বললেন "মনে হচ্ছে আজ সবাইকে ধ্যানে পেয়েছে।" পুরাণী কোথায় গিয়েছিল, ফিরতেই সেও শুনতে পেল এই মন্তব্য। তাকে লক্ষ্য করে শ্রীঅরবিন্দ বললেন, "তুমি কোথায় উধাও হলে হঠাৎ, আমি তাই ভাবছিলাম।"

পুরাণী আমি মাকে বলতে গিয়েছিলাম, যদি আপনার কাশির জন্য যষ্টিমধুর ব্যবস্থা করা যায়। যষ্টিমধু সর্দিকাশিতে খুবই উপকারী।

শ্রীঅরবিন্দের দুএকটি প্রশ্নের পরে পুরাণী তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, অহংকে বিলুপ্ত করবার দুটি উপায় আছে। একটা উপরে আত্মার উপলব্ধি এবং তার জ্ঞান ও শুভ্রতা লাভ, দ্বিতীয়—অন্তরের দীনতা অর্থাৎ নিজেকে দীনহীন অনুভব করা—তৃণাদপি সুনীচেন। এই দুটি পন্থায় কোন পার্থক্য আছে কি? এই উপায়ে কি অহংএর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না?

শ্রীঅরবিন্দ অহংকার যেতে পারে—(কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি ফের বললেন) অহংকার যেতে পারে—

তাঁর কথার মর্ম যেন ধরতে পারলাম, তাই আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, অহংকার যেতে পারে কিন্তু অহং থাকবে, এই তো?

শ্রীঅরবিন্দ: অহং থাকবে বটে কিন্তু কোন ক্ষতি করবে না, যোগের পথে সাহায্যও করতে পারে। অহং থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হবে

তখন, যখন আত্মার সাথে এক হয়ে যাবে এবং সর্বত্র এই আত্মার প্রকাশ দেখবে। আরও অনুভব হবে যে, এই মন, প্রাণ, দেহ-প্রকৃতি হল বিশ্বমন, বিশ্বপ্রাণ ও বিশ্বদেহের ছায়া। ব্যষ্টিকেও উপলব্ধি করতে হবে বিশ্বাতীত বা বিশ্বপুরুষের—যে নামই দাওনা কেন—সাথে একত্ব।

মনের স্তরের উপরে উঠে আত্মা বা ব্রহ্মের উপলব্ধি হলে সাধারণতঃ মনের অহংবোধ চলে যায়, সমগ্র অহংজ্ঞানটা যায় না। সক্রিয় প্রকৃতি অহংকে আঁকড়ে থাকে, বিশেষতঃ প্রাণের অহংকে। যখন অন্তরাত্মার নম্রতা এসে তার সাথে যোগ দেয় তখন সে প্রাণের অহংকে দূর করবার সহায় হয়।

অহংএর হাত থেকে একেবারে নিষ্কৃতি পাওয়া সহজ নয়। যখন তুমি মনে করছ যে এবার তুমি মুক্ত, হঠাৎ সে তোমার ক্রিয়াকলাপের ভিতর এসে উপস্থিত হয়। বিশেষভাবে তোমায় দূর করতে হবে তোমার মনের ও প্রাণের অহং। অন্যগুলি, যেমন দেহের ও অবচেতনার অহং ততটা মারাত্মক নয়; ধীরে ধীরে সেগুলির প্রতিকার করা যায়, কারণ তারা তত সর্বগ্রাসী নয়। দীনতা বলতে ঠিক বাইরের দীনতা বোঝায় না। অনেক লোক আছে, তারা তাদের কথাবার্তায় ব্যবহারে দীনতার অবতার, অথচ ভেতরে ভেতরে তারা ভাবে—"আমিই একমাত্র পুরুষ।" বেশীর ভাগ লোকই এই বাইরের ব্যবহার দেখেই ভোলে।

M. D.-র অনুযোগ ছিল যে আমি আমার আগেকার মধুর শিষ্টতা হারিয়ে ফেলেছি যেহেতু আর দশজনের মত "আমি কিছু না" এই দীনতা আমি প্রকাশ করতাম না। কেমন করেই বা তা আমি করব যখন আমি জানি যে আমি কিছুই নই, একথা ঠিক নয়।

নীরদ : আগেকার জীবনে আপনি কি খুব বিনয়ী ছিলেন?

শ্রীঅরবিন্দ : আমি সব সময়ে নিজেকে পিছনে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করতাম, এক ধরনের আত্ম-অবলুপ্তি বলতে পার (self-effacement)। আর আত্মত্যাগ অভ্যাস করতাম (self-denial)। তবে ভেতরে অন্যদের চাইতে বেশী বিনয়ী ছিলাম কি না সন্দেহ।

পুরাণী : গান্ধিজীকেও সৌজন্য প্রকাশ করতে দেখা যেত যখন মালব্যজী বা অন্য কারও সাথে তাঁর মতের অমিল হত। তিনি বলতেন "উনি আমার গুরুজন, কিন্তু আমার মত আলাদা।"

শ্রীঅরবিন্দ : তিনি কি সত্যই তা বিশ্বাস করতেন? কারো সাথে আমার অমিল হলে আমি খুব কম কথায় গম্ভীরভাবে বলতাম "আমি একমত নই।" সুরেন্দ্রনাথ বানার্জী একবার চরমপন্থীদের দলে টানতে চেয়েছিলেন এবং U. P. মডারেট কনফারেন্সে তাদের নিমন্ত্রণও করেছিলেন, Sir P. Mehtaর বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে। কিন্তু নিয়মাবলীর একটা ধারায় লেখা ছিল যে কোন সমিতি ২ বা ৩ বছরের পুরানো না হলে সম্মিলনীতে প্রতিনিধি পাঠাতে পারবে না। আমাদের দল একেবারে নূতন। সুতরাং আমাদের যাওয়া ছিল বে-আইনী। কিন্তু বানার্জী বললেন তিনি আমাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করবেন। J. L. Banerji এবং আরো অনেকে এতে রাজি হলেন, কিন্তু আমি শুধু বললাম 'না'। বড় জোর ২০ কি ৩০টা কথা আমি বলেছি এবং প্রস্তাবটির ওখানেই দফা শেষ। যে ব্যক্তি তার দলের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাকে তুমি শিষ্ট বলবে? তিলকও সকলের বক্তৃতা ও প্রস্তাবগুলি শুনে নিয়ে শেষে নিজের প্রস্তাবই পাশ করতেন। প্রতিনিধিরা বলত, কী

চমৎকার গণনেতা। আমাদের মতামত কেমন মন দিয়ে শোনেন ও বিচার করেন।

তারপব হুগলি সম্মিলনীতে আমবা আবাব একত্র হই মর্লি-মিন্টো শাসনসংস্কার বিবেচনা করবাব জন্য। মধ্যপন্থীরা গ্রহণের পক্ষে—আমরা তার বিবোধী। সম্মিলনীব বিষয-নির্বাচনী সভায আমরা ছিলাম দলে ভারী কিন্তু মূলসভায তাদেরই সংখ্যা বেশী। বানার্জী তো আমাদের উপর বেগে আগুন, এবং এই বলে শাসালেন যে তাঁদের প্রস্তাব যদি গ্রহণ কবা না হয় তাহলে তিনি সদলবলে সম্মিলন ছেড়ে চলে যাবেন। আমাদের দল তখনও দুর্বল, কাজেই আমি চাইনি যে সেই সময় তাঁরা দল পবিত্যাগ করে বেরিয়ে যান। আমি তাই তাঁকে বললাম যে যদি আমায মূল সভায কথা বলতে দেওয়া হয়, তাহলে আমি তাঁদের সমর্থন করব। মূল সভায় তো খুব হট্টগোল ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। বানার্জী আপ্রাণ চেষ্টা করেও তা থামাতে না পেরে চটে লাল। তখন আমি উঠে দাঁড়িয়ে সকলকে শান্ত হতে বললাম এবং ধীরে ধীবে বেরিযে যেতে বললাম ও জানিয়ে দিলাম যে, যে প্রস্তাবেই আমরা রাজী হই না কেন সকলকে তা জানানো হবে। সবাই শান্তভাবে বেরিয়ে গেল দেখে বানার্জী তো আরো খাপ্পা। বললেন, "আমাদের মত পুরানো নেতারা যাদের বশে আনতে পারলাম না, একটি ত্রিশ বছরের ছোকরা কিনা সামান্য তর্জনী হেলনে তাদের বাধ্য করল।"

তিনি বুঝতে পারলেন না যে, আদর্শে নিষ্ঠাবান ব্যক্তিকে যারা একবাক্যে নেতা বলে মেনে নেয় কোথায় তার শক্তির উৎস। আসলে উচচমধ্যবিত্ত ও ধনীদের মধ্যে ছিল এদের প্রতিপত্তি। সেই সময় থেকেই সাধারণের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ ও নেতাকে মেনে চলার ভাব তাদের

ভিতর থেকে গড়ে উঠল। তারা খুব উগ্র ছিল বটে কিন্তু নেতার আদেশ মানতো। এতে গান্ধির পথ তৈরী হল।

সেই সময় সম্মিলনীর কাজ ছিল একেবারে গতানুগতিক। শুধু বাঁধাধরা কতগুলি প্রস্তাব পাশ করা হত মাত্র। কোনও সংশোধনী প্রস্তাবও থাকত না।

বানার্জীর নিজস্ব একটা আকর্ষণী শক্তি ছিল। মিষ্টভাষী এবং সকলকেই দলে টানতে পারতেন। আমাকেও বেশ আদর যত্ন দেখিয়ে, হাত বুলিযে দলে ভিড়াতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর মতলব ছিল চরমপন্থিদেব তিনি তাঁর তরবারি হিসাবে ব্যবহার করবেন আর মধ্য-পন্থিদের ব্যবহার করবেন জনগণের মুখপাত্র হিসাবে। গোপনে তিনি বিপ্লব থেকেও পিছপাও হতেন না। বিপ্লববাদ নিয়ন্ত্রণের জন্য একটা প্রাদেশিক সমিতি স্থাপনের চেষ্টায় ছিলেন। বারীন একদিন তাঁর কাছে একটা বোমা নিয়ে যায়। বোমার মামলায় বানার্জীর নামও ছিল। যেই নর্টন **S. N. Banerji** নাম উচচারণ করল, অমনি তাকে "চুপ চুপ" বলে থামিয়ে দেওয়া হল।

বরোদায় আমার বাড়ীতে বারীন বোমা তৈরী করছিল, কিন্তু আমি তার কিছুই জানতাম না। সুদক্ষ কেমিষ্ট এন, দত্তের কাছ থেকে সে বোমা তৈরীর কৌশলটা জেনে নেয়। সে, উপেন ও দেবব্রত আবার ভাল লিখতেও পারত, যুগান্তরে তারা লিখত।

পুরাণী এখন **Oundh** প্রদেশের রাজা কিভাবে তাঁর ওখানে শাসন ব্যবস্থার সংস্কার করছেন তার বর্ণনা দিল। শ্রীঅরবিন্দের আদর্শের সাথে তার যেন মিল আছে।

শ্রীঅরবিন্দ : গ্রামগুলিতে স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা আছে ?

পুরাণী: গ্রাম-পঞ্চায়তের হাতে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅরবিন্দ: ধর, প্রজারা যদি সোসিয়ালিজম বা কম্যুনিজম পছন্দ করে?

পুরাণী: রাজা সমবায় কৃষির প্রবর্তন করেছেন।

শ্রীঅরবিন্দ: ভাল। কিন্তু সাধারণ শ্রেণীর লোকের একচছত্র প্রভুত্ব ভিন্ন জিনিস। কাগজে কলমে সেটা খুবই ভাল শোনায় কিন্তু কাজের বেলায় সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রত্যেকের একই রকম চিন্তা হওয়া চাই। গির্জা বা কোন ধর্মসম্প্রদায়ের পক্ষে সেটা বেশ চলতে পারে। গির্জায়ও স্বাধীনতা আছে। তুমি নিজের ইচ্ছামত গির্জা বেছে নিতে পার, কিন্তু দেশ বেছে নিতে পার না। চিন্তা যদি একই রকমের হয়, উন্নতি হবে কি করে? লেনিন বা ষ্টালিনের সাথে গরমিলের স্পর্ধা দেখলে হত্যা করবে, নয়তো সরিয়ে ফেলবে। এরূপ অবস্থার মধ্যে মানুষ কি করে উন্নতি করবে, আমি ভেবে পাই না।

হিটলারকেই দেখ না। তার মোদ্দা কথাটা কি? সারা দুনিয়ার জার্মাণরা শ্রেষ্ঠ জাতি, এই তো? আর হিটলার তাদের নেতা। ইহুদীরা ভয়ানক শয়তান। জগতের সবাইকে 'নাজি' হতে হবে। ফ্রান্সকে পিষে মারতে হবে। এইতো তার দৌড়।......

সব গবর্নমেণ্টই ডাকাত। কেউ আইন করে ডাকাতি করে, কেউ আইন না করেই করে। কোন কোন দেশে তোমার আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ ট্যাক্স দিতে হবে। বাকিটা দিয়ে যেমন করে পার নিজের ব্যবস্থা করে নাও। শুল্ক হচ্ছে আর একটা ডাকাতি। কি বিপুল অর্থই না এইভাবে সংগ্রহ করে! এই প্রকাণ্ড আয় তাদের যায় কোথায় —নিজেদের সুখস্বার্থে ছাড়া, যেমন পণ্ডিচেরীতে? ফ্রান্স অনুযোগ

করছিল যে সরকার মোটে ২৫০টি এরোপ্লেন তৈরী করেছে, সেই তুলনায় জার্মাণী করেছে এক হাজার ও ইংলণ্ড পাঁচশত, যদিও ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থা মোটামুটি সৎলোকেরই হাতে। কিছুদিন আগেও পার্লা-মেন্টে এক প্রশ্ন ওঠে যে তারা এত টাকা খরচ করছে, তবুও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নয় কেন?

পুরাণী: আমি শুল্কবিভাগের একজন কর্তার কাছে শুনেছি যে আমাদের মহারাজারাও বিনাশুল্কে বে-আইনী মাল চালায়।

শ্রীঅরবিন্দ: শুল্কবিভাগের যে রকম আইন চোরাই মাল আম-দানি করা তো যেন একটা গুণই। এ যেন ঠগকে ঠকানো। জানতো দ্বারভাঙ্গার মহারাজা একলাখ টাকা দিয়ে Marie Antoinette-এর হার কেনে, তার জন্য ট্যাক্স দিতে হয় ৫০ হাজার টাকা।

পুরাণী এখন কংগ্রেস মন্ত্রিত্বের আলোচনা আরম্ভ করে বলল যে পেটেল Narimanকে আবার কংগ্রেসে ফিরিয়ে এনেছেন। তাঁকে একবার কংগ্রেস নির্বাচনের সময় বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

শ্রীঅরবিন্দ: ওটা বিশ্বাসঘাতকতা নয়, নিয়মভঙ্গ। মুখ্যমন্ত্রী Dr. Kher তো মনে হয় বেশ ভাল লোক।

পুরাণী: এক মধ্যপ্রদেশ ছাড়া কংগ্রেস-মন্ত্রিত্ব সর্বত্রই বেশ কৃতকার্য হয়েছে।

শ্রীঅরবিন্দ: হাঁ, ওটাই হল কংগ্রেসের দুর্বল জায়গা, আমাদের সময় ঐ নাগপুরই ছিল চরমপন্থিদের একটা বড় ঘাঁটি।

পুরাণী: ওরা এখন হিন্দুস্থানী-মধ্যপ্রদেশ ও মারাঠি-মধ্যপ্রদেশ দুটো ভাগ করার কথা বলছে।

শ্রীঅরবিন্দ: অবশ্য, ওটাই তো পরিষ্কার পথ। এতদিন করেনি কেন তাই ত ভাবছি।*

৭।১।৩৯

পুরাণী আজ আমায় বলল সে প্রশ্ন নিয়ে তৈরী। তবে আমার কোন প্রশ্ন থাকলে আমি যেন প্রথম সুরু করি। আমি রাজী। মা যেই চলে গেলেন আর মনে হল শ্রীঅরবিন্দও প্রস্তুত, বললাম, "আপনি কাল বলছিলেন অন্তরাত্মার উপলব্ধি (psychic realisation) হলেও অহং লোপ পায় না। তাই কি?"

শ্রীঅরবিন্দ: অহমিকা (egoism) লোপ পায় বটে, কিন্তু অহং (ego) থাকে। কারণ চৈত্যপুরুষকে কাজ করতে হয় ব্যক্তিগত প্রকৃতির মাধ্যমে, আর ব্যক্তি হল নিম্ন প্রকৃতির অধীন। অন্তরাত্মার উপলব্ধি হলে নিজের সত্তাকে বহুর অংশ বলে অনুভব হয় কিন্তু তাতে অহং লোপ পায় না। সে উপলব্ধি মনে, প্রাণে ও অন্যান্য অংশে কাজ করে, তাদের শুদ্ধ করে এবং ভক্তি প্রেম ইত্যাদির উপলব্ধি নিয়ে আসে। কিন্তু অহং থাকে, তবে সেটা হল সাধুর অহং, ভক্তের অহং, শ্রীরামকৃষ্ণ যাকে বলেন দাস আমি, ভক্ত আমি। রামপ্রসাদ ভাষান্তরে বলেন 'আমি চিনি খেতে চাই, চিনি হতে চাই না।' চৈত্যপুরুষ অবশ্য আত্মার বা ব্রহ্মের উপলব্ধির পথ খুলে দেয়, তখন অহং চলে যায়।

* এই আলাপটি শ্রীযুত তেজেন মুখার্জি অনুবাদ করেছেন।

আত্মার উপলব্ধি হলে তুমি সর্বত্র একককে দর্শন কর, তাঁর সাথে এক হয়ে যাও। তখন ব্যক্তি 'আমি'র জায়গা দখল করে ভাগবত 'আমি'। আত্মাকে আর আপন কাজের জন্যে ব্যক্তিগত প্রকৃতির উপর নিভর করতে হয় না। তবুও অহং সম্পূর্ণ চলে যায় না, যায় মনের অহং; অন্যান্য অংশগুলি নিজের পথে চলতে থাকে। এটাকেই বলা হয় প্রকৃতিকে তার পথে চলতে দেওয়া, যতদিন দেহের অবসান না হয়। দেহ খসে পড়ে, আব প্রকৃতিবও লয় হয়। যদি অহং সম্পূর্ণ দূর করতে চাও, তাহলে অন্তরাত্মাকে সামনে রাখতে হবে, কেন না প্রাণময় স্তর থেকে অহংকে দূর করতে হলে অন্তরাত্মার বা চৈত্যপুরুষের ও আত্মার বা ব্রহ্মের উপলব্ধি দুটোকে একসাথে কাজ করতে হবে। বুঝলে কিছু ?

নীরদ : দুটোর একসাথে কাজ হবে, না একটার পর অন্যটা ?

শ্রীঅরবিন্দ : কারও বেলায় চৈত্যপুরুষের, কারও বেলায় আত্মার (spiritual)। তবে যদি আত্মার দুয়ারই আগে খোলে, তাহলে সাধককে কিছুকাল পরে চেষ্টা করতে হবে চৈত্যপুরুষের দুয়ারও খুলতে। যারা অবশ্য শুধু মনের স্তরের উপলব্ধি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে চায় তাদের পক্ষে চৈত্যপুরুষের অভিব্যক্তির কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু সমগ্র রূপান্তর চাইলে দুটো না হলে চলবে না।

পুরাণী : স্নায়বিক কোষ (nervous envelope) দুর্বল হয়ে পড়লে প্রাণ-শক্তি সংগ্রহ করে তাকে সবল করা যায় না ?

শ্রীঅরবিন্দ : কোথেকে সংগ্রহ করবে ? উর্ধ্বশক্তি না বিশ্ব-প্রাণের শক্তি হতে ?

পুরাণী : বিশ্ব-প্রাণের শক্তি।

শ্রীঅরবিন্দ: তুমি তা অনুভব করেছ?

পুরাণী: হাঁ, Guest House-এ থাকার সময়।

শ্রীঅরবিন্দ: অর্থাৎ যখন সাধনা চলছিল প্রাণের স্তরে, আশ্রমের সেই চমৎকার যুগে?

পুরাণী: হাঁ, কিন্তু এখন আর চেষ্টা করি না নানা কারণে। হয় ক্ষমতার বা ইচ্ছাশক্তির অভাবে, নয় ত ভয়ে যে সেই উৎস থেকে শক্তি সংগ্রহ করা নিরাপদ হবে না।

শ্রীঅরবিন্দ: কেন? বিশ্ব-প্রাণ থেকে শক্তি সংগ্রহে ত কোন ক্ষতি নেই। তবে তার সাথে ঊর্ধ্বশক্তির সমন্বয় করতে পার।

স্নায়বিক কোষ সম্বন্ধে সচেতন হলে তার দুর্বল অবস্থায় এই দুই প্রণালীর সাহায্যেই তাকে শক্ত করা, তার খুঁত সারান অথবা তার শক্তি বৃদ্ধি করা, সবই সম্ভব। কিন্তু যদি ইচ্ছাশক্তির অভাবের কথা বল, সেটা ভাল নয়। তখন এই তামসিকতার বিরুদ্ধে সাবধান থাকতে হবে।

তুমি যে আমাদের আশ্রমের উজ্জ্বল দিনগুলির কথা উল্লেখ করছিলে, তখন আমরা ছিলাম প্রাণের স্তরে, সাধকের অদ্ভুত অভিজ্ঞতা বিরাট কর্মশক্তি, উৎসাহ ইত্যাদির অন্ত ছিল না। আমাদের যোগ যদি সে পথে চলত, তাহলে একটা বিরাট ধর্ম, প্রকাণ্ড সৃষ্টিতে আমাদের কাজ শেষ হত। কিন্তু আমাদের আসল কাজ ত তা নয়। সেজন্যে আমাদের স্থূল দেহে বা জড়ে নেমে আসতে হল। আর ওখানে কাজ করা যেন মাটি খোঁড়া—একেবারে জড় পদার্থ, পাথরের মত মৃত। যেই সেখানে কাজ সুরু হল, কোথায় উবে গেল সব উৎসাহ, অভিজ্ঞতা! এলেও ক্ষণিকের অতিথি। কাজ এগোয় অত্যন্ত মন্থর গতিতে;

ওঠাপড়া, পড়া-ওঠা এই হল ছন্দ। আর কাণে ঢুকছে অনবরত সেই বৈদিক অপশক্তিদের অশুভ গুঞ্জন (suggestion) 'বৃথা চেষ্টা, পণ্ডশ্রম! ফেল্ অনিবার্য'।

না, এসব উপেক্ষা করে দিনের পর দিন অণুকণা হতে অণুকণা ধরে কাজ করে যেতে হবে যতদিন না অবচেতনার কেন্দ্রস্থলে এসে পৌঁছেছ। সেখানেই হল গোটা সমস্যার জট পাকান। কাজেই বুঝতে পাচ্ছ, কী শক্ত কাজ! মানুষের স্বভাব সম্বন্ধে বিবেকানন্দের মত কি জান ত? কুকুরের লেজ! যতক্ষণ সোজা রাখছ ততক্ষণ সোজা; ছেড়ে দিয়েছ ত সেই পুনর্মূষিক! অবচেতনা হল বীজ, সেই বীজ ডালপালায় বাড়তে থাকে। সেই বীজকে অঙ্কুরে বিনষ্ট না করলে সে গজাতেই থাকবে।

নীরদ: এই অপূর্ব দানের জন্যে সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ দিতে হবে!

শ্রীঅরবিন্দ: এটাই হল অবিদ্যা। এখান থেকে ভগবানের কাজ সুরু। এই যদি না হত, লীলার অর্থ কি?

আমাদের এই যোগটা কি রকম জান? জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেন পথ কাটা। পথ একবার তৈরী হয়ে গেলে পরবর্তীদের পক্ষে খুব সুবিধা হবে। কিন্তু তার আগে দীর্ঘকালব্যাপী মহাযুদ্ধ। যত বাড়ছে তোমার বল, তত বাড়ছে বিরুদ্ধশক্তির বাধা। কতবার এদের কাছ থেকে প্ররোচনা এসেছে যে আমাব সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হবে কিন্তু মা'র visionটি কোনদিন ভুলিনি। জান সেটা?

আমরা তিনজনে কোথায় যাচ্ছি। আমরা দেখলাম র কোথায় গভীর নীচে নেমে যাচ্ছে। সেখান থেকে তার পক্ষে উঠে আসা

অসম্ভব। তারপর দেখা গেল মা আর আমি ঘোড়ার গাড়ীতে বসে'। সহিসটি বারবার তাকে একটি পাহাড়ে ওঠানামা করাচেছ। শেষকালে পাহাড়ের একেবারে চূড়ায় এসে গাড়ীটি থামল। এর অর্থ আমাদের কাছে পরিষ্কার।

সত্যেন্দ্র: নূতন সাধকদেরও কি আস্তে আস্তে এগুতে হবে?

শ্রীঅরবিন্দ: অবশ্য। কাজ অবচেতনায় চলছে কিনা! আর চাপ দেহ-চেতনায় পড়ছে বলে তাদেরও তার পরিবেশের ফল ভোগ করতে হবে, যদি না তারা পরিবেশ থেকে সরে দাঁড়ায়। একটি সাধকের মনের স্তরে দ্রুত উন্নতি হচিছল; নিজের চারদিকে বেড়া তুলে দিয়েছিল বলে—ভেতরের বেড়ার কথা বলছি। কিন্তু যেই সে প্রাণের স্তরে নেমে এল, আর এগুতে পারল না। সব উন্নতি আটকে গেল।

সত্যেন্দ্র: ব্রহ্মের সাথে যোগ কি একেবারে হারিয়ে যায়?

শ্রীঅরবিন্দ: না; আপাততঃ তাই মনে হয় কিন্তু সব কিছু পিছনে বজায় থাকে। কিন্তু সাধক যদি সমুখে এগুতে না চায়, তবে তার সাধনা ওখানেই থেমে যাবে। এই যা।

নীরদ: নূতনেরা তাহলে দ্রুত উন্নতি করতে পারবে না?

শ্রীঅরবিন্দ: কেন না? তবে দ্রুত উন্নতি অবশ্য সম্ভব যদি ভেতরের ভাব (right attitude) ঠিক থাকে, প্রাণ থাকে শুদ্ধ, সেখানে ময়লা না জমে। এ সমস্ত দাবী পূরণ করলে তবে হবে।

নীরদ: নূতনদের কপাল ভাল বলতে হবে, কেননা অবচেতনায় আপনাদের দখল এসে গেলে তাদের পথ সহজ হবে; আমাদের মত কষ্টভোগ করতে হবে না।

শ্রীঅরবিন্দ: এক হিসাবে সেটা ঠিক বটে, কিন্তু তেমনি "দাবীও

বেশি কড়া হবে। আর তোমাদের কথা যদি বল, অস্বীকার করতে পারবে না যে তেমন কিছু তপস্যা তোমরা কর নি; তোমাদের সময় বেশ সুখেই কেটেছে।

অবচেতনার যখন পরিবর্তন আসবে, তখন অনেকের পক্ষে ধাক্কা সামলান কঠিন হবে, এমন কি কেউ কেউ চলেও যেতে পারে, তারা দাবী পূরণ করতে পারবে না বলে। যেমন ধর অমুকের কথা। সে ত কবিতার রাজ্যে উড়ে বেড়াচ্ছিল; অন্যান্য জিনিষও বাদ যায়নি। মা যেই স্থির করলেন, "এ রকম তো চলবে না, তার প্রাণ-প্রকৃতি বদলান চাই!" কোথায় গেল তার কবিতা, কোথায় গেল সে। দাবী মেটাতে পারল না।

এক সময় আমি তোমায় তার আভাস দিয়েছি—বড় একটা পরিবর্তনের জন্যে মা দারুণ চাপ দিচ্ছিলেন। জানই ত মার স্বভাব। কিন্তু কেউ সহ্য করতে পারল না। আমরা ভাবলাম, পড়ল বুঝি সব ভেঙে। সাধকদের মাঝে দেখা দিল দারুণ গণ্ডগোল, আমাদের চাপ তুলে নিতে হল। অবশ্য আমাদের কাজ যে তাড়াতাড়ি করতে পারি না এমন নয়, কিন্তু ক'জন পরীক্ষায় টিঁকে থাকবে? সেই সময় যদি সাধকেরা তাদের আন্তরিকতা বজায় রাখত, আজ এই অবচেতনায় নামা সত্ত্বেও এতখানি বাধাবিঘ্ন হত না। কারণ সেই সময় যে শক্তিলাভ হয়েছিল, মা তার সাহায্যে দেহ-চেতনায় নেমে এসে কাজ আরও সহজে সারতে পারতেন।

কিন্তু সাধকেরা তা হতে দিল না, পদে পদে বাধা দিতে লাগল এবং মার উপর নূতন নূতন দাবী উপস্থিত করল। কোথায় তাদের উপরে তুলতে দেবে, তা না করে মাকে তাদের নীচের স্তরে টেনে আনতে চাইল।

কিছুকালের জন্যে আমাদেরও রাজী হতে হল; তার মানে কাজের দেরী। সব সাধক যে বিদ্রোহ করেছে তাও নয়। কেউ কেউ বলেছে যে কোথায় তাদের গলদ, কি তার স্বরূপ তারা বুঝতে পেরেছে কিন্তু সে গলদ শোধরাবার শক্তি তাদের নেই। আবার কেউ কেউ এমনও বলেছে যে তারা ভেবেছিল তাদের ভেতরটা একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে, কোন ময়লা বা গলদ আর নেই কিন্তু সেই গলদগুলিই পুনরায় উপস্থিত হওয়ায় তারা ভয়ানক আশ্চর্য হল।

এই হল অবচেতনার কাণ্ড। মন থেকে ময়লা সরাও, যাবে প্রাণে; প্রাণ থেকে শরীরে, সেখানেও তিষ্ঠাতে না দিলে ঢুকবে অবচেতনে এবং সেখানে আরামে বাস করবে। রাগ, হিংসা, কাম, আসক্তি—সব ধুরন্ধরদের বাসা সেখানে। সেখান থেকে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া চাই, যোগীর ভাষায় বীজ কেটে বার করে দেওয়া (cut the seed out), তবে নিষ্কৃতি। এরই জন্যে চাই রূপান্তর। প্রকৃতির রূপান্তর না হলে এই সব নিম্নপ্রকৃতির বীজ সেখানে থেকে যাবে।

নীরদ: কিন্তু একটা জিনিষ আমার মাথায় কিছুতেই ঢোকে না। ভগবানের সাথে পূর্ণ মিলনের পর কি করে এই সব প্রবৃত্তিগুলো দেখা দিতে পারে? যদি জিজ্ঞাসা করেন, পূর্ণ মিলন অর্থে কি বোঝ, বলতে পারব না।

শ্রীঅরবিন্দ: সেটাই ত জিজ্ঞাসা করব।

নীরদ: শ্রীরামকৃষ্ণের কথাই ধরুন। কই, তাঁর কোন কামভাব হয়েছিল কি?

শ্রীঅরবিন্দ: কেন? শোননি মার কাছে তাঁর প্রার্থনা*: যেন

কোনদিন কাম ভাব তাঁর কাছে না আসে? যদি আসে, তিনি আত্মহত্যা করবেন?

নীরদ: সে ত সাধনার সুরুতে?

শ্রীঅরবিন্দ: ঠিক। কিন্তু মা বা বিশ্বশক্তি কাম আর দ্বিতীয় বার পাঠাননি।

নীরদ: তাহলে সেটা অবচেতনে ছিল বলছেন?

শ্রীঅরবিন্দ: নিশ্চয়। তবে চেতনায় উঠলে তাকে তাড়িয়ে দিতেন, সন্দেহ নেই।

নীরদ: তাহলেই ত হল। তাড়িয়ে যদি দেওয়া যায়, তাহলে রূপান্তর টুপান্তর নিয়ে এত মাথা ঘামান কেন?

শ্রীঅরবিন্দ: রামকৃষ্ণ হলেন রামকৃষ্ণ। অন্য সবাই কি রামকৃষ্ণ? এই সমস্ত নিম্নপ্রবৃত্তির টানে কত যোগীঋষির পতন হয়েছে শোননি?

উত্তর দেশে থাকার সময় বহুদিন ধরে আমি অবিরামজ্বরে ভুগি। এখানেও তার জের চলে। সে সময় উপর থেকে কি আমার ভেতর থেকে কে বলল "আর জ্বর নয়!" আমার সত্তার কোন এক অংশ সেই আদেশ বা প্রেরণা গ্রহণ করল, আর জ্বরও থামল। কিন্তু সবাই কি তা পারে?

মানুষের স্বভাব কী অপরূপ বস্তু জান না, সাংঘাতিক ঘোরালো ব্যাপার তা। আমার সেই নির্বাণের অভিজ্ঞতা কায়েমী হয়ে গেছে তোমাদের বলেছি কিন্তু তার জন্যে কি আমায় কম পরিশ্রম করতে হয়েছে, সত্তার প্রত্যেক স্তরে এই স্থিরতা ও সমতা (calm and equanimity) প্রতিষ্ঠিত করতে? সমতা কাকে বলে জান? যে কোন

অবস্থায় বিন্দুমাত্র টলবে না (nothing stirs), কোন তরঙ্গ উঠবে না, তাকে বলে সমতা। গত আগষ্ট পর্যন্ত সেই সমতা বজায় রেখে এসেছি, এই দুর্ঘটনাটা হল তার শেষ পরীক্ষা। এইভাবে তোমায় কাজ করে যেতে হবে যতদিন না সেই অবচেতনার কেন্দ্রে এসে পৌঁছেছ। এইভাবে কাজ করতে গিয়ে নজরে পড়ল যে ভিতরে ছোটখাট গলদ বা ফাঁক রয়ে গেছে, যেগুলো পূরণ করা হয়নি। সেজন্যে বোধ হয় এই দুর্ঘটনাটা হতে পারল। এই অবচেতনা যখন জয় করা হবে, এক মহাশক্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং পৃথিবীর সমস্ত কাজ চালাবে সেই শক্তি। যারা সেই শক্তি ধারণ করবে, তারা তাকে ঢেউএর মত পাঠাতে পারবে পৃথিবীর পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে।

নীরদ: আশা করি আপনি এখন দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছেন।

শ্রীঅরবিন্দ দুর্ঘটনার মুহূর্ত পর্যন্ত বেশ যাচ্ছিলাম যেন! যখন একটা প্রকাণ্ড শক্তির স্পর্শ পাওয়া যায়, তখন কাজ খুব দ্রুত চলে কিন্তু স্পর্শ পাওয়াই মুস্কিল। আর, কী রকম অদ্ভুত, দেখ!—এই শোয়া অবস্থায় না পারি পূর্ণমাত্রায় (maximum) শক্তি নামিয়ে আনতে, না পারি সেই সর্বোচ্চ শক্তি ব্যবহার করতে, যা অব্যর্থ। সেই শক্তি সাময়িক হলেও তার কাজ অব্যর্থ। শোয়াটা বোধ হয় তামসিক অবস্থা, আরামের কিম্বা বিশ্রামের। এতে আমি মোটেই অভ্যস্ত নই। বেড়াবার সময় অথবা বসা অবস্থায় কেবল সর্বোচ্চ শক্তিকে নামাতে পারি। এই যে কাসিটা চলছে নেহাৎ কুঁড়েমির জন্যে তাকে সারাতে শক্তি প্রয়োগ করি না। যখন বড্ড বিরক্তিকর হয়ে ওঠে তখন কিছু করতেই হয়।

নীরদ: ধ্যানের সময় নাকি সোজা হয়ে বসা ভাল? এখানে ত আমরা নানা ভঙ্গীতে বসি।

শ্রীঅরবিন্দ: স্থির হয়ে বসা শ্রেয়। তাতে ধ্যান জমে। সূক্ষ্মশরীরে যা নেমে আসে তা সহজে স্থূল শরীরে চালনা করা যায়। কত রকমের আসন রয়েছে। একবার আসনে ঠিক বসলে শরীরও স্থির থাকে।

নীরদ: মার শরীর ত ধ্যানে নুয়ে পড়ে।

শ্রীঅরবিন্দ: মার শরীর খুব নমনীয় (plastic)। ধ্যানের প্রকৃতির সাথে তাঁর শরীরও বদলায়। তোমরা দেখেছ ত তাঁর চেহারাও কি রকম বদলে যেত।

নীরদ: অমুকের শরীরে যখন আলো নামত, তখন তাকে নাকি আসন ছেড়ে উঠতে হত।

শ্রীঅরবিন্দ: অর্থাৎ শক্তি ধারণ করবার সামর্থ্য নেই তার।

৮।১।৩৯

আজও কেউ কথা সুরু করতে রাজী নয়, যেন আমাদের সব কথা বলা হয়ে গেছে। এদিকে শ্রীঅরবিন্দ তৈরী, আমাদের দিকে তাকাচ্ছেন আর বলছেন যেন "কি হল?" এই অপ্রস্তুত অবস্থায় হঠাৎ তাঁর দিকে তাকাতেই তাঁর চোখে ধরা পড়ে গেলাম, আর হেসে উঠলাম। অন্য সবাইও যোগ দিল হাসিতে। পুরাণী তখন বলল "Middleton Murray গান্ধিজীর অহিংসায় বিশ্বাসী হচ্ছেন। হিটলারের কাণ্ডে তাঁর ভগবানের দিকে মতি হচ্ছে, ভাবছেন পাদ্রী হবেন।"

শ্রীঅরবিন্দ: কি ব্যাপার?

পুরাণী : ঠিক জানি না। সেই একটি রাতে হিটলার ৮০ জন লোককে যখন হত্যা করল তাঁর মনে হল হিটলার anti-Christ.

শ্রীঅরবিন্দ : কেন? Murray ত হিটলার-শাসনের বহু আগে থেকেই মিষ্টিক। তিনি কি বলতে চান ভগবানে তাঁর বিশ্বাস এখন আরও প্রবল হয়েছে?

পুরাণী : কি জানি! গান্ধিজী লিখছেন, জার্মাণীতে কিছু লোক অহিংসা নীতি চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে এই কারণে যে হিটলারের হৃদয় গলাবার পক্ষে তাদের আন্দোলনে যথেষ্ট উত্তাপ ছিল না।

শ্রীঅরবিন্দ : সেই উত্তাপের জন্যে তাহলে একটা অগ্নিকুণ্ড চাই। তার হৃদয় গলাবার একটি মাত্র উপায় আছে—বোমা মেরে সেটা উড়িয়ে দেওয়া। তখন তার ভাবালু সত্তাটি, যেটা তার মা'র কবরে গিয়ে কাঁদে, ছবি আঁকে—

নীরদ : লণ্ডনের সেই কোচম্যানের psychic?

শ্রীঅরবিন্দ : হাঁ। সেটি পরজন্মে একটা সুযোগ পাবে। আশ্চর্য যে ভাবালু লোক কি রকম সাংঘাতিক নিষ্ঠুরও হতে পারে।

গান্ধির ব্যাপারটা কি জান? তাঁকে ইংরাজদের সাথে লেনদেন করতে হচেছ এটাই তাঁর মস্ত সুবিধা। যদি হত জার্ম্মান বা রুশ বুর্জোয়া তাহলে তাঁর অহিংস নীতি একদিনও টিকত না। ইংরাজদের একটা বিবেক আছে, তার কাছে তারা অপরাধী হতে চায় না। আর আছে আত্মমর্যাদাজ্ঞান; বিশ্ববাসীর সম্মানও চায়। তা'বলে তারা যে ভাবালু নয়, এমন নয়, তবে সেটা তারা দেখায় না। রুশ ও জার্মান জাত যেমনি নিষ্ঠুর, তেমনি ভাবালু। আজ রুশরা তোমায় জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে, আবার কালই হয়ত গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদবে।

ইংরাজরাও খুব নিষ্ঠুর হতে পারে, কিন্তু সেটা সাময়িক। একটানা নৃশংসতা তাদের ধাতে নেই। হিটলারের নিষ্ঠুরতা একেবারে তার রক্তে।

ইংরাজ যদি নেহাৎ উৎপাত করে, তখন তাকে শিক্ষা দেবার একটি মাত্র উপায়—নাকে মুখে কষে দু'একটা ঘুষি মারা। ব্যস্, একেবারে ঠাণ্ডা। বহু নজির রয়েছে এ ধরনের।

পুরাণী : আমার মনে পড়ছে ফিজিদ্বীপের এক পাঞ্জাবীর গল্প। এক ইংরাজ তাকে নাকি ভয়ানক জ্বালাতন করত। যখন সহ্যের সীমা পার হল, তাকে ধরে সে বেদম পিটুটি লাগাল। তখন সাহেব বলল, "হয়েছে, হয়েছে!" আর গোলমাল করে নি সে।

শ্রীঅরবিন্দ : খুবই সত্যি। আমরা একবার দেশপাণ্ডেকে বিদায় দিতে ষ্টেশনে যাই। দেখলাম তার গাড়ী ইংরাজে ভর্তি—একটু ভয় হল। পরে তার কাছে শুনলাম যে যেই সে তার জায়গায় বসেছে, সাহেবেরা তাকে রুখে বলল "এখান থেকে বেরিয়ে যাও। নইলে মার দেব।" সে উত্তর দিল, "এসো, দেখো একবার।" আর তারা সাহস করে এগুল না।

আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের আগে লোকেরা সাহেবের ভয়ে কাঁপত, কিন্তু পরে কোথায় যে চলে গেল সে ভয়! আর ফিরে আসেনি। পলকে হাওয়া বদলে গেল। হাওড়ায় একবার এক ইংরাজ একটি ছেলেকে খামকা ধমকাচ্ছিল। ছেলেটি হঠাৎ 'বন্দেমাতরম্' বলে চিৎকার করে উঠতেই ট্রেনের সমস্ত লোক একসাথে তাতে যোগ দিল। ভয়ে পালিয়ে গেল সাহেবটি।

বাঘ-পুষিয়ে শ্যামাকান্তর নাম শুনেছ নিশ্চয়। সে একবার ট্রেনে কোথায় যাচ্ছিল। তার কামরায় ছিল কতগুলি গোরা সৈন্য, এক

বাঙালী আর তার স্ত্রী। সৈন্যরা তার স্ত্রীকে বিরক্ত করতে আরম্ভ করে, লোকটি একেবারে ভয়ে কেঁচো ! তখন শ্যামাকান্ত উঠে সৈন্যদের ধরে তাদের মাথায় মাথায় ঠাস্ ঠাস্ ঠুকতে লাগল। পরের ষ্টেশনে বীরপুঙ্গবেরা বেরিয়ে গেল।

কত ঘটনাই মনে আসছে। আর একবার আমরা shooting অভ্যাস করছি, আমাদের মাঝে ছিল এক মধ্যবয়সী বাঙালী। তাকে বলা হল গুলি ছুঁড়তে। ভদ্রলোক ভয়ানক নার্ভাস হয়ে বলল কোন দিন গুলি ছোঁড়েনি। চোখ বুজে ছুঁড়ল গুলি। তারপর চোখ খুলে বললে হেসে, "এত সোজা ! আমি ত জানতাম না !"

আমরা দুইভাই প্রায়ই বৈদ্যনাথে পাখি শিকারে বের হতাম,—অবশ্য উদ্দেশ্য ছিল shooting অভ্যাস করা। একবার আমাদের মাসীর নজরে পড়ে যাই। তিনি বললেন "ছেলে দুটি ফাঁসিতে ঝুলবে একদিন।" তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী ফলেছিল প্রায় ; বারীনের ত ফাঁসীর হুকুম হয়েছিল।

স্বদেশী আন্দোলনের আগে দেবব্রত আর আমি দেশভ্রমণে বের হই দেশের লোকের কি রকম অবস্থা জানতে। আমাদের প্রধান খাদ্য ছিল কলা। দেবব্রত ছিল খুব মিষ্টভাষী, সহজে অন্যদের দলে টানতে পারত। দেখলাম দেশজোড়া নৈরাশ্য (pessimism), আঁধারের এক বিরাট বোঝা যেন দেশের বুকের উপর চেপে আছে। আমাদের মাঝে মাত্র ৫।৬ জন স্বাধীনতার পক্ষে। দেশের লোকদের বোঝান দায় যে স্বাধীনতা চাই।

খুলনায় আমরা রাজার মত সমাদর পেলাম। খাবারের কী বাহার ! কেউ আমায় রাজনৈতিক নেতা বলে চিনল না, চিনল কে, ডি, ঘোষের

ছেলে বলে। এককালে আমার বাবার একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল সেখানে। এমন লোক ছিল না যে তাঁর দ্বারা উপকৃত হয়নি ; কেউ তাঁর দুয়ার থেকে খালি হাতে ফিরে যায়নি। তিনি গরীবের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। খুলনা যাবার আগে বাবা ছিলেন রংপুরে। সেখানেও তাঁকে লোকে বলত রংপুরের রাজা।* ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁর বিশেষ বন্ধু ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন কাজে হাত দিতেন না। এই ম্যাজিষ্ট্রেটেরই বন্ধু Drewettদের পরিবারে আমরা বিলাতে থাকি। এই ম্যাজিষ্ট্রেটটি বদলী হলে যখন নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট রংপুরে আসে, তখন দেখে যে সেখানে তাকে কেউ আমল দেয় না, আমার বাবাই সর্বে-সর্বা। সেটা সাহেবের বরদাস্ত হল না ; সরকারের কাছে লিখিয়ে বাবাকে বদলী করাল। বাবা এলেন খুলনায়। কিন্তু এই কদর্য ব্যবহারে তিনি এত মর্মাহত হন যে সাহেবদের উপর তাঁর ভক্তি উবে যায় এবং ভিতরে ভিতরে তিনি স্বদেশীভাবাপন্ন হন।

বেচারলাল : আপনি ত আপনার বাবার সঙ্গে খুব অল্পকালই ছিলেন ?

শ্রীঅরবিন্দ : হাঁ ; শিশুকাল মাত্র। ৭ বছরে আমরা বিলাত রওনা হই, আর ফিরবার আগে তিনি মারা যান। এক হিসাবে আমিই তাঁর মৃত্যুর কারণ। তিনি হৃদরোগে ভুগছিলেন। Grindlay কোম্পানী আমার দেশে ফিরবার দিন, জাহাজের নাম, তাঁকে জানায়। সে জাহাজ পর্তুগালের কিনারে ডুবে যায় এবং অনেক যাত্রী মারা পড়ে।

---

* রংপুরের শহরের ভিতর দিকে তিনি কয়েক মাইল দীর্ঘ একটি খাল কাটিয়েছিলেন—তার নাম এখনো K. D. Canal.

ভাগ্যক্রমে সেই জাহাজে আমার যাত্রা হয়নি কিন্তু Grindlay তা জানত না বলে বাবাকে সোজা তার করে দুর্ঘটনাটি জানায়, তাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

ছেলেদের সম্বন্ধে তাঁর মস্ত আশা ছিল ; এক একজন সিভিলিয়ান হবে, এই ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা। তা' ব'লে তিনি যুক্তিহীন গোঁড়াও ছিলেন না। মনোমোহন যখন জানাল যে সে কবি হবে, তিনি মোটেই আপত্তি করলেন না, বললেন তাতে ত কোন দোষ নেই। কিন্তু টাকা-পয়সা পাঠান বন্ধ করলেন।

বেচাবলাল : তিনি নাকি নিয়মমত খরচ পাঠাতেন না ?

শ্রীঅরবিন্দ : না। এক বছর আমরা কাটাই সপ্তাহে ৫ শিলিং খরচে। সেটা উপার্জন করত আমাদের বড় ভাই, Sir Henry Cotton-এর ভাই-এর দৌলতে। তিনি ছিলেন South Kensington Liberal Club-এর secretary, আমার ভাইকে তিনি সহকারী হিসাবে গ্রহণ করেন। আমাদের শীতের কোট পর্যন্ত ছিল না। সকালে খেতাম চা রুটি আর ham, বিকেলে sausage। মনোমোহনের এই কৃচ্ছ্রতা সহ্য না হওয়ায় সে এক Boarding Houseএ চলে গেল। কি করে যে সেখানে খাবার যোগাড় করত সে-ই জানে। একবার যখন আমার কলেজের বেতন বাকী পড়ে, প্রিন্সিপাল আমায় ডেকে পাঠান। আমি বললাম, বাবা টাকা পাঠাননি। তিনি বাবাকে এই মর্মে চিঠি লেখেন। উত্তরে তিনি শুধু কলেজের বকেয়া মাহিনাগুলিই পাঠিয়ে দেন এবং আমার অমিতব্যয়িতার জন্যে পাঠান এক বক্তৃতা। তাতে কষ্ট যে পাইনি তা নয়, ৫শিলিং মাত্র খরচে আমরা যখন চলছি। মনোমোহনকে বলতে পার অমিতব্যয়ী।

যখন কেম্ব্রিজে গেলাম, এক দর্জির সঙ্গে পরিচয় হল। সে ধারে পোষাক তৈরী করে দিত। লণ্ডনে ফিরে গেলে সে আমায় সেখানে খুঁজে বের করে এবং মনোমোহনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে নেয়। মনোমোহন একটা লাল ভেলভেট স্যুট তৈরী করায়; কড়া লাল নয়, সুরুচিসঙ্গত লাল। সেটা পরে' সে Oscar Wildeএর সঙ্গে দেখা করতে যেত। আমরা দেশে ফিরে এলে সেই দর্জিটা বাকী পাওনার জন্যে মনোমোহনের বিরুদ্ধে ভারত সরকারের কাছে নালিশ করে আর আমার বিরুদ্ধে লেখে বরোদার মহারাজার কাছে। আমি প্রায় সমস্ত দেনাই শোধ করেছিলাম, ৪ পাউণ্ড পাঁচ শিলিং মাত্র বাকি ছিল। সেটা, আমার মতে, না দিলে মোটেই অন্যায় হত না, কেননা লোকটা আমাদের কাছে ডবল দাম উসুল করেছে স্যুটের জন্যে। মহারাজা বললেন, পাওনা দিয়ে ফেলাই ভাল।

মনোমোহনের মাঝে মাঝে কাব্যরোগ দেখা দিত। একবার আমরা হেঁটে বেড়াতে বেড়াতে Cumberlandএর lake পার হচ্ছি। দেখলাম সে প্রায় আধ মাইল পিছনে, মন্থর আলস্যে হাঁটছে আর বিষাদ-গভীর গলায় কবিতা আওড়াচ্ছে। সামনে একটা খাড়া জায়গা ছিল বলে আমরা তাকে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আসতে বললাম। কিন্তু কে কার কথা শোনে! সে সমানে কবিতা আওড়াতে আওড়াতে ধীর মন্থর গতিতে উপস্থিত হল। দেশে যখন ফিরে এল, সেই কবিগিরি আর রইল না।

যখন বারীনের ও আমার রাজনৈতিক খ্যাতি হল, সে গর্ব করে বলত, "দেশে আড়াইটা লোক আছে। দুজন আমার ভাই, আধজন হল তিলক।"

আর একবার মনোমোহন আর আমি আমাদের নিজস্ব চাকর নিয়ে

বৈদ্যনাথে বেড়াতে আসি। দুটো চাকর তাদের স্ব স্ব মনিবের গুণ-পনা কীর্তনে ব্যস্ত। আমাদের মামা ছিলেন খুব রসিক লোক, তিনি তাদের আলাপ শুনতে পান। আমার চাকর বলছিল, "আমার মনিব কী উদার, তেল ঘি ইত্যাদি জিনিষে দরাজ হাত। তোর মনিব কি রকম?" "আমার মনিব?" চাকরটি উত্তর দিল, "ওঃ আমার মনিব খায় কেবল পেয়ারার রস আর তেলের জল!" মামা সেটা আমাদের কাছে ফাঁস করে দেন। মনোমোহন ত শুনে খাপ্পা! চাকরকে "বিশ্বাসঘাতক" ইত্যাদি কত গালাগাল দিল। আমাদের মাঝে প্রায়ই কথা কাটাকাটি হত, কিন্তু বড় ভাইএর সাথে আমার খুব ভাব ছিল।

নীরদ : তিনি তখন কি করতেন?

শ্রীঅরবিন্দ : সে ডাক্তারী পড়তে চেষ্টা করে, কিন্তু পারল না। দেশে ফিরে এসে কুচবিহারে একটি চাকরী নেয়। এখন নাকি কল-কাতায় এসেছে। সে হল কাজের লোক, কবিত্বের নামগন্ধ নেই। আমার বাবাব দিকটা পেয়েছে বোধ হয়। কিন্তু চমৎকাব লোক, সকলের সাথে সহজে তার বনিবনা হয়।

মনোমোহন আমায় একবার জিজ্ঞেস করে, "শুনছি তুমি অমুক রাওএর সাথে বছরের পর বছর বাস করছ?"

"কেন? তাতে কি হয়েছে?"

"পারছ কি করে? আমি ত ঝগড়া না করে ছমাসও টিকে থাকতে পারতাম না!"

আজকের বৈঠকে যেমন হাসির রোল উঠেছে তেমন বোধ হয় কোনদিন আর হয়নি। দৃশ্যটি এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে। পণ্ডিচেরী সহরের বিখ্যাত ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানীর ক্ষীণ বৈদ্যুতিক

আভায় ঘরটি ছায়াময়। শ্রীঅরবিন্দ বিছানায় শুয়ে। সময় বোধ হয় বিকাল ৭টা, আমরা তাঁর বিছানার এক পাশে জড়ো হয়ে বসে। তিনি কারও দিকে না তাকিয়ে আস্তে আস্তে মিষ্টি গলায় মিটি মিটি হেসে একটার পর একটা গল্প বলে যাচেছন—পুরোণো স্মৃতি। মনো-মোহনের স্মৃতি-রসে তিনি যেন রসায়িত। তাঁর বাবার কথা যখন বলছেন, বেশ বোঝা যাচেছ বাবার প্রতি তাঁব শ্রদ্ধা, গভীর ভালবাসা। আমরা ত সবাই ভাইদের গল্পে হেসে লুটোপুটি। স্থান কাল পাত্র সবই একাকার। এ হেন মুহূর্তে শ্রীঅরবিন্দ বললেন, "মা আসছেন।" আমরা তৎক্ষণাৎ নিজেদের সংযত কবতে চেষ্টা করলাম কিন্তু হাসি কিছুতেই থামতে চায় না। তা দেখে মা নিজেই হাসতে হাসতে বললেন, "ব্যাপার কি? কি নিয়ে তোমাদের এত হাসির হররা?"

শ্রীঅবরবিন্দ: তেমন কিছু না। আমার কবি-ভাইএর গল্প করছিলাম।

৯-১-৩৯

বিকেলবেলা। ডাক্তার রাও এসেছেন। এসেই জিজ্ঞেস করলেন, কবে শ্রীঅরবিন্দের splint খুলে নেওয়া হবে। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করলেন। (তিনি পূর্বে কথা দিয়েছিলেন যে splint সম্বন্ধে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না।) ভদ্রলোক অতি সরল ও সদাশয়, একটু ভাবপ্রবণ। এতদিন ধরে শ্রীঅরবিন্দকে নাহক্ (তাঁর মতে) splint-এ রাখা হয়েছে, এটা তিনি সহ্য করতে পারছেন না। অথচ তিনিই মাদ্রাজ থেকে

যে Bone specialistকে নিয়ে আসেন, তাঁরই এ ব্যবস্থা। কিন্তু ডাক্তারে ডাক্তারে মতের অমিল ত প্রবাদবাক্য।

এ নিয়ে আমাদের মাঝে কিছুক্ষণ হাসিঠাট্টা চলল। তাঁর প্রস্থানের পর শ্রীঅরবিন্দ বললেন, "একই রকমের লক্ষণ (data) থেকে দুই ডাক্তারের দুই রকম সিদ্ধান্ত।"

সত্যেন্দ্র: ডাক্তারদের সুনাম রাখা দায় হল, তবুও তাদের শরণাপন্ন হতে হয় আমাদের।

শ্রীঅরবিন্দ: গান্ধির মতে ডাক্তার হল শয়তানের পেয়াদা।

নীরদ: বটেই ত! তাঁর appendix কাটল দেবতা!

এখন আলোচনা হল গান্ধিকে নিয়ে, খাদ্য সম্বন্ধে তাঁর নানা পরীক্ষা, তাতে মরণাপন্ন অবস্থা ইত্যাদি।

পুরাণী: আগে তিনি রসুন খেতেন না। যেই ডাঃ আনসারী তাঁকে blood pressure-এর জন্যে রসুন খেতে বললেন এবং তাতে তিনি উপকার পেলেন, তিনি সবাইকে উপদেশ দিলেন, "রসুন খাও।"

শ্রীঅরবিন্দ: ওই গান্ধির স্বভাব। যা কিছু একবার ধরবে, তার শেষ পর্যন্ত না গিয়ে ছাড়বে না। চিরকৌমার্য পেয়ে বসল ত সবাইকে চিরকুমার থাকতে হবে, "তাহলে সৃষ্টি চলবে কি করে?" তাকে জিজ্ঞেস করল কেউ। গান্ধি উত্তর দিলেন, "তাতে তোমার মাথাব্যথা কেন?"

এখন কথা উঠল বিজ্ঞান কৃত্রিম উপায়ে জীব সৃষ্টি করতে পারবে কি না। তার জন্যে প্রথম চাই উপযুক্ত media যার মধ্যে বহুকাল ধরে শুক্রজীবাণু (sperm) জীবিত রাখা যাবে। তখন সৃষ্টিসম্ভাবনার জন্যে দেশকাল কোন বাধা জন্মাতে সক্ষম হবে না।

শ্রীঅরবিন্দ : কি রকম? তোমরা বলতে চাও বর্তমান কালের কোন লোক ইচ্ছে করলে ৫00 বছর পরের স্ত্রীলোকের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করতে পারবে? (হাস্য)

সত্যেন্দ্র : এ প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন আমার মনে জাগছে। অতিমানস যখন নামবে, তখন সন্তান উৎপাদনের স্থান থাকবে কি সে জগতে?

শ্রীঅরবিন্দ : অতিমানস আগে নামুক ত, পরে সে-ই তার বিচার করবে। কিন্তু অতিমানস সৃষ্টিতে উৎপাদন কি থাকতেই হবে? সমস্ত মানবজাতি ত আর অতিমানুষ হচেছ্ না, সুতরাং প্রচুর লোক থাকবে যাদের দ্বারা সৃষ্টিকার্য চলতে পারে।

নীরদ : ইচছ্াশক্তি দিয়ে মানসপুত্র সৃষ্টি সম্ভব নয়?

শ্রীঅরবিন্দ : সবই সম্ভব, উপযুক্ত মালমশলা পেলে।

নীরদ : এ উত্তরটা মহর্ষি-ঘেঁসা হয়ে গেল যেন। যেমন তিনি বলেন, "ভাগবত করুণা সব কিছুই করতে পারে।" (হাস্য)

শ্রীঅরবিন্দ : কিন্তু তত্ত্বহিসাবে সেটা সত্যি।

নীরদ : কথা হল উপযুক্ত মালমশলা জুটবে কি না।

শ্রীঅরবিন্দ : বলা যায় না। মানুষ যদি তার পশুধর্ম ও নিম্ন প্রকৃতি দ্বারা চালিত না হয়ে অন্তরাত্মায় বাস করে এবং তারই শক্তিসমূহ অর্জন করে, তাহলে তোমার প্রশ্নের উত্তরে বলব হাঁ, সম্ভব। এসব বিষয় এখন পর্যন্ত অলৌকিক, ম্যাজিক বা মিষ্টিক পর্যায়ভুক্ত, কারণ মানুষের দৃষ্টি তার বর্তমান পরিস্থিতির দ্বারা সীমাবদ্ধ। অসাধারণ বলে তাদের রহস্যজনক মনে হচেছ্। কিন্তু মানুষ যে রকম প্রাকৃত বিজ্ঞানে এগিয়ে যাচেছ্ এবং প্রকৃতির সকল গোপন রহস্য উদ্ঘাটন করছে, সে রকম অন্তরলোকে প্রবেশ করে যদি প্রকৃতির মধ্যে অতিপ্রাকৃত

শক্তির উৎসেব সন্ধান পায় তাহলে সম্ভাবনার কোন সীমা থাকবে না। Telegraphy, Wireless ইত্যাদির প্রয়োজন উঠে যাবে। তাদের যাবতীয় কলকারখানাও ব্যবহার করতে হবে না, কেননা সূক্ষ্মলোকের মাধ্যমে আমেরিকার কারও সাথে ভাবের আদানপ্রদান চলতে পারবে (telepathise)। মৃত্যুও সাধারণ মানুষের মৃত্যুর মত হবে না। তখন হবে ইচ্ছামৃত্যু।

নীরদ : অতিমানস স্বষ্টিতে নাকি মৃত্যুই হবে না?

শ্রীঅরবিন্দ : Doomsday পর্যন্ত মানুষ বেঁচে থাকবে আর হেঁটে স্বষ্টিকর্তার সামনে গিয়ে উপস্থিত হবে? তবে এমন হতে পারে যে সে মরবেই না যতদিন পর্যন্ত তার জায়গা নেবার উপযুক্ত লোক তৈরী না হচ্ছে।

—অশ্বত্থামা নাকি এখনও জীবিত।

শ্রীঅরবিন্দ : বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে বুঝি?

—পাঁচজন মৃত্যুঞ্জয় নাকি বেঁচে আছে, হনুমান তার মাঝে একজন।

শ্রীঅরবিন্দ : হনুমান হতে পারে, তার যা লেজের বহর! ভীমও ত সে লেজ তুলতে পারেনি।

পুরাণী এখন বলল যে কারও মতে মহাভারত হল রূপককাহিনী। ভীম হল যুদ্ধবিশারদের প্রতীক।

শ্রীঅরবিন্দ : বাজে কথা! বাইরনের সেই ঠাট্টার মত—Beatrice নাকি গাণিতিক সংখ্যা।

পুরাণী : সমালোচকদের মতে এপিক নাকি ক্রমশঃ আন্তর-অনুভূতি জাতীয় (subjective) হবে।

শ্রীঅরবিন্দ : তাই ত মনে হচ্ছে। প্রচলিত ধারণা হল এপিকের

জন্যে গল্প চাই। কিন্তু সে রকম গল্প আর কোথায়? সবই ত শেষ হয়ে গেছে। তাছাড়া এপিককে subjective হতেই হবে, বর্তমান যুগধর্ম তাই চায়।

পুরাণী: কারও মতে Divine Comedyতে গল্প নেই বলে সেটা এপিকবাচ্য নয়।

শ্রীঅরবিন্দ: নিশ্চয়ই এপিক। Paradise Lost-এ কতটুকু গল্প, কতটুকু ঘটনা আছে? সেটা এপিক নয়?

পুরাণী: Keats যদি Hyperion শেষ করতে পারত, তাহলে নাকি Milton-এর সমান স্থান পেত।

শ্রীঅরবিন্দ: Hyperion-এর প্রথম বইটা অপূর্ব সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়টা যদি ততখানি চমৎকার হত তাহলে মিল্টনের সমপর্যায় হত বটে। কিন্তু সেই প্রেরণার উচ্চগ্রাম অক্ষুণ্ন রাখতে পারত কি না আমার সন্দেহ আছে, কারণ আমি লক্ষ্য করেছি দ্বিতীয় ভাগে তার প্রেরণা নেমে গেছে। প্রথমভাগের শেষে যেই মাত্র অন্তর্বিষয়ী (subjective) হতে চেষ্টা করল, সেই উচ্চতা আর রইল না।

পুরাণী: এমনও কেউ কেউ বলছে যে আঙ্গিকটা হবে এপিক ও ড্রামার সমন্বয় অথবা Meredith-এর Odes-এর মত। এসব জল্পনা-কল্পনা থেকে এপিকের আঙ্গিক সম্বন্ধে একটা সূত্র বের হতে পারে।

শ্রীঅরবিন্দ: Victor Hugo ত সে রকম চেষ্টা করেছে। তার Légendes des Siècles চিন্তায়, সুরে, কল্পনায়, দোলায় এপিক বলতে হবে বই কি, ফরাসী ভাষায় একমাত্র এপিক। কিন্তু এখনও তার উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হয়নি। ওতে কোন কাহিনী নেই, আছে নানা ঘটনার সমাবেশ।

পুরাণী : Tagore যে কেন এপিক চেষ্টা করলেন না ?

শ্রীঅরবিন্দ : Tagore ! তার জন্যে এপিক মন চাই ত ! Tagore কতগুলো ভারী সুন্দর আখ্যায়িকামূলক কবিতা লিখেছেন বটে। William Morris-এর কতগুলো কবিতা অতি সুন্দর। তার Volsung Saga ও Earthly Paradise আমি ছেলেবেলায় বহুবার পড়েছি। ওকে ছোট করবার একটা প্রবৃত্তি আছে, মধ্যযুগের Romanticism তার বিষয়বস্তু বলে বোধ হয়।

নীরদ : আপনি সেদিন বললেন Shakespeare আর Milton-এর পরে আর কোন কবি Blank Verse-এ সাফল্য লাভ করেনি। Shelley-র Prometheus-ও নয় ?

শ্রীঅরবিন্দ : সাফল্যলাভ করেনি এমন কথা ত বলিনি। অনেক কবি ভাল Blank verse লিখেছে, যেমন, Byron, Arnold ইত্যাদি। কিন্তু উচচাঙ্গের Blank verse লিখেছে মাত্র তিনজন— Shakespeare, Milton ও Keats.

নীরদ : হারীন ?

শ্রীঅরবিন্দ : হারীন তেমন চমৎকার কিছু লেখেনি।

নীরদ : অমল ?

শ্রীঅরবিন্দ : অমলের মুস্কিল হল তার ভেতর একটা Post-Victorian রেশ রয়েছে। সেটাকে আমায় অনেক ঘা দিয়ে দিয়ে তবে বিদায় করতে হয়েছে। কত যে পেঁচের পর পেঁচ (screw him up) কষতে হয়েছে যাতে ঠিক রূপটি (form) বের হয়। কতবার তার কবিতা ফেরত পাঠিয়েছি নানা সংশোধনের ও পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়ে। এখন বোম্বে গিয়ে সে পুনর্মূষিক হয়েছে, তার পুরাতন Post

Victorian বন্ধু দেখা দিয়েছে। সেদিন একটা কবিতা পাঠিয়েছে, তাতে নমুনা পেলাম।

ভারতীয় কবিদেব—যারা ইংরাজীতে কবিতা লেখে—এই হল দোষ। ভাল কবিত্ব থাকতে পারে কিন্তু নিজস্ব বক্তব্য যেন নাই। যথেষ্ট সাহিত্যচর্চার ফলে বানিয়ে বানিযে কিছু রচনা করেছে, এবকম একটা ধাবণা জন্মায়। ভ'এব কবিতা পড়লাম, একই দোষ। Mrs. Naidu মাঝে মাঝে উৎকৃষ্ট কবিতা লিখেছেন, তাতে ব্যঞ্জনাও আছে কিন্তু পরিসর সামান্য।

হারীন ও অমল এরা ত ছোটকাল থেকে ভাবছে, কথা বলছে ইংরাজীতে। তাদের পক্ষে সহজ হওয়া উচিত। হারীন প্রথম থেকেই নিজের সুর, মৌলিকত্ব পেয়েছে। বিলাতে তার সমাদর না হওয়াব প্রথম কারণ হল সে ভারতীয। যদি সে ছদ্মনামে—ধর John Turner বা অন্য কিছু,—তার কবিতা ছাপাত, তাহলে সুনাম হত। তবুও Binyon-এর মত সমালোচকদের কাছ থেকে সে কম প্রশংসা পায়নি।

দ্বিতীয় কারণ, তার কবিতায় তারাই রস পাবে যারা Victorian যুগের ইংরেজী কবিতার সাথে সংযোগ রেখেছে। আজকাল ত নাকি কবিতা বিলাতে পড়াই হয় না। আমার কবিতা সম্বন্ধেও একই মত পাওয়া গেছে। আমার সাম্প্রতিক কিছু কবিতা এক ইংরাজ প্রকাশকের কাছে পাঠান হয়। সে বলল কবিতাগুলো চমৎকার, তাতে নূতনত্বও রয়েছে কিন্তু তার মতে কবিতার বই ছাপান এখন উচিত হবে না। কারণ কবিতার এখন কোন আদর নেই। যদি আমার কোন গদ্য লেখা থাকে, সেগুলো আগে প্রকাশ করা উচিত,

তারপব হয়ত কবিতার কদর হতে পারে। আজকাল যে কবিতার পাঠক মেলে না, আশ্চর্য নয়। তার জন্যে বোধ হয় হাল আমলের (modernist) কবিরাই দায়ী।

নীবদ : হারীনের কবিতা Masefield-এর কাছে পাঠান হয়েছিল।

শ্রীঅরবিন্দ : Masefield ? কেন ?

নীরদ : Poet Laureate বলে'।

শ্রীঅরবিন্দ : Poet Laureate! সবাই হতে পারে Poet Laureate. Wordsworth আর Tennyson-ই এই পদবীর জন্যে সত্যিকারের যোগ্য কবি ছিল। Masefield হল Georgian, অলঙ্কারের (rhetoric) ছড়াছড়ি।

পুরাণী : Thompson আমায় Eliot পড়তে বলে। সে ত উচ্ছ্বসিত। আমি পড়লাম, কোন পদার্থই পেলাম না। Ezra Pound সম্বন্ধেও একই কথা। অমলের মত জিজ্ঞাসা করলাম।

শ্রীঅরবিন্দ : কি বলল সে ?

পুরাণী : সেও একমত। সে একটা চমৎকার রসিকতা করেছে কিন্তু। বলছে, তার নাম হল পাউণ্ড কিন্তু একটি পেনির মূল্যও তার নেই। (হাস্য)

শ্রীঅরবিন্দ : Eliot হল আধুনিক কবিতার পথিকৃৎ। আমি তার কবিতা বেশি পড়িনি। আধুনিক কবির ((modern poet) সংজ্ঞা কি জান ? আধুনিক কবি হল সে, যার কবিতা সে নিজে বোঝে আর বোঝে তার কতিপয় ভক্ত।

নীরদ : তার Hippopotamus নামে একটি কবিতা আছে, সরস লেখা নাকি।

পুরাণী : জন্তু hippopotamus ?

শ্রীঅরবিন্দ : আমার ত ধারণা সে নিজের সম্বন্ধে লিখেছে। (হাস্য)

নীরদ : বাংলার আধুনিক কবিদের অত্যন্ত প্রিয় কবি।

শ্রীঅরবিন্দ : তা হবে, এখন ফ্যাসান অনুযায়ী চলতে হবে ত।

নীরদ : আপনি Aeniad বলে আব একটি এপিক লিখেছেন ?

শ্রীঅরবিন্দ : Aeniad ? না, Ilion। Hexameter-এ লেখা, Troy-এর পতন সম্বন্ধে।

নীরদ : রাধানন্দের কবিতা সম্বন্ধে আপনার কি মত ? সে নাকি ফরাসীতেও লেখে ?

শ্রীঅরবিন্দ : হ্যাঁ, তার ফরাসী কবিতা বেশ ভাল ; মাও পছন্দ করেন। অবশ্য, তিনি শুদ্ধ করে দেন। কিন্তু কল্পনা ও সৌন্দর্য রয়েছে। বাবাঃ, কী বিস্ময়কর তার লেখনীশক্তি আর কি উদ্দাম বেগ ! ছ'মাসে দুশ'টি বই লিখেছে ! আমার জীবনীও লিখেছে, সেটা ছাপান বন্ধ করবার জন্যে তার সাথে আমায় রীতিমত ধ্বস্তাধ্বস্তি (লেখায়) করতে হয়েছে। তামিলদেশে তার ভয়ানক নাম। তাকে ভারতীর সমান বড় বলে মনে করে। তার গদ্য কিন্তু অলঙ্কারবহুল।

নীরদ : তরু দত্তের নাকি উচচ প্রতিভা ছিল। বেঁচে থাকলে বড় কবি হতে পারতেন।

শ্রীঅরবিন্দ : বিলাতে ত তাকে বড় কবি হিসাবে কেউ জানেই না। একটিমাত্র তেজস্বী কবিতা লিখেছে জার্মানীর ফ্রান্স আক্রমণ বিষয়ে। তার কারণ সে ফরাসীদেশকে গভীরভাবে ভালবাসত বলে। দু'একটা কাটাছাঁটা লাইন আমার মনে আছে :

The head of human column....
Atilla's own exultant hordes

এই দুই লাইন পড়লেই একটা ধাক্কা লাগে, মনে না হয়েই পারে না যে এ হল কবির নিজের কথা, অনুকরণ নয়। এরকম যদি লেখা যায়, তাহলে স্বীকৃতি লাভ করবেই।

নীরদ : মধুসূদন সম্বন্ধে কি বলেন?

শ্রীঅরবিন্দ : মধুসূদনের একটা কবিতা মাত্র মনে আছে, তাও Byron-এর অনুকরণ।

১০।১।৩৯

শ্রীঅরবিন্দ আজ কথা আরম্ভ করলেন 'স'র স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। বল্লেন, তোমার আরও নতুন রোগী জুটেছে না কি?

সত্যেন্দ্র : আজ্ঞে না।

নীরদ : সে কি, তোমার একটি তো বেড়েছে।

সত্যেন্দ্র : এ হল নীরদেরই পাঠানো—আমরা একসঙ্গেই কাজ করি।

শ্রীঅরবিন্দ : সে Axis-এ যোগ দিয়েছে বুঝি?

সত্যেন্দ্র : না, Axis নয়, সে আমার কাছে রোগী পাঠিয়ে দেয়।

শ্রীঅরবিন্দ : ও, তাহলে এটা মিত্রশক্তির সহযোগিতা?

(হাস্য)

সত্যেন্দ্র : আমি রোগীকে পালসেটিলা দিয়েছি। যারা মৃদু ও শান্ত স্বভাবের তাদের এ ঔষধ দেবার বিধান আছে।

শ্রীঅরবিন্দ : সব মেয়েদের প্রকৃতিই ঐরকম নয় কি?

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সম্বন্ধে কথা চলল। এই সময়ে মা এলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন "সুইজারল্যাণ্ডে যে বিখ্যাত হোমিও-প্যাথিক প্রতিষ্ঠান আছে—যারা উচ্চশক্তির ঔষধ তৈরি করে তাদের কথা তোমরা জান কি? সেখানে রোগের সব লক্ষণ উপসর্গগুলি গুছিয়ে নিয়ে উপযুক্ত ঔষধের বিধান দেয়, রোগ নির্ণয় (diagnosis) করে নয়। চিকিৎসার এ পন্থা বেশ সহজ ও সুবিধার। হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান না থাকলেও এভাবে চিকিৎসা করা যায়। আমি নিজেই অনেক রোগীকে আরাম করেছি, তবে সেটা যে কেবল ঔষধের জোরে তা আমি বিশ্বাস করি না। আচ্ছা, লাইসেন্স না নিয়েই কি হোমিও-প্যাথি চিকিৎসা করতে দেওয়া হয়?

নীরদ : হাঁ, ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাংলাদেশে প্রায় ঘরে ঘরেই হোমিওপ্যাথির বাক্স আছে।

মা : কিন্তু 'স' আর 'র' বলেছিল যে এব মধ্যে এমন ঔষধ আছে যার এক ফোঁটা খাওয়ালে একটা হাতী মারা পড়তে পারে। তাহলে এ কি বিপজ্জনক নয়? আমার কিন্তু মনে হয় না যে এসব এত ভয়ানক।

নীরদ : কোন কোন ক্ষেত্রে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। ডাঃ ম-এর তাই হয়েছিল।

মা : ওটা তার মনের অভিভাবনের (suggestion) ফল। সে এমন একটা কিছুর অপেক্ষায় ছিল। মন অথবা আত্ম-অভিভাবনের খেলা এখানে খুব বেশী। হোমিওপ্যাথিতে ফল হয়, তার রাসায়নিক গুণের জন্য যতটা নয় তার বেশি তাতে আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াটা বাড়িয়ে দেয় বলে। (more dynamic than chemical)

তারপর মা জিজ্ঞাসা করলেন, চীনদেশের চিকিৎসাতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি কি না। তারা বলে প্রত্যেক রোগের বিশেষ একটি স্নায়ুকেন্দ্র আছে। যদি কেউ সেটি আবিষ্কার করে' নির্দিষ্ট স্নায়ু বিন্দুটিতে সূচ বা পিন বিঁধিয়ে দিতে পারে, তাহলেই রোগের আরাম হয়। যেমন—পেটে ব্যথা হলে তার প্রাসঙ্গিক যথাযথ কেন্দ্রে সূচ বিঁধিয়ে দেয়; যদি তাতে কোন সাড়া না পায় তবে বুঝতে হবে এ বেদনা পাকস্থলীব নয়; আর এইভাবে যতক্ষণ না ঠিক কেন্দ্রটি খুঁজে পাওয়া যায় ততক্ষণ নানাস্থানে সূচ বিঁধিয়ে চলে। ফ্রান্সে এই পদ্ধতি খুব সাফল্য লাভ করেছিল। একজন ফবাসী ডাক্তার চীনদেশে গিয়ে এই চিকিৎসা শিখে এসেছেন। প্যারিসে তাঁর খুব পশার হয়েছে। অবশ্য চীন দেশের পূর্বকালীন প্রথার কথা ত জান: যতদিন রোগী ভাল থাকত চিকিৎসক ততদিন তাব সম্মানী পেত। রোগী মারা গেলে ডাক্তারের দরজার সামনে কিছু কাঠকয়লা বা অমনি কোন জিনিষ রেখে তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হত যে রোগী আর ইহজগতে নেই।

শ্রীঅরবিন্দ পুরাণীকে জিজ্ঞাসা করলেন ভারতবর্ষে য়ুনানী চিকিৎসা কোথাও প্রচলিত আছে কি না। বাদশাহী আমলের হাকিমদের বংশধর আজমল খাঁর কথা উল্লেখ করে পুরাণী বললে এই চিকিৎসা-পদ্ধতি গ্রীকদের কাছ থেকে নেওয়া; তারা জান্তব পদার্থও ব্যবহার করে।

মা এই সময়ে চলে গেলেন।

শ্রীঅরবিন্দ: বরোদায় একবার আমার হাঁটুতে একটা বিশ্রী জাতের ফোঁড়া হয়। কোন চিকিৎসায় সুফল হল না। তখন এম, আর, যাদব এক মুসলমানকে নিয়ে এল। সে হাঁটুর একটা বিশেষ যায়গায় সূচ বিঁধিয়ে দিল—বড় এক ফোঁটা কালো রক্ত বেরিয়ে এল। তারপর

ফোঁড়াটা অল্পদিনেই সেরে গেল। ঠিক কোথায় সূচ বিঁধতে হবে সে অবশ্যই তা জানত। মনে পড়ছে, যতীন বানার্জি কোন এক সন্ন্যাসীদত্ত ঔষধে বন্ধ্যাত্ব সারাত। দশ বারো বৎসরের বন্ধ্যাত্ব দূর হয়ে দশমাসের মধ্যেই অনেকের সন্তান লাভ হয়েছে। কতকগুলি বিশেষ নিয়ম অবশ্যই ছিল—ঔষধ গ্রহণের পূর্বে স্ত্রীলোকটিকে স্নান করতে হত, চুল খুলে রাখতে হত ইত্যাদি। ভারতে এই রকম অনেক তথ্য জানা ছিল যা এখন নষ্ট হয়ে গেছে।

সত্যেন্দ্র: ঔষধে রোগ নিরাময় করা যায় তা আমার মনে হয় না। আমার বিশ্বাস একমাত্র যোগশক্তিতেই অসুখ সারে।

নীরদ: তা ঠিক, কিন্তু সেখানেও কতকগুলি বিশেষ নিয়ম আছে। (হাস্য)

শ্রীঅরবিন্দ: ও ভাবে যে যোগশক্তি শুধু বলবে সব রোগ সেরে যাক কিম্বা সব রোগের অবসান হোক আর অমনি তাই হবে।

সত্যেন্দ্র: না, ঠিক তা নয়। কিন্তু তেমন দৃষ্টান্তও তো আমরা দেখেছি।

শ্রীঅরবিন্দ: সে আলাদা কথা। তা না হলে সকালে উঠেই যোগীর বলা উচিত জগতের সকলে সুস্থ হোক। তা হলেই পৃথিবীতে আর রোগের অস্তিত্ব থাকবে না।

খ্রীষ্টের এই ধরনের কত অলৌকিক চিকিৎসার কথা আছে,—যেমন তিনি অন্ধের চোখে মুখামৃত দিয়ে তার দৃষ্টিশক্তি এনে দিয়েছেন।

চম্পকলাল: সত্যেনের গুরুও একজন কুষ্ঠরোগীকে সারিয়ে ছিলেন। সে পরে চিত্রকর হয়েছিল।

শ্রীঅরবিন্দ: মাছের সংখ্যাবৃদ্ধি, Holy Ghostএর অবতরণ,

শিষ্যদের নানা ভাষায় আলাপ ইত্যাদি আরও বহু দৃষ্টান্ত আছে। তার তাৎপর্য আমি জানি না।

সত্যেন্দ্র: ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বর আর Holy Ghost এই সব কথার অর্থ কি?

শ্রীঅরবিন্দ: ঈশ্বরের পুত্র ব্যষ্টি-ভগবান, মানুষের মধ্যে ভগবান। তারা বলে মানবীয় যিশু। ঈশ্বর, পরম পিতা—ভগবান, বিশ্বেশ্বর; Holy Ghost বিশ্বাত্মা, নির্গুণ। কিন্তু তারা যখন বলে খ্রীষ্ট বা পরম-পিতার বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করলে তাব মার্জনা আছে কিন্তু Holy Ghost-এর বিরুদ্ধে অপরাধের ক্ষমা নেই তার অর্থ আমি বুঝিনা। সম্ভবতঃ উদ্দেশ্য এই যে যদি তুমি আত্মার বিনাশ কর তা হলে পুনরুদ্ধারের উপায় থাকবে না।

বেচারলাল: আত্মার বিনাশ কি সম্ভব?

শ্রীঅরবিন্দ: হাঁ, যদি তুমি তোমার অন্তর্যামী ভাগবত স্বরূপের বিরোধিতা করে চৈত্যপুরুষকে তোমার সত্তা হতে দূরে সরিয়ে দাও তবে প্রকৃতি তার দিব্য আশ্রয় হারায়।

অতঃপর ডাঃ বেচারলাল এবং অন্য দুই একজন ব্রহ্মানন্দ কি ভাবে অল্প পরিমাণ আহার্যে বহুলোককে পরিতৃপ্ত করেছিলেন সেই অদ্ভুত কাহিনী উল্লেখ করল। ঘিএর অভাব হলে তিনি নর্মদার জল তুলে তার দ্বারা খাদ্য প্রস্তুত করে দিতেন—ভোজন-ক্রিয়া শেষ হয়ে গেলে পরে আবার নর্মদায় সমপরিমাণ ঘি ঢেলে দিতেন।

নীরদ: এরকম ব্যাপার কি সম্ভবপর?

শ্রীঅরবিন্দ: কেন, এসব তো ঘটেছে। ব্রহ্মানন্দ ভেলকি দেখিয়েছেন একথা তো বলতে পার না।

বেচারলাল : না, না এ ঘটনা তো যাদুবিদ্যা নয়।

শ্রীঅরবিন্দ : যাদু আলাদা জিনিষ। সে ক্ষেত্রে কোন একটি মাধ্যমের দরকার যে দূরের জিনিষ আনবে ও নিয়ে যাবে যেমন দেখা গিয়েছিল গেষ্ট হাউসে পাথর ছোঁড়ার ঘটনায়। শুনেছিলাম এক যোগী ঘরের এক কোণে পা রেখে অন্য কোণে হাত রাখত—সম্ভবতঃ তাদের বিশ্রাম দেবার অভিপ্রায়ে— (হাস্য)

পুরাণী : পুনরাবৃত্তি বন্ধ হওয়া ছাড়া এমন কোন লক্ষণ বা পরীক্ষা আছে কি—অবশ্য বাহ্যতঃ নয—যা দ্বারা বোঝা যাবে অবচেতন হতে কোন একটা অবাঞ্ছনীয় উপাদান দূর হয়েছে ?

শ্রীঅরবিন্দ : না, আব কোন পরীক্ষা নেই। কেবলমাত্র তোমারই বোধে জাগবে যে সেটি দূব হয়েছে। তারপবে, পুবাতন অভ্যাসের মত সেটি আবার উঠতে পাবে। মন প্রাণ থেকে সরে গেলেও এ বস্তু আবার ফিবে আসে। এসব ক্ষেত্রে তা আসে—আমি যাকে বলি পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি, সেখান থেকে ; অভিভাবনের মত (suggestion) অথবা ব্যথাব মত (যদি শারীরিক হয়) অথবা ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তির মত এসে এক প্রান্ত দিয়ে প্রবেশ করে অন্য প্রান্ত দিযে চলে যায়। সেই যৌন প্রবৃত্তির মধ্যে ভালবাসার কোন প্রশ্ন ওঠে না—একান্ত দৈহিক কামনা। এ ভাব যখন অন্তবে প্রবেশ করতে চায় তাতে সম্মতি দিলে গোলমালের সৃষ্টি করে। কিন্তু সাড়া পেয়েই যদি সবলে ছুঁড়ে ফেলতে পার—অযথা চিন্তার মত—তা হলে দেখবে সে বিশ্ব পরিমণ্ডলে বিলীয়মান হয়ে যাচেছ। ব্যথাকেও প্রকৃতপক্ষে এইভাবে সরে যেতে দেখা যায়।

পুরাণী : এসব বিষয়ে সচেতন হওয়া কি খুব কঠিন ?

শ্রীঅরবিন্দ : কোন কোন ক্ষেত্রে খুব সোজা। ন ছিল খুবই সচেতন। তার স্নায়ুতন্ত্রী যেন টেনে বাঁধা থাকত ; যারা অতিমাত্রায় স্পর্শালু অর্থাৎ যাদের ধাতের গঠন এই রকম তাদের পক্ষে এটা খুব সহজ—যাদের স্বাভাবিক সূক্ষ্ম দর্শনের ক্ষমতা থাকে তাদেরই মত। কিন্তু যাদের দেহস্তর স্থূল, যারা খাওয়া দাওয়া ভালবাসে, বাস্তব কাজে সুপটু যারা, তাদের সচেতন হওয়া শক্ত ও সময়সাপেক্ষ! মন যাদের কর্মব্যস্ত, যারা বুদ্ধিজীবী তাদের পক্ষেও তেমনি আয়াসসাধ্য। অন্যদিকে কারও যদি ব্যবহারিক বুদ্ধির স্থানে সূক্ষ্ম বুদ্ধি থাকে তবে চেতনার জাগরণের পক্ষে বিশেষ সাহায্য হতে পারে। যেমন **A. E.** মনস্বী ছিলেন, অনেক বিষয়ে তাঁর দক্ষতা ছিল কিন্তু সেই সঙ্গে ছিল আশ্চর্য সূক্ষ্মদর্শনেব শক্তি। এককালে আমি মনকে নিয়ে অনেক দুর্ভোগ ভুগেছি, বিশেষ করে সূক্ষ্মদর্শনের ব্যাপারে। এ শক্তি আসতে পারে যদি মানুষ অন্তর্মুখী হয়।

এসব ব্যাপার যেমন উপলব্ধিতে জাগে তেমন সুক্ষ্মভাবে দেখতেও পাওয়া যায়। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে যে প্রতীক প্রতিভাত হয় তাকে যথা-যথরূপে জীবনে নাগিয়ে আনা সব সময় সম্ভবপর হয় না ; কারণ মানুষ সূক্ষ্মদর্শন নিয়েই এতখানি মশ্‌গুল থাকে যে সেটি অনুভূতিতে জাগিয়ে চেতনার অঙ্গীভূত করা কঠিন হয়ে ওঠে। কখনও কখনও বছরের পর বছর ধরে এ শক্তি সুপ্ত থাকে। মন যাদের জোরালো তারা সূক্ষ্ম-দর্শনের একটা রূপ মন দিয়ে গড়ে তোলে ; তাই প্রকৃত রূপটি সেখানে ধরা দেয় না। দেখতে না পারলেও মানুষ এই সব শক্তি আর এই সব সত্তার বিষয় অনুভব করতে পারে—আর অনুভূতিই উপলব্ধির পথে নিয়ে চলে।

সূক্ষ্মদর্শনে এমন সব সঙ্কেত জেগে ওঠে যেগুলো বেদের মত সুপ্রাচীন।

পুরাণী : ক্রুশের প্রতীকও তো অর্থপূর্ণ।

শ্রীঅরবিন্দ : হঁা, সে তো সবাই জানে। ওটা হল ব্যষ্টি, বিশ্ব ও বিশ্বাতীতের মিলনবিন্দু। জানা না থাকলেও এই সব প্রতীক দেখা যায়। আরও কতকগুলি প্রতীক আছে যাদের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট নয় কিন্তু অন্তরে উন্নতির ও প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে তারা আসে। যেমন আমি শুনতাম ঝিল্লীরব, ঘণ্টাধ্বনি। সে শব্দ এত তীব্র যে মনে হত বাইরে যেন অনেক ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে।

স্বস্তিকও এমনি একটি প্রতীক; এখন হিটলার সেটি অধিকার করে বসেছে। পূর্বে এটি ছিল চেতনার চিহ্ন, এখন হয়েছে বিপদ-সূচক সঙ্কেত। (পুরাণীর প্রতি) তুমি কি হিটলারের বিষয়ে **Jean Herbert**-এর মত শুনেছ?

পুরাণী : না।

শ্রীঅরবিন্দ : কে যেন তাকে বলেছে, মা'র ধারণা হিটলার দানবী শক্তির দ্বারা আবিষ্ট। তাতে সে বড় বিচলিত হয়ে উত্তর করেছে, মা কখনো এমন কথা বলতে পারেন না। অবশ্য মা শুধু বলেছিলেন 'আবিষ্ট'।

পুরাণী : সেই রুশ লোকটির মতে হিটলার মহৎ ব্যক্তি; তার উপর তার অগাধ শ্রদ্ধা; সে বলে সংস্কৃতি হিসাবে জার্মাণ জাতি হল শ্রেষ্ঠ।

শ্রীঅরবিন্দ : কোন সংস্কৃতি? আমার বরং মনে হয় হিটলারের পূর্ববর্তীকালেই জার্মাণজাতি অনেক বেশী মার্জিত ছিল। কাইসারের

সঙ্গে সেই কাল্পনিক কথোপকথনে এই বৈপরীত্য পরিষ্কার ধরা দিয়েছে।

পুরাণী : হাঁ, তিনি বলেছিলেন এরা গুণ্ডার দল—ঈশ্বর পরিত্যক্ত ঐতিহ্য ও আভিজাত্যবিহীন সব ইতরের দল ! প্রাকৃতজনাঃ।

শ্রীঅরবিন্দ : সেই হল অসুবিধা। যখন হিটলার আর মুসোলিনী চলে যাবে তখন তারা ঐতিহ্যের কোন ধারা রেখে যাবে না। হিটলার, গোয়েবিং-এর কোন বংশ পরিচয় নেই। অথচ প্রাচীনকালে বংশানুক্রম ছিল। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও দেখা গেছে গুরুশিষ্য পরম্পরায় সে ধারা প্রবহমান।

হঠাৎ আলোচনায় পরিবর্তন দেখা দিল। কে যেন রামতীর্থের প্রসঙ্গ তুলল। ইনি নাকি সভাস্থলে এমনভাবে ওঙ্কার নাদ তুলতেন যে উপস্থিত সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেত। কিন্তু কয়েকমাস সমতল ভূমিতে এই ক্রিয়া সাধন করবার পর তিনি পাহাড়ে চলে যেতেন ; বলতেন, তাঁর চেতনা নেমে যাচ্ছে, জনসাধারণে তাঁকে জীবনের কর্মের মধ্যে আকর্ষণ করে নিয়ে যাচ্ছে।

শ্রীঅরবিন্দ : তা শুনে আমার একটুও আশ্চর্য বোধ হচ্ছে না, কারণ যোগীকে উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তর থেকে নামিয়ে আনা সম্ভবপর। কিন্তু এতে প্রমাণ হয় যে রামতীর্থের সিদ্ধি মানস সত্তাতে সীমাবদ্ধ।

সত্যেন্দ্র : না, স্যার—তিনি ভক্তও।

পুরাণী : তাঁর মধ্যে দুটি সূত্রই আছে—বুদ্ধিপ্রবণতা আর ভাবাবেগ।

শ্রীঅরবিন্দ : তাহলে বলতে হবে ব্রাহ্মী চেতনার অনুভূতি হয়েছে মানস ও ভাবময় স্তরে—প্রাণ ও শরীরের স্তরে নেমে আসেনি।

এই অবস্থায় প্রাণবেগ সক্রিয় হয়ে উঠলে মানুষ পূর্বের অভিজ্ঞতা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু তা যে হবেই এমন কথা বলা চলে না। নির্বাণের উপলব্ধিতে যে পরম শান্তি আমি পেয়েছিলাম তা আর কখনই হারায়নি। সভায় জনতার মধ্যেও সে শান্তি অটুট ছিল। তাকে বজায় রাখবার জন্য কোন প্রয়াস করতে হয়নি। এমন কি এখানেও যখন আমি বিবাহাদি উৎসবে যোগ দিয়েছি, সাধারণ মানুষের সঙ্গ অস্বস্তিকর ও ক্লান্তিজনক হলেও সঙ্গে সঙ্গে সেই চেতনা ও শান্তি সবার উপরে, সব ছেয়ে বিরাজিত থাকত।

নীরদ : এতে কি বোঝা যায় যে বামতীর্থের ক্ষেত্রে প্রাণ ও শরীরের স্তরে এই অভিজ্ঞতা বিকশিত করবার চেষ্টা হয়নি?

শ্রীঅরবিন্দ : নিশ্চয়ই। সাধারণতঃ এসব অভিজ্ঞতা হয় মানস ও ভাবাবেগের স্তরে, প্রাণের স্তরে পৌঁছায় খুব কম আর শরীরের স্তরে প্রায় ঘটে না বলা চলে।

নীরদ : তফাতটা কোথায়, সিদ্ধির প্রকৃতিতে না ব্যাপ্তিতে?

শ্রীঅরবিন্দ : সিদ্ধির প্রসারে। উপনিষদের কাল থেকেই এই বিভেদ আরম্ভ হয়েছে।

সত্যেন : বৈদিক ঋষিদের?

শ্রীঅরবিন্দ : তাঁরা জীবনকে স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু অন্যান্য পন্থা জীবন ও ব্রাহ্মী চেতনার মধ্যে একটা তীব্র বিভেদ সৃষ্টি করেছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে এই তফাত আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত শঙ্কর তাদের একেবারে দ্বিধাবিভক্ত করে দিলেন।

সত্যেন : জীবনের ক্ষেত্রে এই বিজয়ের প্রয়োজনীয়তা কি?

শ্রীঅরবিন্দ : যদি তুমি মনে কর যে জীবনে ভগবানের অভিপ্রায়

বলে কিছু নেই, তা হলে লয়প্রাপ্তি ছাড়া আর কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না। সংসারজীবন ত্যা।। করা অতি সঙ্গত কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ব্রহ্মলাভেব পক্ষে প্রাণ ও শবীন উভযই জঞ্জাল মনে হয়। যারা সংসার বর্জন কবতে চেয়েছে তারা "জীবন কেন" তার কোন সদুত্তর দিতে পারেনি। কোথাও তাবা বলেছে জীবন মায়াময়—এতে যথার্থ ব্যাখ্যা কিছু হয় না—আবার কখনও বলেছে এ হল ভগবানের লীলা অর্থাৎ তিনি খেয়াল খুশি মত খেলা করছেন, কাজেই তার মধ্যে কোন অভি-প্রায় আশা করা যায় না। কিন্তু আমার ধাবণা, সৃষ্টি যখন করেছেন তখন ভগবানের একটা কিছু উদ্দেশ্য নিশ্চয় আছে।

নীরদ: উদ্দেশ্য কি?

সত্যেন: সম্ভবতঃ ভগবানেব ক্রমবর্ধমান অভিব্যক্তি। কিন্তু যাকে আপনি অতিমানস বলেছেন তা কি আপনার নিজস্ব ধারণা অর্থাৎ চিন্তাদ্বারা আবিষ্কার করা, না উর্ধ্বলোক থেকে পাওয়া?

শ্রীঅরবিন্দ: না, না আমার চিন্তা বা ধারণা নয়। তোমাদের তো বলেইছি নির্বাণের উপলব্ধি হবার পর আর আমার নিজস্ব চিন্তা বলে কিছু নেই। চিন্তা আসে বাইরের পরিবেশ থেকে। প্রথম থেকেই নির্বাণকে আমি শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক সিদ্ধি বলে মনে করিনি। আমার মধ্যে একটা কিছু সর্বদাই এগিযে চলতে চেয়েছে। কিন্তু তখনও আমি এই নূতন অভিজ্ঞতা চাইনি। প্রকৃতপক্ষে নির্বাণের শান্তি পেলে মানুষ আর কিছু চায় না। কিন্তু অতিমানসের অস্তিত্ববোধ যেন আমার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হল। আরম্ভে অতিমানস সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই ছিল না, আর অনেক দিন পর্যন্ত তার স্বরূপ আমার কাছে স্পষ্টভাবে ধরা দেয়নি। বিবেকানন্দের আত্মা থেকেই পেলাম

প্রথম অতিমানসের সন্ধান। আর পেলাম ঋতচেতনা কিভাবে সর্বত্র কাজ করে তার ইঙ্গিত।

নীরদ : তিনি কি অতিমানসের কথা জানতেন?

শ্রীঅরবিন্দ : অতিমানস আখ্যাটি আমার দেওয়া ; এ শব্দ ব্যবহার বিবেকানন্দ করেননি। তিনি শুধু বললেন "ওটা এই" "এটি এইরকম" এই পর্যন্ত। জেলে পনের দিন ধরে তিনি আমাকে দেখা দিয়েছেন। আর যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি সম্পূর্ণভাবে তাঁর শিক্ষা অনুধাবন করতে পেরেছি ততক্ষণ আমায় ছাড়েননি। ঊর্ধ্বচেতনার ক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান আমার অন্তরে বদ্ধমূল করে দিতে চেষ্টা করেছেন এবং সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে না পারা পর্যন্ত তিনি আমায় ছাড়েননি। সেখান থেকে ইঙ্গিত পেলাম অতিমানসের।

নীরদ : গুরুরা কি এইভাবে এসে শিক্ষা দেন?

শ্রীঅরবিন্দ : কেন দেবেন না? প্রাচীন কাল থেকেই তো এ অভিজ্ঞতার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। অনেক গুরুই দেহরক্ষার পর দীক্ষা দিয়েছেন।

নীরদ : আপনার জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের যে প্রভাবের কথা বলেছেন, সে কি এই?

শ্রীঅরবিন্দ : না, বিলাত থেকে ফিরে যখন বরোদায় ছিলাম তখন তাঁদের বই পড়ি ; সেই প্রভাবের কথাই উল্লেখ করেছি। সমগ্র ভারতেই তাঁদের প্রভাব সক্রিয় ছিল। হঠযোগ অভ্যাস করবার সময়ে আমি আর একবার বিবেকানন্দের উপস্থিতি অনুভব করেছিলাম। মনে হল তিনি পিছনে দাঁড়িয়ে আমার উপর নজর রাখছেন। পরবর্তী কালে এঘটনা আমার মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

শব্দ সম্বন্ধে আর একটি অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ছে। যখন আনি বেসান্ট আমাকে দেখা করতে ডেকেছিলেন তখনকার কথা। যেন সর্বক্ষণ আমার কাণে বাজছিল বজ্রধ্বনি। আমার ধারণা তাঁর ইচ্ছা ছিল আমার উপরে প্রভাব বিস্তার করবেন আর আমার সত্তা তীব্রভাবে তাকে প্রত্যাখ্যান করছিল।

তারপর হরনাথের কথা উঠল। অনেকে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে দেখেছে, তাঁর অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ ও দীক্ষাদানের কথা শুনেছে। কে একজন মাদ্রাজেও তাঁকে দেখতে পেয়েছে।

নীরদ: এরা কি তাঁর সূক্ষ্মশরীর দেখে, না তিনি স্থূল শরীর নিয়ে দেখা দেন?

শ্রীঅরবিন্দ: অভিজ্ঞতা আছে দুরকমের। কারও খোলা চোখে সূক্ষ্মদর্শন হয়, আবার কেউ বা দেখে চোখ বুজে। যাদের চোখ খোলা থাকে তারা সহজেই সব বাস্তব বলে ভুল করে, আর সূক্ষ্ম হলেও সব কিছুর স্থূল শারীরিক উপস্থিতি বলেই তাদের ধারণা হয়।

নীরদ: কিন্তু বাস্তব রূপ ধারণ কি সম্ভব?

শ্রীঅরবিন্দ: বাস্তব রূপায়ণের একটা ঘটনার কথা বলি। ইংলণ্ডের বর্তমান রাণীর মা কিম্বা দিদিমার কাহিনী। লেডি ষ্ট্রাথমোর বা এমনি কিছু নাম তাঁর। তাঁরা স্বামী-স্ত্রীতে সর্বদা ধর্মালোচনা করতেন; পরলোকের সত্যাসত্য বিষয়ে কথা হত। উভয়ের মধ্যে চুক্তি হল যিনি আগে দেহত্যাগ করবেন পরজীবনের অস্তিত্ব কিছু থাকলে তিনি এসে অপরকে তা জানিয়ে যাবেন। আগে স্বামীর মৃত্যু হল। কয়েক বৎসর পরে তিনি এসে তাঁদের ধর্মে সারমর্ম কি সে বিষয়ে কথা আরম্ভ করলেন। স্ত্রী বললেন "তুমি যে স্থূলশরীর নিয়ে

এসেছ তাব কোন প্রমাণ দিতে পাব ? এমন কিছু, যা সর্বদা আমাব সঙ্গে থাকবে।" স্বামী উত্তব ববলেন নিশ্চয"। স্ত্রীব হাতটি ধবে তিনি এমন জোবে চাপ দিলেন যে হাতে তীব্র জ্বালা বোধ হল আব সেখানে একটা দাগ বসে গেল। লোকেব দৃষ্টিতে যাতে সেটি ধবা না পড়ে তাব জন্য সর্বদাই মহিলাটি সে জাযগা ঢেকে বাখতেন। এ ক্ষেত্রে বাস্তব রূপাযণ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকে না। *

১২।১।৩৯

আজ মা কি একটা বই হাতে নিযে ঘবে ঢুকলেন। বইট মা বললেন, আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে, ফবাসীভাষায লেখা। মা কিছু কিছু অংশ পড়তে পড়তে যেখানে শ্রীঅববিন্দেব উল্লেখ আছে সেখানে পড়লেন, "শ্রীঅববিন্দ হলেন একজন যোগী। তিনি ববীন্দ্রনাথ, বামকৃষ্ণ, ইত্যাদিব মত গান্ধিব সাথে মানবজাতিব হিতার্থে নিযুক্ত বযেছেন।"

শ্রীঅববিন্দ গান্ধিব সাথে ?

মা হাঁ। কিন্তু ববীন্দ্রনাথ কেন ? যাকগে, আমি বইটি দেখতে চাইনি। প'কে বললাম, যা খুশি তোমাব তাই কব। কিন্তু সে বইটি খুলে দেখল, বইটা তোমায উপহাব দেওযা হযেছে।

শ্রীঅববিন্দ : আমায ?

মা তাই। কি কবব তাহলে ?

শ্রীঅববিন্দ যা খুসী।

* এই আলাপটি ইলাদেবী অনুবাদ করেছেন।

মা : কিন্তু বইটি যে তোমায় উপহার দেওয়া হয়েছে !

শ্রীঅরবিন্দ : রেখে দাও কোথাও ! (মা আলমারীতে রাখলেন)

আমি এখন একটা গল্প বললাম, গল্প নয় যদিও। সত্য ঘটনা। নায়িকা কলকাতার বিখ্যাত বংশের, আন্দাজ ১০।১২ বছরের শিশু। তার বাবা মার সাথে দু একবার আশ্রমে যাতায়াত করেছে। ব্যাপারটা এরকম : একদিন বিকেলে তাদের মনোরম বাড়ীতে চা'এর আসর বসেছে, গণ্যমান্য অতিথিবর্গ চা পান করছেন। দু'একটা মামুলি বিষয়ের পর আশ্রম সম্বন্ধে কথা উঠল। মা ও শ্রীঅরবিন্দ ও আশ্রম সম্বন্ধে নানা মন্তব্য, টিপ্পনীতে আসর সরগরম, মেয়েটি চুপ করে সব শুনে যাচ্ছে। এক ভদ্রলোক আবার যখন আতিথ্যের সীমা লঙ্ঘন করছেন, মেয়েটি দৃঢ়ভাবে বলল, "দেখুন, আমার গুরুর সম্বন্ধে আর একটি কথা বলেছেন ত এমন চড় মারব আপনাকে যে একেবারে মাটিতে গড়াতে হবে।" সবাই থ ! মেয়ের মা রাগে ও ক্ষোভে আসর ছেড়ে উঠে গেল, এক দূরাত্মীয় ছাদের দিকে তাকাতে লাগল ইত্যাদি ইত্যাদি।

গল্পটা শুনতে শুনতে সকলের হাসি যেন ফেটে পড়তে লাগল, মা ও শ্রীঅরবিন্দও খুসী। কিছুক্ষণ পরে মা চলে গেলেন। তখন শ্রীঅরবিন্দ বললেন, "তার বয়সের পক্ষে এই ব্যবহার অসাধারণ বলতে হবে। যেমনি তার চরিত্রবল, তেমনি বেড়েছে বুদ্ধি ; দুটিই তার বয়সের অতীত। আমাদের কাছে যখন সে চিঠি লিখত, সংসার ও মানুষ সম্বন্ধে এমন সব মন্তব্য করত, যা পঞ্চাশ বছরের স্ত্রীলোকের পক্ষে সম্ভব নয়।"

আমি তার অনাসক্তি সম্বন্ধে দু একটা ছোট গল্প বললাম। একটি হল তার নাচের শিক্ষক সম্বন্ধে। লোকটির চরিত্র ভাল নয় বলে তার

অভিভাবক লোকটিকে বিদায় দিতে চায় কিন্তু মেয়েটি কিছুতেই রাজী নয়। তার যুক্তি চরিত্রের সাথে শিক্ষকতার কি সম্বন্ধ যতক্ষণ তার ব্যবহারে কোন দোষ না থাকে ইত্যাদি। কিন্তু অভিভাবকের সাথে সে পেরে উঠবে কেন? কিন্তু যার জন্যে সে এতখানি লড়ল, তার বিদায়ে কোন তারতম্য হলনা মেয়েটির ব্যবহারে। দ্বিতীয় ঘটনা, মেয়েটির অতি প্রিয় কুকুরটি যখন মারা যায়, তাতেও সে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি। এই নির্লিপ্ত ভাব দেখে মেয়ের মা ভাবল যে মাকেও সে ভালবাসে না। মেয়েটি হয়ত তাকেও ছেড়ে চলে যাবে একদিন। কিন্তু সে নাকি ওখানে খুব সুখী?

শ্রীঅরবিন্দ: কে বললে? সে ত আমাদের লিখেছে সে ভয়ানক অসুখী।

আরও নানা কথার পর রাশিয়ায় ষ্টালিনের বিচার সম্বন্ধে আলোচনা সুরু হল।

শ্রীঅরবিন্দ: ষ্টালিন চায় একটিমাত্র জিনিষ, ক্ষমতা। আর কিছু নয়।

পুরাণী: টট্স্কির বিরুদ্ধে ষ্টালিনের অভিযোগ কি সত্যি?

শ্রীঅরবিন্দ: ওগুলো বিশ্বাসযোগ্য নয়। খুব সম্ভব টট্স্কি ও তার সাঙ্গোপাঙ্গেরা ষ্টালিনকে সরাতে চায় কিন্তু ঠিক কায়দা না জানায় উল্টে তারাই পড়ল ষ্টালিনের ফাঁদে। লেনিনের সমস্ত সহকর্মীদের সে শেষ করেছে। Litvinoff পালিয়ে বেঁচেছে; তার স্ত্রীর কি গতি হল জানি না। সে ছিল প্রবল ষ্টালিন বিদ্বেষী। ষ্টালিনের পার্লামেণ্ট শুধু কথা বলার যন্ত্র। সে ও তার পার্টি যা স্থির করে, তাই হল হুকুম ও আইন।

পুরাণী : জেনারেলদের দোষস্বীকারোক্তিগুলি খুব ড্রামাটিক যেন।

শ্রীঅরবিন্দ : হবেই ত! তাদের আত্মীযদের বাচাতে হবে ত?

নীরদ : ট্রট্স্কি কি ষ্টালিনের চেয়ে ভাল লোক?

শ্রীঅরবিন্দ : বলতে পার ট্রট্স্কি আদর্শবাদী।

এখন এল জাপানের কথা। পুরাণী বলল যে জাপানের সমস্ত মন্ত্রীদল পদত্যাগ করছে। কোন এক জেনারেল বলেছে যে ১00 বছর ধরে যুদ্ধ চালাতে হবে।

শ্রীঅরবিন্দ : হাঁ, হাঁ। মনে পড়ছে বটে! তারা পৃথিবীকে সভ্য করবার ভার নিয়েছে এবং তাব জন্যে প্রথম প্রয়োজন এশিয়া থেকে সমস্ত সাদা আদমীদের তাড়িয়ে দেওয়া। এ অভিপ্রায় তাদের আজকের নয়, বহু পুরনো। কিন্তু এরকম গলাবাজি ত তাদের ধর্ম নয়। তারা নীরবে কাজ করতে অভ্যস্ত; যখন সব কিছু পাকা তৈরী তখন তারা কাজে নামে। এধরনের আস্ফালন একেবারে অ-জাপানী।

সত্যেন্দ্র : ভারতবর্ষের স্বাধীন হতে বেশ সময় নেবে মনে হচ্ছে।

শ্রীঅরবিন্দ : কেন? আমার ত মনে হচ্ছে উল্টো। শুধু তাই নয়, স্বাধীনতা লাভের জন্যে হয়ত যুদ্ধই করতে হবে না, বিনা যুদ্ধে স্বাধীন হবে।

নীরদ : কি করে?

শ্রীঅরবিন্দ : সন্ন্যাসীদের মাঝে এ ধরনের একটা ভবিষ্যদ্বাণী প্রচলিত আছে।

নীরদ : লেলেও এরকম একটা কিছু বলেছিলেন বটে।

শ্রীঅরবিন্দ : যুদ্ধ করতে হলে কোন আশা নেই। কিন্তু ধর ইটালি যদি ইংরাজ fleet ধ্বংস করতে পারে—যদিও তার কোন সম্ভাবনাই নেই—তাহলে ইংলণ্ডকে ভারতবর্ষ ছাড়তেই হবে।

নীরদ : তখন ইটালি বা জাপান ঢুকবে?

শ্রীঅরবিন্দ : এত সোজা নয়। তারা বহু দূরে। তাছাড়া শুধু Navy দিয়ে দেশ জয় করা যায় না। তার সাহায্যের জন্যে চাই পদাতিক সৈন্য। ভারতবর্ষের সৈন্য থাকলে তাকে কেউ জয় করতে পারবে না সহজে। মা একবার তাঁর কোন জাপানী বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেন, ভারতবর্ষের সাথে কারও যুদ্ধ লাগলে জাপানের Navy ভারতবর্ষকে সাহায্য করবে কি না। তিনি বললেন, "সাবধান, জাপানকে বিশ্বাস করোনা, একবার ঢুকলে তাকে নড়ানো শক্ত হবে।"

নীরদ : আমাদের ত কোন Navy নেই।

শ্রীঅরবিন্দ : সেটা পরে সময়ে তৈরী হবে।

পুরাণী : কংগ্রেস মন্ত্রীরা অহিংসা নীতি কোথাও মানছে না, আর ইউ, পি : সি, পি, বম্বে মাদ্রাজ সর্বত্র বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার প্রচলন করছে। Sir Sikandar আবার দেশে দুটো ভাগ সৃষ্টি করতে চায়, পাঞ্জাবের সামরিক জাত (Martial race) এবং অন্যান্য দেশের অসামরিক জাত।

শ্রীঅরবিন্দ : সেটা ত ইংরাজই করেছে দেশকে তার অধীনে রাখার জন্যে। সে উদ্দেশ্যে পাঞ্জাবী, পাঠান ও গুর্খাদের ঢুকালো সৈন্যবিভাগে, দিল সামরিক শিরোপা। কিন্তু ভারতবর্ষের এমন দেশ নেই যার এককালে কোন রাজত্ব বা সাম্রাজ্য ছিল না। অল্প

সময়ের মাঝেই সামরিক শিক্ষায় ও যন্ত্রপাতি সজ্জায় সে তৈরী হতে পারে।

নীরদ মুসলমানরা কি করবে?

শ্রীঅরবিন্দ তারাও ত বিদেশী শাসন চায় না। অধিকাংশ নামজাদা মুসলমান স্বাধীনতা চায় তাতে সন্দেহ নেই। তবে সেটা মুসলমান স্বাধীনতা হওয়া চাই। জিন্না পর্যন্ত চায় স্বাধীনতা, সে কতবার তা বলেছে। আমার মনে হয় না যে তারা স্বাধীনতার বদলে বিদেশীশাসন পছন্দ করবে।

ভারতের যদি যুদ্ধের যন্ত্রপাতি থাকত, অন্যজাতিরা তাকে সহজে জয় করতে পারত না। স্পেনের দৃষ্টান্ত দেখ। তার সরকারের যন্ত্রপাতি সেকেলে ও অনুপযোগী, তবুও বছর বছর ধরে যুদ্ধ চালাচ্ছে। Abyssinia-র কথা আলাদা, তার না আছে যন্ত্র, না আছে শিক্ষা, আর মোটেই সে সংঘবদ্ধ নয়।

নীরদ Franco স্পেন অধিকার করলে ইংলণ্ড বিপদে পড়বে।

শ্রীঅরবিন্দ বেশি বিপদ হবে ফরাসীদের। ফ্রান্সকে তার আফ্রিকার উপনিবেশ থেকে সহজে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে তার চারদিকে বেড়াজাল তুলতে পারে। ইংলণ্ডের অবস্থাও হবে প্রায় তথৈবচ, কেননা সে এশিয়ার পথ আটকে দেবে। তবে অন্যপথ তাদের খোলা থাকবে।

এই বসন্তকালের মাঝেই Axis শক্তিদের উদ্দেশ্য বোঝা যাবে। এখন ত মুসোলিনী চেম্বারলেনকে দলে টানতে চেষ্টা করছে।

নীরদ ফ্রান্স বড্ড বেশি নির্ভর করছে ইংলণ্ডের উপর।

শ্রীঅরবিন্দ . করতেই হবে। জার্মাণী ও ইটালির সাথে সে ত একা লড়তে পারে না। সবাই জানে যে যুদ্ধ বাধলে জার্মাণী ইটালি এক হবে।

নীরদ : ফ্রান্স রাশিয়ার সাহায্য চাইতে পারে ত?

শ্রীঅরবিন্দ : সম্ভব নয়। প্রথমতঃ, রাশিয়াকে তার বিশ্বাস নেই। তারপর, দু'দেশের মাঝে বিরাট দূরত্ব, প্রায় সমস্ত ইউরোপ মাঝখানে। রাশিয়ার আবার Navy ও নেই।

নীরদ : জার্মাণী বোধহয় গতযুদ্ধের সন্ধিতে তার প্রতি যে অবিচার হয়েছে তার শোধ নিচেছ্।

শ্রীঅরবিন্দ : ঠিক তা নয়; ইংলণ্ডই জার্মাণীর ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। সে যখন দেখল যুদ্ধের পর ফ্রান্স শক্তিশালী হয়ে উঠছে, তার চিরন্তন স্বার্থপর নীতি অনুসারে জার্মাণীকে বড় করল শক্তিসাম্য রাখবার জন্যে (balance of power)। ভাবেনি যে জার্মাণী উল্টে তাকেই কামান দেখাবে। একসময় ত ইংরাজ ও ফ্রান্সের মাঝে বিরোধ প্রায় বাধে বাধে অবস্থা। ফ্রান্স ইটালিকে তুষ্ট করে তার সাথে বন্ধুত্ব করতে চাইল, আর ইংলণ্ড ইটালিকে করল শত্রু, Abyssinia-র যুদ্ধে তার উপর sanction জারি করে। কিন্তু ইটালিকে ত থামাতে পারল না; সে Abyssinia দখল করলই।

ইংরাজ রাজনীতির (diplomacy) এমন দেউলেপনা আগে আর দেখিনি। যুদ্ধের পব থেকে কী আহাম্মক ও দুর্বল নীতি অবলম্বন করে চলেছে, দেখ।

নীরদ : ইটালি নাকি Tunis, Corsica দাবী তুলেছে স্পেন থেকে ইংলণ্ডের ও ফ্রান্সের দৃষ্টি সরিয়ে নেবার জন্যে।

শ্রীঅরবিন্দ : কোন দৃষ্টি? কি করেছে তারা স্পেনের জন্যে? কিচ্ছু না। Blum ত socialist, সে যখন প্রধানমন্ত্রী ছিল, বলল "স্পেনের ব্যাপারে আমরা হস্তক্ষেপ করব না।" অবশ্য এই দাবীতে

ইটালি তাব বোকামিব পবিচয দিচেছ মাত্র। কোন ফবাসী নেতা দেশবাসীর বিরুদ্ধে এই দাবী মেটাতে সাহস করবে না। ইংলণ্ডের কাছে Wales ও Isle of Wight চাইলে যে কাণ্ড হবে, এদের বেলায়ও তাই হবে। ইটালি এই দাবী তুলে একটা ভাল কাজ কবেছে। Tunis-এর জাতীয় নেতাবা ভয় পেয়ে ফ্রান্সের পক্ষে একজোট হযেছে।

নীবদ : আমেরিকাও যুদ্ধেব প্রচণ্ড আয়োজন করছে।

সত্যেন্দ্র : ইউরোপের বাজনীতিতে সে জড়াবে কেন?

শ্রীঅববিন্দ : Roosevelt হযত Axisদেব মতলব সম্বন্ধে গোপন খবব কিছু পেযেছে। জড়াবে কেন? সেটা ত প্রশ্ন নয, প্রশ্ন হল ভক্ষণ নিযে। যাবা শেষে পড়ে থাকবে তাদেব এবা গ্রাস করবে শেষে, এই হল তফাৎ। আমেবিকাব কেউ কেউ সেটা আঁচ করতে পেবেছে, সবাই ত আব চেম্বারলেন নয়!

নীবদ : ইংবাজদের নৌবহর বেশ প্রবল।

শ্রীঅববিন্দ : বলা যায না। তবে তাদের অভিজ্ঞতা প্রচুর। ইটালিব নৌবহব নাকি সরঞ্জামে ইংরাজের সমান। কিন্তু কৃতিত্ব পরীক্ষা হবে 'সমবক্ষেত্রে'। ইটালির সে পরীক্ষা হয়নি এখনও।

নীরদ : কিন্তু বিমানশক্তি যে বকম বাড়ছে যুদ্ধের ভবিষ্যৎ যেন তার উপরেই নির্ভব কববে, নৌ-শক্তির উপর নয়।

শ্রীঅববিন্দ : বিমানশক্তি যুদ্ধ নিষ্পত্তি করতে পারে না। সে সাহায্য কবতে পারে মাত্র কিন্তু যুদ্ধের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হবে সমুদ্রে। যদি নৌ-সেনাকে ধ্বংস করা যায, তাহলে Blockade করে দেশকে উপোসে মারতে পারে। নৌশক্তির উপরই নির্ভর করবে অন্য দেশের উপর

আধিপত্য। এই নৌ-শক্তির দৌলতেই ত ইংরাজ পৃথিবীর উপর রাজত্ব করছে ৩০০ বছর ধরে।

ফ্রান্সের এক সময় বিমানশক্তি ছিল সবচেয়ে বেশি। কিন্তু বোকামি করে বিমান তৈরি বন্ধ করে দেওয়ায় এখন পিছিয়ে পড়েছে।

১৪।১।৩৯

"পুরাণী, তোমার জন্যে এক মজার খবর রাখা হয়েছে।" শ্রীঅরবিন্দ হঠাৎ ডাক দিয়ে বললেন।

পুরাণী : আমার জন্যে ?

শ্রীঅরবিন্দ : হাঁ। আমেরিকা থেকে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের নামে এক চিঠি এসেছে। লেখক লিখছে 'শুনলাম যে আপনি একজন বড় যোগ (আশ্রম হল মানুষ)। আমিও যোগ (**yoga**)। আমি নানা খেলার একটা প্রতিযোগিতা খুলেছি। আমার সহজে সমাধি (**trance**) হয় এবং তাতে সব কিছু ফলাফল জানতে পারি। আপনি যদি আমার সাথে একযোগে কাজ করেন তাহলে আমরা লভ্যাংশ ভাগাভাগি করে নিতে পারি। আপনার কি রকম সর্ত আমায় জানাবেন। আর আপনার টাকা নিতে কোন আপত্তি থাকলে সে টাকা গরীবদের দান করতে পারেন। তাতে আপনার, আমার ও গরীবেরই লাভ হবে। কি বলেন ?'

আমরা ত হাসতে হাসতে খুন! শ্রীঅরবিন্দ বললেন, "কি বল, পুরাণী ? তুমি নিজে সমাধিস্থ হতে পার অথবা নীরদকে দিয়ে চেষ্টা করাতে পার।"

নীরদ আমায়? বড় শক্ত ঠাঁই হবে।

পুরাণী সে সমাধিতে গেলে ফিরে আসবে না। ডলার দেখে মুগ্ধ হয়ে যাবে।

শ্রীঅরবিন্দ নানা জায়গা থেকে এই সব আধ পাগলা লোকদের চিঠি আসছে। কি করে তারা ঠিকানা পায় বল ত?

সত্যেন্দ্র অনিলবরণ কোন এক কাগজে প্রবন্ধ লিখেছেন, সেখান থেকে নিশ্চয়।

শ্রীঅরবিন্দ তাই হবে, কেননা ঠিকানায় লিখেছে **A. B. of Sri Aurobindo Ashram.**

সত্যেন্দ্র ওটা হল—**Institution**-এর পত্রিকা। তার বেশ লাভজনক ব্যবসা আছে আমেরিকায়। যোগ এবং ব্যবসা, এই দুটির চমৎকার সমন্বয়!

শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু লোকটি কে? কেউ বলছে দক্ষিণী, কেউ বলছে বাঙালী।

সত্যেন্দ্র বাঙালী বোধ হয়।

পুরাণী আপনি প্রথমবার একটি কাগজে তার ছবি দেখে বলেছিলেন তার সাথে অমুকের খুব সাদৃশ্য আছে—দুজনেই **charlatan.** কিন্তু স্পোর্ট প্রতিযোগিতায় এরকম ভবিষ্যৎ বলা যায়?

সত্যেন্দ্র বলল যে তার ভাই'এর সম্বন্ধে গণক অনেক কিছু বলেছে, যার খুব কমই ফলেছে।

শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু বরোদায় আমার এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল, জ্যোতিষ বিষয়ে নয়—তার গণনা ফললই না—মনের চিন্তা সম্পর্কে। আমার বাড়ীর সরকার আমায় নিয়ে যায় এক জ্যোতিষীর

কাছে। সে আমায় মনে মনে চারটা প্রশ্ন তৈরী করতে বলল। একটা প্রশ্ন তৈরী হবার আগেই শূন্যে মিলিয়ে গেল। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে লোকটি শুধু যে অন্য তিনটি চিন্তাই ঠিক ঠিক বলে দিল তা নয়, সেই পলাতক প্রশ্নটাও ধরল। কিন্তু তার জ্যোতিষ গণনা ফলেনি।

পুরাণী: আমেরিকায় আমাদের বই ছাপাবার কোন চেষ্টা হচ্ছে কি?

শ্রীঅরবিন্দ: না। আমেরিকান জাত হল পল্লবগ্রাহী (shallow)। গভীর জিনিসের প্রতি কোন স্পৃহা নেই। ন' একটি প্রবন্ধ লেখে আমেরিকার কাগজের জন্যে। নিষ্ঠার (Miss Wilson) মতে প্রবন্ধটা ভালই হয়েছিল কিন্তু কাগজের সম্পাদক আপত্তি জানাল, 'আমেরিকান জাত এ সমস্ত গভীর তত্ত্ব হজম করতে পারবে না। লেখা বদলাতে হবে।' কেটে ছেঁটে লেখাটিকে সারহীন হাস্যকর বিষয় করেছে।

নীরদ: কিন্তু তারা গোঁড়া নয়, নূতন আইডিয়ায় সাড়া দেয়।

শ্রীঅরবিন্দ: তা বটে; আসলে তারা চায় উত্তেজনা ও নূতনত্ব। তবে এপর্যন্ত বলা যেতে পারে যে ইউরোপের চাইতে আমেরিকাতেই আমাদের আইডিয়ায় উৎসাহ বেশি, ইউরোপেও অবশ্য সংখ্যা বাড়ছে।

নীরদ: কিন্তু আমেরিকাতে রামকৃষ্ণ মিশনের বেশ প্রতিপত্তি হয়েছে। সেই বাঙালীটিও নাম করেছে। আর একজন নানা ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী করে ইউরোপকে মাতিয়ে তুলেছে। শেষে কিন্তু লোকজন তাকে ঠক, জোচ্চোর ইত্যাদি গালাগাল দিতে লাগল।

শ্রীঅরবিন্দ: জোচ্চোর কেন? সে কি টাকা নিয়েছে? জোচ্চোরি হয়, যখন কোন জিনিষ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা নাও,

অথচ তা কর না। তার ভবিষ্যদ্বাণী যদি না ফলে, সেটা ত জোচ্চোরি হবে না। তার সাদা অর্থ হল, ভবিষ্যদ্বাণী ফলল না। পুরোহিত স্বামী কে?

পুরাণী ঠিক জানি না। তিনিই ইয়েট্স-এর সাথে মিলে উপনিষদের টিকা লিখেছেন। তাতে **levitation**-এর কথা উল্লেখ করে বলছেন তার দৃষ্টান্ত দেখেছেন তিনি।

শ্রীঅরবিন্দ: আমি একটিমাত্র **levitation**-এর কথা শুনেছি, র'র মুখে। সে জোর করে বললে যে তার সমস্ত শরীর উপরে উঠেছে। আর একটি জার্মান নাকি লিখেছে যে তার শরীর প্রায় ৬ ইঞ্চি উপরে উঠে ধপাস্ করে মাটিতে পড়ল। (হাস্য)

পুরাণী আমায় একজন জিজ্ঞেস করল সাধকের বা যোগীর জীবন বীমা করা অন্যায় বা যোগের বিরোধী কি না?

শ্রীঅরবিন্দ: ঠাকুর দয়ানন্দ হলে বলতেন "অবশ্য অন্যায়!" তোমাদের বলেছি যে ভগবানই ছিল তাঁর একমাত্র নির্ভর; কোন জিনিষ সঞ্চয় করা তাঁর ধর্মবিরুদ্ধ। তিনি যা পেতেন, সবই খরচ করে ফেলতেন। যদি কোনদিন ভাণ্ডার শূন্য থাকত, তার মানে এই যে তাঁর উপোস করাই ভগবানের অভিপ্রেত। তাদের ভক্তির প্রকাশ হল নাচ, গান ইত্যাদির মাধ্যমে, প্রাণ-ধর্মী। পরে তিনি বলতেন যে তাঁর প্রাণ-শক্তি হ্রাস পাচ্ছে। তিনি ক্রমে ক্রমে মোড় নিলেন জ্ঞানের দিকে। তাদের একটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে সব অনিষ্টের বা দুর্দৈবের হাত থেকে তারা রক্ষা পাবে। তাদের আশ্রম সংক্রান্ত কোন এক গুলির ব্যাপারে পুলিশ তদন্তে এসে তাদের নাচ গান ইত্যাদি উল্লাস দেখে যখন ফিরে যায়, শিষ্যরা ভাবল তাদের দমন করতে পারে দুনিয়ায় এমন

শক্তি নেই—তারা অজেয়। তারপর সরকার পাঠাল সৈন্য; তারা তাদের নাচগান ভেঙে দিল এবং লোকজনদের গ্রেপ্তার করল। তাতে শিষ্যদের বিশ্বাসে লাগল ধাক্কা। কেউ কেউ ত ঠাকুর দয়ানন্দকে অবতার বলে আর বিশ্বাসই করল না।

সত্যেন্দ্র: ভাগবত চেতনার সাথে যুক্ত থাকলে কি প্রাণ-শক্তি হ্রাস পেতে পারে?

শ্রীঅরবিন্দ: যে শক্তির দ্বারা কাজ চলে সেটা ভাগবত চেতনার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

এরকম এক তীব্র আবেগপ্রবণ লোকের সাথে আমার এখানে সাক্ষাৎ হয়, সে ছিল মহারাষ্ট্রদেশী। আমি যখন তার সাথে দেখা করতে নীচে এলাম আমাব অনুভব হল যেন মৃত্যু অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার শক্তি আমায় চারদিকে ঘিরে ধরেছে। তৎক্ষণাৎ আমি নিজেকে সংহত করলাম। সেই লোকটিই অজ্ঞাতে এই শক্তিগুলো নিক্ষেপ করছিল বাইরে এবং তাকেও ঘিরে রেখেছিল এই বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসের শক্তি। এ সব লোকের সংস্পর্শ যারা সচেতন অথচ দুর্বল তাদের পক্ষে ভয়ানক বিপজ্জনক। সচেতন না হলে কিন্তু কোন ক্ষতি হয় না।

পুরাণী: তার সম্বন্ধে আপনার চমকপ্রদ ভাষাটা আমার এখনও মনে আছে: দুর্বলতার উদ্দাম তীব্রতা (wild intensity of weakness)।

শ্রীঅরবিন্দ: এরাই হল সে জাতীয় লোক যাদের ভীষণ তীব্রতা আছে কিন্তু কোন দৃঢ়তা (solidity) নেই।

এখানে আলাপ শেষ হল। কিছুক্ষণ পরে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, যোগশক্তিতে আপনার পা সম্পূর্ণ সেরে যাবে ত?

শ্রীঅববিন্দ : যাওয়া ত উচিত। তবে এই জাতীয় জিনিষ আগে কখনও চেষ্টা করিনি।

১৫।১।৩৯

আজ আবার Dr. Rao এসেছেন। splint, sling ইত্যাদির উপকারিতা সম্বন্ধে তিনি নানা মন্তব্য করতে লাগলেন। শেষকালে বলে বসলেন যে যাই বলা হোক না কেন ওষুধে রোগ সারায় না ; রোগ সারায় প্রকৃতি, ওষুধ প্রকৃতিকে সাহায্য করে মাত্র। এ নিয়ে আমাদের মাঝে একটু তর্কাতর্কি চলল। তিনি চলে গেলে শ্রীঅরবিন্দ বললেন "আশ্চর্যের বিষয় যে ডাক্তারেবা বহু অভিজ্ঞতার পর একই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়। মা'র এক ডাক্তার বন্ধু বলতেন যে ডাক্তারই রোগ সারায়, ওষুধ নয়। অতি সত্য কথা। রোগ সারাবার শক্তি থাকা চাই, ওষুধের গুণগুলি সেই শক্তিকে সাহায্য করে মাত্র। সেই শক্তিই হল প্রধান জিনিষ, সেটা না থাকলে ওষুধের মূল্য অতি সামান্য।

সত্যেন্দ্র : পুবণো শাস্ত্র তাকে বলত vital force.

শ্রীঅরবিন্দ : ঠিক তাই। এখনও কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন বিখ্যাত Montpilier বা দক্ষিণ ফ্রান্সে এই Vital Force স্বীকার করা হয়, যেহেতু স্পেন ও এই দেশগুলিতে আরবদের প্রভাব পড়ে। এই Vital Force theory আবার ফিরে আসতে পারে।

এককালে পদার্থবিজ্ঞান তার আইনকানুন অনুসারে পৃথিবীর যাবতীয় ব্যাপার বুঝতে ও বোঝাতে পারে বলে দাবী করত। এখন উল্টো-সুর নিয়েছে ; স্বীকার করছে যে, বাস্তবিকপক্ষে কিছুই ব্যাখ্যা করা যায় না।

পুরাণী : এমনও বলছে law of causation আর অবিসম্বাদী সত্য (absolute) নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকেরা ঘটনাবলীর বা বিষয়ের হেতু নির্ধারণ করতে পারে না। কেননা হেতু নির্ধারণ করতে গিয়ে তারা ক্রিয়ার পদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়। এর তারা নাম দিয়েছে indeterminacy.

শ্রীঅরবিন্দ : Jeans আর Eddington আধ্যাত্মিক ও অতিপ্রাকৃত সত্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চাচ্ছে তাদের বিজ্ঞানের সাহায্যে। ওটা পণ্ডশ্রম। কারণ ৩০।৪০ বছর ধরে খেটে যখন তোমার তথ্য তৈরী করলে, দেখবে যে বিজ্ঞান আবার বদলে গেছে এবং তোমার সমস্ত ভিত্তি ধূলোয় গড়াচেছ। তুমি এই পর্যন্ত বলতে পার বিজ্ঞানের কতগুলি সিদ্ধান্ত পরাবিজ্ঞানের (metaphysics) সিদ্ধান্তের সাথে মিলছে। বিজ্ঞানের উপর পরাবিজ্ঞানের ভিত্তি খাড়া করতে পার না।

পুরাণী : ইউরোপের বৈজ্ঞানিকেরা বিজ্ঞানের উপর দার্শনিক তত্ত্ব ভিত্তি করতে রাজী নয়। তাদের মতে ব্যাখ্যা নয়, প্রণালীটাই আসল, সেটা আবিষ্কার করাই তাদের কাজ। Eddington তাঁর Gifford বক্তৃতায় বলছেন যে, বহু সিদ্ধান্ত হতে মানুষের অন্তরাবৃত মনই (subjective) শেষ অবধি একটা সিদ্ধান্ত বেছে নেয়। বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত নির্ভর করে সেই দর্শক মনের উপর (observing mind), বাহ্যিক সত্যের উপর নয়। যেমন, ৮ × ২ = ১৬, ৬১ নয়—এই সত্যটা মনই গ্রহণ করে।

শ্রীঅরবিন্দ : এক্ষেত্রে দীর্ঘসঞ্চিত অভিজ্ঞতা, অথবা বলতে পার সার্বজনীন অভিজ্ঞতা, তাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে।

পুরাণী : আবার, বৈজ্ঞানিকেরা রামধনু পরীক্ষা করে দেখল ওটা বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের আলোর তরঙ্গের (wave length) সমষ্টি মাত্র, তার অন্য কোন সত্য নেই, কিন্তু কবির দল উচ্ছ্বসিত হল তার বর্ণসমারোহে। এখন, আমরা কি বলব বিজ্ঞানই সত্যি, কবির কল্পনা অলীক?

শ্রীঅরবিন্দ : আমি বলব রামধনুর অস্তিত্বই নেই, না বৈজ্ঞানিকের পক্ষে, না কবির পক্ষে। বৈজ্ঞানিক কেবল উল্লসিত হচ্ছে পদ্ধতি, process নিয়ে আর কবি পদ্ধতির পরিণাম ফল নিয়ে।

পুরাণী : আপনি Spengler-এর Decline of the West পড়েছেন?

শ্রীঅরবিন্দ : না। বক্তব্য কি?

পুরাণী : সংক্ষেপে বলছি : কাল একটা নিরপেক্ষ সত্তা নয় (neutral entity), তার নির্দিষ্ট গতিধারা ও অভিপ্রায় আছে। কতগুলো ঘটনাও সে ঘটায়। একটা নিয়তির বা এমন কিছুর নির্দেশ দেয় যার দিকে অব্যর্থভাবে চালিয়ে নিয়ে যাবে সমবেত শক্তিসমূহ। মানবইতিহাসের অতীত ঘটনাবলী লক্ষ্য করে তাঁর এই প্রতীতি হয়েছে যে মানবজাতির জীবনের একটা কালক্রম (cycle) ছিল; সেই কালক্রমের মধ্যে সভ্যতার উৎপত্তি ও অবনতি ঘটেছে। যে কোন সভ্যতায় এদের লক্ষণগুলি পরীক্ষা করে বলা যায় যে সভ্যতা কতদিন টিঁকবে। বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতায় জীর্ণতার লক্ষণ দেখা দিয়েছে, কাজেই তার অবনতির আর দেরী নাই। এই অবনতির চিহ্ন হল বড় বড় নগরের উত্থান, পল্লীগ্রামের দারিদ্র্য, ধনিকতন্ত্র ইত্যাদি। আরও বলছে যে ইতিহাসকে আদিম, মধ্যযুগ ও আধুনিক এই তিনভাগে ভাগ করা ভুল। নৈর্ব্যক্তিকভাবে আমাদের বিশ্ব ইতিহাস পড়তে হবে।

কোন একটা বিশিষ্ট সভ্যতায় যে সমস্ত গাণিতিক আবিষ্কার দেখা যায়, সেগুলো সে সভ্যতার স্বভাবজাত দান (organic), বাইবের প্রভাবজাত নয়। যেমন, গ্রীকজাতি কোনদিন series-এর—সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি বা ক্রমহ্রাস হতে হতে অসীম সংখ্যায় বা শূন্যে উপস্থিত হওয়া কল্পনাই করতে পারত না। এই 'series-idea' একমাত্র সম্ভব বর্তমান সভ্যতায়।

এমনও বলছেন যে যদি কোন কারণে নেপোলিয়ানের উত্থানে বাধার সৃষ্টি হত, তবু তাঁর কাজের ফল ফলতই। কেননা সেটা ছিল নিয়তির বিধান।

শ্রীঅববিন্দ : ঠিক বুঝতে পাবলাম না। মহানগরী ত বরাববই ছিল। নিয়তি যদি থাকেও, তাকে কেন বদলান যাবে না? নেপোলিয়ানের অভ্যুদয়ে যে সমস্ত ফল ফলেছে সেগুলো তার অবর্তমানেও নিশ্চয় ফলত? সে-সম্বন্ধে একমত হওয়া যায় না। আমার বিশ্বাস ফল বস্তুতঃ অন্য রূপ নিত। সে সময় নেপোলিয়ান যদি না আসতেন, তাহলে ইউরোপীয় শক্তিগুলি ফরাসী গণতন্ত্র একেবারে নির্মূল করে দিত। নেপোলিয়ানই বিপ্লবকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাই পৃথিবীর পক্ষে গণতন্ত্রের আদর্শ প্রাপ্তি সম্ভব হল। তিনি যদি না জন্মাতেন, দু'তিন শতাব্দী পিছিয়ে পড়ত এই আদর্শ।

আব নিয়তি, নিয়তি বলতে কি বোঝ? এটা একটা শব্দ বই ত নয়। মানুষ সহজেই শব্দে ভোলে। নিয়তি কি কতগুলো মূঢ় অন্ধ জড়শক্তির ক্রিয়া? তাহলে স্বাধীন ইচ্ছার (choice) কোন স্থান থাকে না, এবং শেষ পর্যন্ত হয় শঙ্করের মায়াবাদ, নয় নিরেট জড়বাদ গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু নিয়তি অর্থে যদি এই বিশ্বে

একটা সক্রিয় সঙ্কল্প—will আছে বলে মানি, তাহলে স্বাধীন ইচ্ছাও মানা সম্ভব।

কালক্রম সম্বন্ধে যা বলছে তাতে কিছু সত্য আছে। কিন্তু তা' বলে বলা চলেনা যে তাব পুনরাবর্তন একটা কঠোর নিয়মে আবদ্ধ। তা মোটেই নয়, কালক্রমগুলো যথেষ্ট নমনীয় এবং তাদের বয়সকাল যে সমান হবে এমন কোন কথা নেই। Aryan Path পত্রিকায় Mr. Morris এক প্রবন্ধ লিখেছে, তাতে বহু ঘটনা ও ঐতিহাসিক তথ্য দিয়ে প্রমাণ করতে চেযেছে যে মানবইতিহাস বরাবর ৫00 বছরের যুগক্রম ধরে চলেছে এবং তার বিশ্বাস 'মহাত্মা'র দল পৃথিবীব শাসনকার্য চালাচেছ্।

কালক্রম আসলে কি? প্রকৃতি চলছে একটা বাঁকা রেখায় (curve) আব তার যেন পুনরাবৃত্তি হচেছ্—এই ত? কিন্তু সেখানেও কোন কঠোর নিয়ম নেই। বিবর্তনের প্রয়োজন অনুসারে তারও পরিবর্তন হয়।

নিয়তিও কোন ব্যক্তিগত ইচ্ছা (will) নয়। তাহলে তোমায় মানতে হবে সেটা বিশ্ববিধান বা বিশ্ব-ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণ, কিন্তু সে ইচ্ছা কি মুক্ত না পরতন্ত্র? মুক্ত যদি হয়, তাহলে তাকে অন্ধ পরিণামবাদ (determinism) বলা চলে না এবং যখন তুমি আপাতদৃষ্টিতে কোন রকমের 'উন্নতি' দেখতে না পাও, তখনও বিশ্ব-ইচ্ছাশক্তি বিবর্তন-ক্রিয়া সম্পন্ন করে চলেছে। অপর পক্ষে, যদি বল যে বিশ্ব-ইচ্ছা পরাধীন বা বদ্ধ, তখন জিজ্ঞাস্য হবে বাঁধল কে? বা কিসের দ্বারা বদ্ধ?

গাণিতিক সংখ্যার অসীম পর্যন্ত বিস্তৃতি—সেটা ত বহু, বহুকাল আগে ভারতবর্ষে আবিষ্কার হয়েছে।

আর, ঐতিহাসিক যুগকে তিনভাগে ভাগ করাই বা ভুল হবে কেন?

এদের পরস্পরের মাঝে কোন তফাৎ নেই বলতে চায় কি ? না, থাকলেও সেগুলো তার মতে উপেক্ষা করা উচিত ?

(কিছুক্ষণ পরে) না ! দার্শনিকের যুক্তিক্রমের বিশেষ মূল্য নেই, কেননা তার সিদ্ধান্তই তার কাছে বেশি মূল্যবান এবং যে কোনমতে সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য সে অন্য কোন দিকে দৃক্‌পাত করে না। তখন আমাদের নিতে হবে সিদ্ধান্তগুলিই ; আবার সেখানেও বাক্য নয়, পরগাছাগুলি নয়, একেবারে সারবস্তুগুলো চাই। যেমন, Spengler-এর নিয়তিবাদ বা কালক্রমবাদে কিছু সত্য আছে, বাকীগুলো সব জঞ্জাল বলতে পার।

পুরাণী : বোধহয় মানুষ অজ্ঞাতসারে সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করে, পরে যুক্তি খাড়া করে জুড়িয়ে দেয়।

শ্রীঅরবিন্দ : তাই ; তার জাগ্রত চেতনা সেটা জানেনা। সেখানেও মানুষের ego অহঙ্কার এসে জুড়ে বসে। সেটা এত ক্ষুদ্র, সীমাবদ্ধ ! তবুও ভাবে যে মানব-চিন্তাভাণ্ডারে তার দানই একমাত্র সত্য, বাদবাকী সব মিথ্যা। তেমনি আমরা পালটা বলতে পারি যে নিয়তি যেরকম চায়, মানুষ সেরকমই চিন্তা করে এবং সেভাবেই মানুষের অগ্রগতিকে তার দান সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু বিবর্তনধারা যে সার্বভৌম, —ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, এবং দর্শনের কতগুলি ধারণা বা ব্যবহারিক নিয়ম দ্বারা যে মানুষের অগ্রগতি নিয়ন্ত্রিত হতে পারেনা, এটা ত সহজ বুদ্ধির কথা। সত্য কোন যুগ, কোন ব্যক্তি বা সমষ্টির একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। ধর্ম সম্বন্ধেও একই কথা।

পুরাণী : বিশ্বমনের অধিকারী না হলে কি এরকম উদার দৃষ্টি সম্ভব ?

শ্রীঅরবিন্দ : কেন? মানুষী মন দ্বারাও এইটুকু বোঝা যায়।

পুরাণী : **Wells** বলছেন যে সমস্ত জ্ঞান এখন 'মানবীয়' (**human**) হওয়া চাই, সেটা কি এই ধরনের কিছু নয়?

শ্রীঅরবিন্দ : না, সেটা অন্য জিনিষ। তিনি বলতে চান 'আন্তর্জাতিকতা'। সব বিজ্ঞানই ত আন্তর্জাতিক, অধিকাংশ বর্তমান সাহিত্যের গতিও তাই। কিন্তু ইউরোপের অবনতির পরে **Spengler**-এর মতে ভবিষ্যতের ছবি কি রকমের হবে?

পুরাণী : তিনি ত চীন ও ভারতবর্ষকে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছেন। এদের সভত্যা এখন অকেজো!

শ্রীঅরবিন্দ : তাহলে আরবদের?

পুরাণী : না, তাদেরও নয়। তারা কবে বাতিল হয়ে গেছে, এখন বাজে মাল!

শ্রীঅরবিন্দ : তাহলে একমাত্র আশার প্রদীপ আফ্রিকা! আবিসিনিয়া! (হাস্য)

পুরাণী : বোধহয় আমেরিকা আর আফ্রিকা! (হাস্য)

শ্রীঅরবিন্দ : কি করে? আমেরিকা ত ইউরোপের সাথে ডুবল। রইল বাকী আফ্রিকা আমাদের রক্ষার জন্যে।

পুরাণী : কি করে **Spengler** এই সোজা কথাটা ভুলে গেলেন যে জাতির পুনরুত্থান ও পুনর্জাগরণ হতে পারে?

শ্রীঅরবিন্দ : ঠিকই ত! চীনের কথাই নাও না কেন। চীনে ত বরাবরই পুরাকাল থেকে নগর ছিল। কিন্তু জাতটা কী অদ্ভুত! গোলমালের অন্ত নাই কিন্তু পরে যেই সেই! ১000 বছর আগেকার চীন ইতিহাস পড়ে দেখ, কত বিপ্লব হয়ে গেছে কিন্তু তাদের সভ্যতা

ঠিক দাঁড়িয়ে আছে। তাতার রাজা তাদের বই পুঁথি পুড়িয়ে ফেলল কিন্তু সভ্যতা পোড়াতে পারলনা! আমি মোটেই আশ্চর্য হব না যদি দেখি যে বর্তমান গোলযোগের ২000 বছর পরেও চীনরা কিছুমাত্র বদলায়নি, ঠিক আজকের অবস্থায় রয়েছে। এটাই হল এই জাতের বিশেষত্ব।

ইতিহাসের গতি যদি লক্ষ্য কর, দেখবে তার একটা নিয়তি আছে; সেটা বাহ্যতঃ জড়শক্তির সমষ্টিফল ছাড়া আর কিছু নয়। এটাও একটা নিয়তি। আর সেটা যখন অসীম বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে, তখন মনে হয় এই গতির মাঝে একটা গতিমুখ বা উদ্দেশ্য (tendency) নিহিত আছে, যেটা অব্যর্থ।

এখন প্রশ্ন হল: জড়শক্তিই কি কেবল নিয়তি নির্ধারণ করে? অন্য কোন শক্তি নেই? এই জড়শক্তি ছাড়া এমন কিছু নাই যা ঘটনা-চক্র ঘুরিয়ে দিতে পারে?

এরকম শক্তির যে প্রবল অভ্যুত্থান (inrush) হয়েছে ইতি-হাসে তার নজির আছে। তার ফলে জড়শক্তির প্রণোদিত নিয়তির পথ বদলে গিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসের চেহারার পরিবর্তন হয়েছে। আরবদের উত্থান দেখ। ক্ষুদ্র, অসভ্য জাত, বাস করছিল একটা ঊষর মরুভূমির বুকে। হঠাৎ জেগে উঠে কী কাণ্ড করল! ইতিহাসকে উল্টিয়ে দিল যেন। এটাকেই বলছি জড়াতীত শক্তির প্রবল আবির্ভাব।

পুরাণী: **Shaw, Emerson**-এর মত মনীষীরা বলছেন যে গ্রীকদের পরে মানুষের চিন্তাশক্তি তেমন বিশেষ কিছু বাড়েনি।

শ্রীঅরবিন্দ: ঠিকই ত, অবশ্য এখন মানুষ লাভ করেছে প্রচুর উপকরণ, বিশাল তার ক্ষেত্র। গ্রীকদের তা ছিল না। কিন্তু

ব্যবহারের বেলায় দেখা যাচ্ছে যে আধুনিক মন গ্রীকমনের চাইতে শ্রেষ্ঠ নয়, যদিও তুলনায় গ্রীকদের হাতে ছিল সামান্য উপকরণ।

পুরাণী: **Emerson** লিখছেন যে এই ২000 বছরের মাঝে **Plato**-ই হলেন ইউরোপীয় মনীষার চরম নিদর্শন।

শ্রীঅরবিন্দ: সত্যি কথা। ইউরোপের মনীষা সর্ব বিষয়ে গ্রীসের কাছে ঋণী। যে কোন জ্ঞানের দিকে মানুষের মন আগ্রহে এগিয়ে গেছে, সে সমস্তই ইউরোপ পেয়েছে গ্রীসের কাছ থেকে। রোমান জাত জানত যুদ্ধ ও আইন করতে; দেশগুলিকে একত্রে বেঁধে রাখতে, কিন্তু তার চিন্তার কাজে লাগাত গ্রীকদের। অবশ্য, গ্রীকরাও যুদ্ধ ব্যাপারে পাকা ছিল, কিন্তু রোমানদের মত নয়। **Cicero, Horace, Seneca,** প্রভৃতি রোমান মনীষীরা তাদেব দর্শনের জন্যে ঋণী গ্রীকদের কাছে।

আমি যে শক্তির আবির্ভাব সম্বন্ধে বলছিলাম, গ্রীস হল তার আর একটা দৃষ্টান্ত। এখানেও ছোট্ট একটি জাত, মহাসাগরের বুকে ক্ষুদ্র জিহ্বার মত প্রসারিত একটি দেশের বাসিন্দা। সেই জাত এমন একটা সভ্যতা সৃষ্টি করেছে, তাও মাত্র ২00-৩00 বছরের মাঝে—যে তোমাদের বর্তমান ইউরোপ সভ্য হয়েছে তার কাছ থেকে মূল উপাদান পেয়ে।

পুরাণী: তাদের শিল্পীর সংখ্যাই যে কত!

শ্রীঅরবিন্দ: তাদের সৌন্দর্যবোধ ছিল বলে। যে একটা জিনিষ বর্তমান ইউরোপ গ্রীকদের কাছ থেকে নেয়নি, সেটা এই সৌন্দর্যবোধ। বলতে পার না যে বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা সুন্দর।

প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও একই কথা; তার যে সৌন্দর্যজ্ঞান ছিল, সেটা অনেকখানি হারিয়ে ফেলেছে। এখন ইউরোপের প্রভাবে

বাকীটুকুও দ্রুতগতিতে লোপ পাচ্ছে। গ্রীস যে সব কিছু নিজে সৃষ্টি করেছে এমন নয়; Egypt, Crete ও Asia থেকে অনেক উপকরণ নেওয়া হয়েছে।

ইউরোপীয় মনের বিপর্যয়ের কথা ভাবতে অবাক লাগে। আমি বলেছি যে সত্য কোন আইডিয়াসমষ্টির একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। তবুও দেখ Hitler, Mussolini ও Stalin সম্প্রদায় কি করছে; মানুষের মনটাকে জোরে তাদের আইডিয়ার সঙ্কীর্ণজালে বেঁধে রাখবার কী আপ্রাণ চেষ্টা! ভাবতে পার?

১৯শ শতাব্দীর শেষভাগে আমাদের ধারণা ছিল যে মানুষের বুদ্ধি কিছু পরিণতি লাভ করেছে, কোন আইডিয়া যাচাই না করে সহজে গ্রহণ করবে না। কিন্তু সে ধারণা যেন ভুল। এই তো Nazi-idea বেশ সমাদৃত হচ্ছে। ৫০ বছর আগে জোর করে বলা যেত কিছুতেই এসব idea-র আদর হবে না। তারপরে দেখ, মনীষীরা কি রকম যেন মিইয়ে গেছে, তারা পরাজয় স্বীকার করল বিনাযুদ্ধে! অগ্রণী মনীষীরা পর্যন্ত অতি স্বচ্ছন্দে psycho-analysis ও Freud-এর আইডিয়া মেনে নিচ্ছে! আশ্চর্য না?

(কৃষ্ণপ্রেমের ভয় যে psycho-analysis আধ্যাত্মিকতাকে তাড়িয়ে দেবে, না হয় মেরে ফেলবে। কেননা আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলি নাকি এই বিজ্ঞান সহজে ব্যাখ্যা করতে পারে।)

পুরাণী: কোন কোন মনীষী ত Nazi Bible প্রচার করছে। Psycho-analysisকে যারা Science-এর গদিতে বসাতে চায়, সে সব ভক্তরা দেখতে পাচ্ছে না যে অবচেতন বা অচেতনের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই? এখন যা কিছু নূতন, অসাধারণ, তাই যেন বিশ্বাস করছে।

শ্রীঅরবিন্দ : এই Nazi আইডিয়াগুলি হল যুক্তিস্তরের নীচের জিনিষ (Infra-rational)। সেগুলো মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। সেজন্যে তাদের বলা হয় প্রেরণা (inspiration), mysticism কিন্তু আসলে নিম্নপ্রকৃতি হতে ওঠা সঙ্কীর্ণ ও তীক্ষ্ণ আবেগসমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়। বোধহয় এদেরও দরকার ছিল যুক্তির উর্ধ্বের সত্য গ্রহণ করবার জন্যে। প্রত্যেক জিনিষকে তারা মিথ্যায় পরিণত করে। infra-rational-এও সত্য আছে। পৃথিবী সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান অপূর্ণ থাকবে যদি এদের কাজ না জান। পুরো জ্ঞানের জন্যে তার প্রয়োজন আছে।

পুরাণী : Infra-rational বলতে কি মানুষ পশুর কাছ থেকে যে সমস্ত গুণ পেয়েছে তাই বোঝাতে চাচ্ছেন ?

শ্রীঅরবিন্দ : Infra-rational বলতে শুধু পশু নয়—তার মাঝে গণ্য করতে হবে রাক্ষস, অসুর, Titanদেরও। মানুষ পশুকে অযথা গালাগাল দেয়, পশুদের সম্বন্ধে খুব অবজ্ঞার সুরে কথা বলে। কিন্তু ধর, কুকুরের কথা। এমন কোন কুকুর পাবে না যে প্রভুভক্ত নয় ; বিশ্বাস ও ভালবাসা এই দুটি গুণ তাদের সার্বজনীন। মানুষের সম্বন্ধে কি তা বলা চলে ? কয়েকজনের পক্ষে সত্য হলেও সারা মানুষ-জাতি সম্বন্ধে নিশ্চয় নয়।

পুরাণী : একটি বন্ধু আমায় বলে যে আমাদের দেশে গরুদের এত নিরীহ গোবেচারী দেখে তার খুব অবাক লেগেছে। বিলাতে নাকি গরু মানুষকে আক্রমণ করে।

শ্রীঅরবিন্দ : অধিকাংশ পশুই মারে তার খাদ্যের প্রয়োজনে ; খুব কম পশুই হিংস্র। আমেরিকায় এক ধরনের সিংহ ছিল, তাদের

কেশর ছিল না। তারা মানুষের প্রতি সদ্ভাব দেখাত, কিন্তু প্রয়োজনে তারা অন্যান্য পশু মারত বলে আমেরিকানরা তাদের মেরে মেরে প্রায় শেষ করে এনেছে। আফ্রিকায় ত আইনই করতে হয়েছে কতকগুলি পশুকে রক্ষা করবার জন্যে। মানুষ যখন বিপদের কারণ হয়, তখন সাধারণতঃ বন্যপশুরা তাদের মারে। কিন্তু মানুষের বেলায় বলতে পার কি যে মানুষ বাধ্য হয়ে মারে? মানুষ মারে তার আমোদের জন্যে।

তার অর্থ এই নয় যে মানুষের উন্নতি হয়নি। বর্তমান কালের দার্শনিক Plato-র চাইতে শ্রেষ্ঠ নয় বটে, কিন্তু আজকাল দর্শনচর্চা অনেকখানি বেড়ে গেছে এবং Plato-র সময়ের তুলনায় অনেক বেশি লোক দর্শন বোঝে। ইতিহাসের আরম্ভ থেকে দেখা যায় যে মানুষকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাঁচাবার জন্যে কতগুলি মুষ্টিমেয় ব্যক্তি মশাল হাতে এগিয়ে চলেছে।

১৬।১।৩৯

"খবর কি পুরাণী?" শ্রীঅরবিন্দ নিজেই কথা আরম্ভ করলেন আজ। পণ্ডিচেরীর রাজনীতিতে গোলমালের সৃষ্টি হয়েছে, সে সম্বন্ধে পুরাণী তাঁকে খবর দিল।

পরে কথা উঠল materialisation সম্বন্ধে। Hindusthan Standard-এ একটা সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যে সোমেশ বোসের স্ত্রীর মৃত্যুর বিশ বছর পরে তাঁকে নাকি ভোলাগিরি পুনর্জীবিত করেছেন এবং স্ত্রী স্বামীর সাথে সাধনা করছেন। কাগজে আরও লিখছে যে ভোলাগিরি প্রতি সন্ধ্যায় তাঁদের বাড়ী আসেন তাঁদের

আশীর্বাদ করতে। কাগজ জিজ্ঞাসা করছে, এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জড়-বিজ্ঞানের কি বলবার আছে?

শ্রীঅরবিন্দ: বলবে এ সমস্ত গাঁজাখুরী গল্প।

সত্যেন্দ্র: যোগের কি মত, স্যার?

শ্রীঅরবিন্দ: বহু মত আছে, বহু সম্ভাবনা থাকতে পারে।

নীরদ: কিন্তু রক্ত মাংসের শরীর সৃষ্টি সম্ভব?

শ্রীঅরবিন্দ: রক্ত মাংস মানে কি? তার স্ত্রী কি সব সময় থাকে, না কয়েকঘন্টার জন্যে এসে আবার চলে যায়? শেষেরটা যদি হয়, তাহলে ওটা ক্ষণস্থায়ী materialisation—ওটা খুবই সম্ভব। আর যদি স্থায়ী হয়, তাহলে সেটাও অনুমান করা এমন কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু আমি নিজে তার কোন প্রমাণ পাই নি। আমাদের Guest Houseএর ব্যাপারে যদি পাথর সৃষ্টি করা হয়ে থাকে, তাহলে মানুষ সৃষ্টি (materialisation) হবে না কেন আমি বুঝতে পারছি না।

এই ধরনের সূক্ষ্ম শরীর গ্রহণ দেখা যায় সাধারণত মৃত্যুর ঠিক পূর্বে বা পরে। এমন ঘটনা শোনা যায় যে কোনো কোন লোক মৃত্যুর পূর্বে বা পরে তার বন্ধুর সাথে দেখা করতে গেছে। এখন বন্ধুটি যদি লোকটির মৃত্যু-খবর না জানে অথবা জানে না যে সে দূর দেশে থাকে, তাহলে এই সূক্ষ্ম শরীরের দর্শনকে একেবারে স্থূল দেহের সাথে সাক্ষাৎ হল বলে ভুল করবে। এ রকম বহু সাক্ষ্য, প্রমাণ পাওয়া গেছে। Stephen Philips আমার কবি-ভাইকে বলে যে তার মা মৃত্যুর সময় তার সাথে দেখা করতে আসেন। তবে এটা আমার ভাইএর গল্প, কতদূর সত্য বলা মুস্কিল। সে ছিল কল্পনাবিলাসী, আবার Oscar Wildeএর বন্ধু। (হাস্য)

Telepathyতে নাকি একজনের মনের চিন্তা (idea) অন্যের কাছে পাঠান হয়। কিন্তু এখানে যে মনই শুধু তার আকার (form) বা ছাঁচ (cast) তৈরী করে পাঠিয়েছে এমন বলা চলা না, সূক্ষ্মপ্রাণ ও শরীরের অংশও তার সাথে রূপ গ্রহণ (materialise) করে।

পুরাণী : Brunton তাঁর বইতে লিখেছেন যে বহু পূর্বে মৃত ও mummyকৃত এক মিশরীর সাথে তাঁর দেখা ও আলাপ হয়।

শ্রীঅরবিন্দ : আলাপের পর লোকটির কি হল ?

পুরাণী : সে নাকি পাহাড়ের দিকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

শ্রীঅরবিন্দ : তাহলে কিছুই প্রমাণ হয় না। মিশরীদের বিশ্বাস মৃত্যুর সময় Ka অর্থাৎ প্রাণ-সত্তা শরীর থেকে বেরিয়ে আসে এবং শরীরটা বজায় রাখলে অনেক বছর পরে আবার তাতে সেটা ফিরে যেতে পারে। এই কিম্বদন্তী রয়েছে তাদের mummy করার মূলে। Brunton বোধ হয় এই বিশ্বাসকে বাস্তবরূপ (materialise) দিয়েছে। (হাস্য)

পুরাণী : তিনি এক মৃত চড়ুই পাখীকে বাঁচাবার কথাও উল্লেখ করেছেন।

নীরদ : বিশুদ্ধানন্দ সম্বন্ধেও তিনি এই গল্প লিখেছেন। চড়ুইটা নাকি বিশুদ্ধানন্দের সামনেই মারা হয় এবং তিনি পুনরায় সেটিকে বাঁচান। সম্ভব কি ?

শ্রীঅরবিন্দ : খুবই সম্ভব। তোমরা কি নেহাৎ শারীরিক পদ্ধতিতে সদ্য বা কিছুক্ষণ আগে ডুবে-মরা মানুষকে পুনরায় বাঁচাও না ? এখানেও তা সম্ভব ; অবশ্য কি করে প্রাণশক্তি ফিরিয়ে আনতে হয়, তা জানা চাই। এখানে দুটো উপায় আছে ; একটা হল, তার আত্মা (Spirit) বেশীদূর চলে যাবার আগেই তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা।

দ্বিতীয়টি হল জন্ম নিতে চায় এমন কোন একটি আত্মাকে মৃত শরীরের ভিতর ঢুকিয়ে দেওয়া।

এই সময় মা এলেন হাতে একটা টেলিগ্রাম নিয়ে। টেলিগ্রামের একটা কথা নিয়ে অর্থের গোলমাল হয়েছে। মেয়ের বিয়েতে কে ashes (ছাই) চেয়েছে!

পুরাণী : নিশ্চয় ashishকে (আশীষ) ashes করেছে টেলিগ্রাফ অফিসে।

শ্রীঅরবিন্দ : ওঃ! আমি ভাবলাম আমি কি মাথায় ভস্ম বয়ে বেড়াচিছ?

এখানে মূলশঙ্কর টেলিগ্রাফ অফিসের আর একটি হাস্যকর ভুলের দৃষ্টান্ত দিল। **Nirod, Ashram** আলাদা আলাদা না লিখে তারা লেখে, **Nirodashram,** যেন ওটা এক কথায় একজনের নাম।

অতঃপর মা চলে গেলেন ধ্যানে। পরে শ্রীঅরবিন্দ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "নীরদ, কে একজন আমাদের বিরুদ্ধে বই লিখে, পরে ক্ষমা চায়। তার নাম কি জান?"

নীরদ : ক্ষমা? কে? অমুক?

শ্রীঅরবিন্দ : না। প'এর আত্মীয়।

নীরদ : হাঁ, হাঁ! মনে পড়েছে। তার বাবা। ভদ্রলোক আশ্রমের নাকি তীব্র সমালোচনা করেছেন?

শ্রীঅরবিন্দ : শুধু সমালোচনা? আমি নাকি লোকের টাকা আত্মসাৎ করছি। এই অভিযোগ অন্ততঃ কেউ বিশ্বাস করবে না। সবাই জানে দেশের জন্যে যে সব কিছু ত্যাগ করেছে, তার এতখানি পতন হতে পারে না।

নীরদ : আপনি বইটা পড়েছেন?

শ্রীঅরবিন্দ : চোখ বুলিয়েছি; আমায় একটা typed কপি

পাঠিয়েছিল। আধ ডজনের বেশী বিক্রী হয়েছে বলে ত আমার মনে হয়না। জান ত সে সব কিছু খুইয়ে বসেছে। এখন তার ছেলের কাছে নিজের ও স্ত্রীর ভরণপোষণ ভিক্ষা করছে।

পুরাণী বলল, গুজরাটেও কেউ কেউ আশ্রমের বিরুদ্ধে লিখছে।

শ্রীঅরবিন্দ : কিন্তু কেন? কি অপরাধে?

পুরাণী : তাদের অভিযোগ হল আমরা দেশের ও মানুষের প্রতি উদাসীন।

শ্রীঅরবিন্দ : কবে থেকে আশ্রমের পক্ষে এসব জিনিস কর্তব্য কর্ম বলে দাবী করা হচ্ছে?

পুরাণী : রামকৃষ্ণ মিশন, গান্ধি সেবাশ্রম সামাজিক ও রাজনৈতিক সেবা করছে কিনা!

শ্রীঅরবিন্দ : গান্ধি আশ্রম ত যোগাশ্রম নয়, ওখানকার উদ্দেশ্য হল কোন কাজের জন্যে তৈরী হওয়া। ওটাই কি নিন্দার সত্যিকারের কারণ, না, আমি দেশের কাজ করা ছেড়ে দিয়েছি বলে?

পুরাণী : শেষের কারণই বোধ হয়।

নীরদ : সুভাষ বোস ত একই কারণে আশ্রমের বিরুদ্ধে।

শ্রীঅরবিন্দ : কোন কারণে?

নীরদ : অমুককে তিনি বলেন যে উৎকৃষ্ট লোক যারা তারা সবাই আশ্রমে চলে আসছে।

শ্রীঅরবিন্দ : অমুক কি তাদের একজন?

নীরদ : শ্রেষ্ঠ না বললেও বলেছেন তিনি ভাল লোক। তাঁকে হারিয়ে বোস খুব মর্মাহত।

শ্রীঅরবিন্দ : কিন্তু সে ত রাজনৈতিক দলের নয়, সে ত গায়ক।

নীরদ : গায়ক হলেও বোসের মতে ডাক পড়লে তাঁকে দেশের জন্যে সব কিছু ত্যাগ করতে হবে।

শ্রীঅরবিন্দ : বটে ? আর ভগবানের জন্যে ডাক পড়লে সে সব কিছু ত্যাগ করতে পারে না ?

পুরাণী : সব ত্যাগ করা মানে জেলে যাওয়া, নয় কি ?

শ্রীঅরবিন্দ : জেল ? (মাথা নেড়ে উপর দিকে তাকিয়ে) সে জেলে গেছে এটা আমি ভাবতেই পারি না। (হাস্য)

পুরাণী : দুটোতে মোটেই খাপ খায় না।

সত্যেন্দ্র : হয়ত মুক্তি পেয়ে সে জেলজীবন সম্বন্ধে কোন নভেল লিখতে পারত।

শ্রীঅরবিন্দ : কতগুলো জিনিষ আছে, যেগুলো ভয়ানক বেমানান ও বেমিল, তবুও ঘটে। Oscar Wilde-এর জেলে যাওয়া ভাবতে পার ? তবুও সেটা ঘটল। তাতে একমাত্র লাভ হল, সে অমর বই লিখল—De Profundis. ফরাসীরা তার জেলের কথা শুনে বলল, "ইংরেজরা একেবারে আহাম্মক !" (comme ils sont bêtes !)

গান্ধি আন্দোলনের সময় কেউ নাকি অবনীন্দ্রনাথকে ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়ে রাজনীতিতে যোগ দিতে বলেন। তিনি উত্তরে বললেন, "কেন, শিল্প কি দেশের সেবা নয় ? আমি অন্ততঃ একজন ভাল শিল্পী, সেটা ছেড়ে হতে যাবো একজন মন্দ রাজনৈতিক কর্মী ?"

এখন পুরাণী বরোদার প্রসঙ্গ তুলল, সেখানে ষ্টেশনের কাছে কি রকম নূতন ঘরবাড়ী তৈরী হয়েছে ইত্যাদি।

শ্রীঅরবিন্দ : (কিছুক্ষণ থেমে) বরোদার কথায় আমায় মনে করিয়ে দেয় Gaekwar-এর সাথে আমার প্রথম সংযোগ। মাঝে মাঝে

জীবনের সমস্যাগুলির কি করে যে আপনা আপনি সমাধান হয়ে যায় ভাবতে অবাক লাগে। I.C.S.এর পর আমি যখন চাকরী খুঁজছি তখন Gaekwar লণ্ডনে। আমার মনে নেই তিনিই কি প্রথমে আমাদের ডাকেন, না আমরা যাই তাঁর সাথে দেখা করতে। কত মাইনে চাওয়া উচিত সে বিষয়ে আমরা একজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিই, যেহেতু সে সম্বন্ধে আমরা ছিলুম একেবারে আনাড়ী। তিনি বললেন দু'শ টাকা চাইতে; তাতে রাজী না হলে ১৩০ টাকা পেলেও গ্রহণ করা উচিত, কারণ ১৩০ টাকা বেশ ভাল বেতন। ভদ্রলোক বোধহয় পাউণ্ডের হারে হিসাব করে দেখছিলেন। ১৩ টাকা করে পাউণ্ড ছিল তখন। তাহলে ১০ পাউণ্ড তাঁর মতে বেশ ভালই। J. Cotton ও আমার বড় ভাই, এরাই কথাবার্তা চালাচ্ছিল। পরে শুনলাম, Gaekwar গর্ব করেছিলেন যে তিনি একটা দাঁও মেরেছেন, ২০০ টাকা বেতনে পেয়েছেন একজন সিভিলিয়ান!

নীরদ: আপনাদের মাসিক খরচ কি রকম ছিল?

শ্রীঅরবিন্দ: পাঁচ পাউণ্ড। সেকালে যথেষ্ট। এখন কত?

নীরদ: এডিনবরায় নেহাৎ কমপক্ষে ১০ পাউণ্ড।

শ্রীঅরবিন্দ: আমাদের Landlady ছিল দেবতা। খুব সহিষ্ণু, কখনও তার পাওনা চাইত না। মাসাবধি আমরা পাওনা দিইনি। কি করে যে সে চালাত জানি না। পরে আমার I.C.S. বৃত্তি থেকে তার ধার শোধ করি। তার বাড়ী ছিল Somerset-এ; লণ্ডনে Landladyগিরি ছিল তার জীবিকা। আরও একটি Landlady-র কাছে ছিলাম, সেও খুব ভাল লোক ছিল।

তোমাদের বলেছি যে I.C.S. চাকরী না পাওয়ায় বাবা ভয়ানক

মর্মাহত হন। তিনি আগে থেকেই Sir Henry Cotton-এর সাথে মিলে আমার জন্যে সব বন্দোবস্ত করেছিলেন। আরাতে (Arrah) আমার পোষ্ট করা হবে, আরা নাকি চমৎকার জায়গা, Sir H. Cotton-এর কাছেই। তাঁর উপর আমার দেখাশোনার ভার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু Civil Service-এ যোগ দিলে আমার কি অবস্থা হত জানি না। হয়ত আলস্য ও বকেয়া কাজের জন্যে আমায় নোটিশ দিত।

এখন আবার নূতন প্রসঙ্গ সুরু হল। শ্রীঅরবিন্দ পুরাণীকে জিজ্ঞেস করলেন, "গান্ধির নিরস্ত্রীকরণ (demilitarisation) সম্বন্ধে ত দেশে খুব আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না?"

পুরাণী: না। নানাসাহেবও সেদিন বরোদা যুবসম্মিলনীতে তীব্র সমালোচনা করেছেন। আপনি তাঁকে চেনেন?

শ্রীঅরবিন্দ: চিনি বই কি। খুব ভাল করে চিনি। সে, মাধবরাও আর আমি তিনজনে মিলে প্রথম বিপ্লবী সঙ্ঘ গড়লাম, ব্রিটিশ শক্তিকে তাড়াবার উদ্দেশ্যে। গান্ধি সীমান্ত-পাঠানদের নিরস্ত্র করতে পেরেছেন?

পুরাণী: গান্ধি যখন সেখানে গেলেন, তাঁর জন্যে অস্ত্রধারী স্বেচ্ছাসেবকরক্ষী রাখার বিরুদ্ধে তিনি ভয়ানক আপত্তি তুললেন।

শ্রীঅরবিন্দ: ধর, যদি কোন সংঘর্ষ হত, তবে তারা কি করত? শুধু দাঁড়িয়ে থাকত?

পুরাণী: না। অহিংস প্রতিরোধ দ্বারা তারা মৃত্যু বরণ করত।

শ্রীঅরবিন্দ: এই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ব্যাপারটি আমার মোটেই বোধগম্য নয়। যদি বল মন্দের (Evil) বিরুদ্ধে কিছুতেই লড়বে না,

আমি তা বুঝতে পারি, খৃষ্টানেরা যেমন বলে মন্দকে বাধা দিও না (Resist not evil)। বাধা না দেওয়ায় তোমার মৃত্যু হতে পারে এবং পরিণাম ফল ভগবৎপ্রেরিত বলে মনে শান্তিও পেতে পাব, কিন্তু নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের দ্বারা বিপক্ষের হৃদয় পরিবর্তন করবে, এটা আমার পক্ষে বোঝা কঠিন।

পুরাণী: **Modern Review**-এর সাথে আমি একমত যে এই উপায়ে মন্দকেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে এবং তারই জয়জয়কার হবে, এতে গুণ্ডার হৃদয় জয় করার আশা বাতুলতা।

শ্রীঅরবিন্দ: ঠিকই। গান্ধি করছেন কি, আধ্যাত্মিক এলাকার যে বিষয় তাকে প্রয়োগ করতে চাচ্ছেন সাধারণ জীবনের ক্ষেত্রে। অহিংসা তোমার ব্যক্তিগত জীবনের আদর্শ হতে পারে এবং তা আধ্যাত্মিক ধর্ম হিসাবে পালন করতে পার, সেটা বেশ বুঝতে পারি; তার নজিরও রয়েছে। তা কেউ পুরোপুরি মানতে না পারলেও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তার ভিত্তি। কিন্তু তাকে সাধারণের ব্যাপারে প্রয়োগ করা বাতুলতা। গান্ধি ইউরোপের মতো ভুলে যাচ্ছেন যে অধিকার-ভেদ ও অবস্থা-ভেদ বলে কোন জিনিষ আছে।

পুরাণী: গান্ধির যুক্তি হল, উভয় ক্ষেত্রেই তোমায় মরতে হবে। কিন্তু সশস্ত্র মরলে তুমি হত্যাকাণ্ডকে অমর করে রাখবে।

শ্রীঅরবিন্দ: আর অপরক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকে অমর করবে। (হাস্য)

তত্ত্ব হিসাবে যে এর মূল্য আছে তা আমি মোটেই অস্বীকার করছি না। শুধু তাই নয়, বিস্তৃতভাবে এ নীতি ঠিকমত প্রয়োগ করলে সাফল্যও সম্ভব, বিশেষ করে নিরস্ত্র ভারতবাসীর দ্বারা। এই নীতি

সমর্থন করা যায় এইজন্যে যে তুমি নিরস্ত্র বলে তোমার অন্য গতি নেই। কিন্তু সফল হলেও তার কারণ হল তুমি বিপক্ষের শাসনযন্ত্র একেবারে অচল করে দিয়েছ, এই জন্যে মোটেই তার হৃদয় পরিবর্তন করেছ বলে নয়। আয়ারল্যাণ্ডে ঠিক তাই ঘটেছিল। অবশ্য হাতিয়ারও তাদের ছিল, কিন্তু একই সাথে এই নিষ্ক্রিয় যুদ্ধ না চালালে তাদের আন্দোলন ব্যর্থ হত।

গান্ধির রোগ হল তিনি চান তাঁর নীতিতত্ত্বগুলি সর্বসাধারণের মাঝে চালাতে। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধই বল, কি চরকা বা চিরকৌমার্যই বল, সকলকে তা পালন করতে হবে। সূতা না কাটলে কংগ্রেসের মেম্বর হতে পারবে না। তাঁর অনুচরদের মাঝে ক'জন সেটা মানে?

পুরাণী সে সর্ত এখন তুলে নেওয়া হয়েছে। কেউ সেটা আন্তরিকভাবে পালন করেনি।

শ্রীঅরবিন্দ সেটা আশা করাই ভুল। আমায় যদি সূতো কাটতে বলা হত, আমি একেবারে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধী হয়ে বসতাম। অবনীন্দ্রনাথ কি করতেন কে জানে।

পুরাণী নন্দলাল বোস নাকি সূতো কাটছিলেন?

শ্রীঅরবিন্দ নন্দলালের মাঝে একটা তপস্যার (ascetic) ভাব নেই কি? কারও মতে গীতার চক্র নাকি গান্ধির চরকার সামিল!

১৭।১।৩৯

সত্যেন্দ্র পাগল হরনাথ ও তাঁর স্ত্রীর কয়েকটা ফটো দেখাল শ্রীঅরবিন্দকে। স্ত্রীর একটি ছবির নীচে লেখা রয়েছে যে তিনি আদ্যাশক্তি এবং তাঁর বিভিন্ন শক্তির একজন হলো হরনাথ।

শ্রীঅরবিন্দ : ওটা ত তান্ত্রিক মত।

সত্যেন্দ্র : কিন্তু তিনি যে বৈষ্ণব।

শ্রীঅরবিন্দ : হতে পারে কিন্তু ওটা বৈষ্ণবমত নয়, তান্ত্রিক মতই। তত্ত্ব হিসাবে মতটি ঠিকই, কেন না আদ্যাশক্তি হল ভাগবত চেতনা এবং সমস্ত দেবতাদের তিনিই জননী। তাদের শাস্ত্রমতে তাঁর শক্তি বিনা শিবও কাজ করতে অক্ষম।

সত্যেন্দ্র সংক্ষেপে হরনাথের জীবনকাহিনী বর্ণনা করল এবং কাশ্মীরে কি করে তাঁর শরীরের রং বদলে যায় তাও উল্লেখ করল। শিষ্যদের মতে তিনি গৌরাঙ্গের দর্শন লাভ করেন এবং তাঁর কাছ থেকে **'mission'** পান। পরবর্তী শিষ্যরা তাঁকে গৌরাঙ্গের সমান মনে করেন।

শ্রীঅরবিন্দ : কিন্তু এতে তো কোন বিরোধ নেই। চেতনা যদি শেষপর্যন্ত ও মূলত, ভাগবত চেতনাই হয়, তাহলে উভয়ের চেতনা এক হওয়ায় আপত্তি কিসে?

সত্যেন্দ্র : তারা প্রমাণ করতে চায় যে তিনি গৌরাঙ্গের সমান বড় অবতার।

শ্রীঅরবিন্দ : ওঃ, অবতারত্বের জন্য প্রতিযোগিতা? কিন্তু হরনাথ কি নিজেকে অবতার বলতেন?

সত্যেন্দ্র : না, স্যার। কিন্তু তাঁর চালচলনে সেটা প্রকাশ পেত।

শ্রীঅরবিন্দ : গৌরাঙ্গকে বলা হয় কৃষ্ণের অবতার, আর কৃষ্ণ হলেন বিষ্ণুর অবতার। সুতরাং দুজনেই বিষ্ণুর অবতার : ঝগড়ার কারণ কি তাহলে?

সত্যেন্দ্র : যারা হরনাথের সংস্পর্শে এসেছে, তাদের দ্রুত উন্নতি দেখা গেছে।

শ্রীঅরবিন্দ বৈষ্ণব ভক্তিপথে খুব দ্রুত ও প্রবল উন্নতি হয় আমি লক্ষ্য করেছি।

সত্যেন্দ্র গুজরাটে এক শ্রেণীর সাধু আছে তারা নিরাকার ঈশ্বরকে ভক্তি ও পূজা করে।

শ্রীঅরবিন্দ নিরাকার ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি?

সত্যেন্দ্র কোন সাকার ঈশ্বরের প্রতি তাদের কোন ভক্তি নেই, কিন্তু যে ঈশ্বর সর্বত্র ও সকল রূপের অতীত তিনিই তাদের উপাস্য। কবীর ও অন্যান্য সাধুরা এই পন্থী। যদি তারা কোন নাম জপ করে, সে নাম ব্যক্তিবিশেষে আবদ্ধ নয়। তারা বলবে 'রাম' কিন্তু তাতে রামের বিভিন্ন প্রকাশ নিহিত থাকবে যেমন দাশরথি রাম, অন্তর্যামী রাম বিশ্বব্যাপী ও বিশ্বাতীত রাম।

পুরাণী তার মানে যিনি বিশ্বাতীত।

শ্রীঅরবিন্দ তাই সর্বোত্তম পরাৎপর। গীতায় যাঁকে বলা হয়েছে বাসুদেব, যিনি আছেন সর্বভূতে যিনি আবার পরাৎপর। দুইই এক বস্তু।

নিরাকার ঈশ্বরের প্রতি যে ভক্তি পরিবর্তনের পক্ষে সেটা তত শক্তিমান হবে না। সেটা হবে সূক্ষ্ম অবাস্তব (etherialised)। আর ভক্তির সাথে জ্ঞানের সমন্বয় থাকবে না। জ্ঞানের চাইতে ভক্তির ভাবই প্রবল হবে বেশি।

সত্যেন্দ্র আমি কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই দুয়ের সমন্বয় দেখেছি।

শ্রীঅরবিন্দ আমি ত বিশেষ ক্ষেত্রের কথা বলছি না।

সত্যেন্দ্র আমরা শুনেছি যে শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে সাহায্য করেছেন, পথ দেখিয়েছেন। কিন্তু কোন কৃষ্ণ, বৃন্দাবনের কৃষ্ণ, না কুরুক্ষেত্রের?

শ্রীঅরবিন্দ : আমার ত মনে হয় কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ। আলিপুর জেলে আমার কৃষ্ণ-কালীর অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সে কী তেজোদৃপ্ত দর্শন (vision) !

পুরাণী : কৃষ্ণের নানা ব্যক্তিরূপ নিয়ে এই যে ভেদাভেদ এগুলো কি পরবর্তী কালের ধারণা নয়, অর্থাৎ পরবর্তী বৈষ্ণব ধর্মের ?

শ্রীঅরবিন্দ : হাঁ, তাদের চোখে বালগোপাল হল আনন্দের বা আনন্দ-চেতনার প্রকাশ, কিন্তু অন্যরা, যারা প্রাচীন বৈষ্ণব, তাদের কাছে কৃষ্ণ হল বিষ্ণুর অবতার। তারাও ত বৈষ্ণব।

সত্যেন্দ্র : কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণই ত গীতা শুনিয়েছিলেন ?

শ্রীঅরবিন্দ : সে কৃষ্ণ হল বিষ্ণুর প্রকাশ। বিষ্ণুপুরাণে তাঁর সমস্ত রূপের চমৎকার বর্ণনা আছে। ওই পুরাণটাই আমি যত্ন করে পড়েছি। জানি না ওটা তেমন সমাদর লাভ করেনি কেন, অপূর্ব তার কবিত্ব! বেশ মজার গল্পও আছে, যেমন শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করছে, রাজা হাতীর উপর চড়েছে, না হাতী চড়েছে রাজার উপর ? গুরু তখন এক লাফে শিষ্যের কাঁধের উপর চড়ে বলল, 'এখন আমি তোমার উপর, না তুমি আমার উপর ?' (হাস্য)

সত্যেন্দ্র : জড়ভরতের বর্ণনাটাও বেশ সুন্দর। কিন্তু জড়ভরত বলে কেউ ছিল কি ?

শ্রীঅরবিন্দ : জানি না। তবে পুরাণের বর্ণনানুসারে মনে হয় খুব সত্য। পুরাণ ভয়ানক বৌদ্ধবিরোধী।

সত্যেন্দ্র : তাহলে পুরাণ অনেক পরের লেখা।

পুরাণী : বুদ্ধের জন্ম হল খ্রীঃ পূঃ ৫৫০-এ।

শ্রীঅরবিন্দ : তত সোজা নয়। বাস্তবপক্ষে পুরাণগুলির রচনা

হল বৌদ্ধধর্মের পরে। গুপ্তবংশের সময় যখন বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্যধর্ম জেগে উঠল, এই পুরাণগুলি হল তারই একটা কীর্তি।

পুরাণী : তৃতীয় কি চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দে লেখা বলে অনুমান।

শ্রীঅরবিন্দ : সম্ভব। এই বিষ্ণুপুরাণে বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলে গণ্য করা হয়েছে এবং বুদ্ধের আগমন হল অসুরদের প্রতারিত করবার জন্য। তাঁকে মায়ামোহ নাম দেওয়া হয়েছে, বুদ্ধ নয়। পুরাণের এক জায়গায় রয়েছে 'বুদ্ধস্য, বুদ্ধস্য', এটা বুদ্ধ ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।

সত্যেন্দ্র : তন্ত্র নাকি বেদের সমসাময়িক ?

শ্রীঅরবিন্দ : তন্ত্রের তত্ত্বগুলি বেদের যুগের হতে পারে কিন্তু তন্ত্র বলে যা আমরা জানি সেগুলো পরের রচনা।

পুরাণী : ভারতবর্ষে বেদকে চরম প্রমাণ বলে বিবেচনা করা হয় বলে সব কিছুরই উৎপত্তি খোঁজা হয় বেদে।

শ্রীঅরবিন্দ : প্রাচীনত্বের প্রতি এত মোহ কেন ? সত্য হল সত্য, তাতে কালবিচার কেন ?

সত্যেন্দ্র : বেদকে ত সনাতন বলা হয়।

শ্রীঅরবিন্দ : তার অনুপ্রেরণার উৎস (inspiration) সনাতন বলে।

সত্যেন্দ্র : কে একজন বলেছে যে আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়কেন্দ্রে রয়েছে সনাতন বেদ।

পুরাণী : তুমি গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করছ ? (হাস্য)

শ্রীঅরবিন্দ : উপনিষদ এল বেদের পরে। বেদের সত্যগুলিকে সরল ভাষায় সেখানে লেখা হল, বেদের ভাষা হল রূপক। উপনিষদ

বেদের সমান শ্রেষ্ঠ। বেদের নানা অংশ পড়লে বুঝা যায় যে সেখানে বেদান্তের সত্য নিহিত রয়েছে, অথচ আশ্চর্য যে তার অর্থগুলি তখন ধরা পড়েনি। যেমন, বেদ বলছে সত্য সত্যের দ্বারা আবৃত রয়েছে, অথবা 'সেই এক, যিনি সব কিছুর উৎস'। এখানে পরিষ্কার বেদান্তের সত্যের উল্লেখ করছে। তেমনি উপনিষদে পাওয়া যায় বেদের রূপক, যেমন সূর্য, অগ্নি, কিন্তু তার অর্থ একেবারে রূপক।

সত্যেন্দ্র: পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ভাবতে পারেনা যে সেই আদিম কালে বৈদিক ঋষিরা এত উন্নত ছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ: তাই। তারা ঐতিহাসিক ব্যাখ্যায় এত তুষ্ট যে অন্য কোন অর্থ খুঁজে দেখবার আগ্রহ হয়নি, অথচ তার বহু পরিষ্কার ইঙ্গিত রয়েছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এসব তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সাংঘাতিক গুলিয়ে দেয়। কিন্তু সবচেয়ে চমৎকার ব্যাখ্যা কি জান? দেবতারা নাকি সব বাষ্প, গ্যাস! কী অদ্বিতীয় উদ্ভাবনীশক্তি! বাহবা দিতে হয়!

পুরাণী: সেই ভদ্রলোকটি মহীশূরের, আমার মনে আছে। দীর্ঘতমার ঋক্ ত এখনও পাশ্চাত্য পণ্ডিতের বুদ্ধিগম্য নয়।

শ্রীঅরবিন্দ: রূপকগুলির চাবি জানা না থাকলে ত বোঝা বা অনুবাদ সোজা নয়।

পুরাণী: অনেকগুলি ঋকে গাভীর বৃহত্তম বা উচ্চতম পদক্ষেপের উল্লেখ পাওয়া যায়।

শ্রীঅরবিন্দ: ওটা ত পরিষ্কার রূপক। সবাই জানে যে গাভী হল ভাগবত আলো ও চেতনার প্রতীক: আর উচ্চতম পদক্ষেপ হল তারই উচ্চতম ধাপ।

পুরাণী: দীর্ঘতমা আমার কাছেও ধাঁধা লাগে, যদিও তাঁর কতগুলি ঋকের রূপক অর্থ বেশ প্রাঞ্জল।

শ্রীঅরবিন্দ: তাঁর নাম সার্থক করেছেন—দীর্ঘ-তমঃ (long in darkness)

পুরাণী: সরস্বতী সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধে পড়েছি যে সরস্বতী হল একটি নদী, বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে তার স্রোত। আর একটা প্রবন্ধের মতে সরস্বতী রাজপুতানার উপর দিয়ে গিয়ে পড়েছে Cambayতে।

শ্রীঅরবিন্দ: কি? সরস্বতী বঙ্গোপসাগর থেকে গিয়ে পড়ল কাম্বেতে? প্রেরণা নেহাৎ উদ্দাম না হলে এ ধরনের কল্পনা সম্ভব নয়।

পুরাণী: আমি দেখাতে চেষ্টা করলাম যে বেদের সরস্বতী হল প্রেরণার (inspiration) স্রোত, নদী নয়। ঋষি নদীদের অনুরোধ করছেন যেন তাদের জল কমে যায় এবং সে অনুরোধ তারা শুনল।

শ্রীঅরবিন্দ: সূর্য, জ্ঞান, আলো ইত্যাদি বস্তু বয়ে নিয়ে যাচ্ছে এই সমস্ত ভৌগোলিক নদী? অদ্ভুত নদী বলতে হবে তাহলে।

পুরাণী: আপনার মনে আছে কে এক মাদ্রাজী প্রমাণ করতে চেষ্টা করে যে যীশু তামিল?

শ্রীঅরবিন্দ: আছে বই কি? আর তামিলেরা হল ইহুদী! এখন জার্মানরা বলছে যে যীশু হল জার্মান।

পুরাণী: কি করে? Ludendroff ত খ্রীষ্টানধর্ম ছেড়ে দিয়ে পুরোনো Norse ধর্মে ফিরে যেতে চায়।

শ্রীঅরবিন্দ: তার কারণ যীশুকে অন্যান্য কারণে তাদের সুবিধার

মনে হচ্ছে না। তুর্কীরাও স্বাধীনতার পর পুরোনো তুর্কী জীবনের দিকে ফিরে যেতে চাইল। কামাল পাশাই মুসলমান ধর্মকে দিলেন নূতন রূপ, হাল আমলের করে তুললেন।

নীরদ: বেচারা আমানুল্লা কামালের নকল করতে গিয়ে সব খোয়াল।

শ্রীঅরবিন্দ: দুর্বল সবলকে নকল করতে গেলে এই দশাই হয়ে থাকে। কামাল হলেন তর্কীর মুক্তিদাতা, তাঁব পেছনে রয়েছে সমস্ত সৈন্য।

পুরাণী: ভারতীয় মুসলমানেরা কামালের প্রশংসা করে বটে কিন্তু তাঁর জীবন আদর্শ, তাঁর সমাজ-সংস্কার গ্রহণ করে না।

শ্রীঅরবিন্দ: তিনি ত নমাজ তুলে দিয়েছেন; আর মসজিদে ঢোকা হয় জুতো পরে'।

পুরাণী: ইউরোপ সম্বন্ধে আমার একটা প্রশ্ন আছে। আপনি সেদিন শক্তির উপপ্লবের (inrush) কথা বলেছিলেন। বলা যায় কি যে ফরাসী বিদ্রোহের প্রথম থেকে নেপোলিয়ানের সময় পর্যন্ত এরকম একটা শক্তির প্রবাহ নেমেছিল যার ফলে ইতিহাসের ধারা বদলে গেল?

শ্রীঅরবিন্দ: হাঁ, নেমেছিল বৈ কি! তাতেই পাশ্চাত্য ইতিহাস বদলে গেল এবং এল নূতন রাজনৈতিক ও সামাজিক আইডিয়া।

নীরদ: Aldous Huxleyর মতে নেপোলিয়ান, সীজার এরা হলেন ডাকাত।

শ্রীঅরবিন্দ: বাজে!

নীরদ: আরও বলছেন যে ইউরোপের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য দুর্গতির কারণ হল নেপোলিয়ান।

পুরাণী : বাড়াবাড়ি!

শ্রীঅরবিন্দ : এতে বোঝা যাচ্ছে যে সে পাণ্ডিত্য ফলাচ্ছে। তাব মনের কোন নমনীয়তা নেই।

পুরাণী : আনাতোল ফ্রাঁস সাম্রাজ্যবাদী না হয়েও স্বীকার করছেন যে নেপোলিয়ান ফ্রাঁসকে দিয়েছেন গৌরব—

শ্রীঅরবিন্দ : শুধু কি গৌরব? দিয়েছেন শান্তি, শৃঙ্খলা, স্থায়ী শাসন ও নিরাপত্তা। তিনি কেবল একজন শ্রেষ্ঠ বিজয়ী বীর ছিলেন না, সেই সঙ্গে ছিলেন শ্রেষ্ঠ শাসক ও গঠনদক্ষ প্রতিভা; তাঁর সমকক্ষ পৃথিবীতে খুব বিরল। তিনি না থাকলে ফরাসী বিদ্রোহের গোটা আদর্শ ইউরোপীয় শক্তিদ্বারা নিষ্পেষিত হত। নেপোলিয়ানই সেই আদর্শের দৃঢ় পত্তন করেছেন।

একটি খুঁত, তাঁব যথেষ্ট সাহসের অভাব। তাঁর মনের গোপন বাসনা ছিল সমস্ত ইউরোপকে এক করা! তাঁর উচিত ছিল সেই আইডিয়াকে কার্যে পরিণত করা; তাহলে বর্তমান স্পেনের যুদ্ধের প্রয়োজন হত না, ইটালী অনেক আগে এক হত, আর জার্মানী হত আরও সভ্য। নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করাব পরিবর্তে যদি তিনি প্রথম কনসালই থাকতেন, তাহলে আরও সাফল্য লাভ করতেন। কিন্তু তিনি ত হিটলার ছিলেন না অর্থাৎ হিটলারীয় উপায় তিনি অবলম্বন করতে পারেননি। তাঁর পতনের পরও রাইনদেশের জার্মানরা তাঁর Code de Napoléon এবং তাঁর আইনকানুন ছাড়তে রাজী হয়নি।

সত্যেন্দ্র : কারও মতে তাঁর রাশিয়ার যুদ্ধে প্রমাণ হচ্ছে যে মিলিটারী প্রতিভা তাঁর ছিল না। টলষ্টয়ই তাঁর নভেলে নেপোলিয়ানকে হেয় করতে চেষ্টা করেছেন।

শ্রীঅরবিন্দ : ওটা হল উপন্যাস।

সত্যেন্দ্র : টলষ্টয় বলছেন মস্কোকে পোড়ান মারাত্মক ভুল হয়েছে।

শ্রীঅরবিন্দ : কিন্তু ইতিহাসের নজির অন্য রকম। রাশিয়ানরাই নাকি মস্কো জ্বালিয়ে দেয় নেপোলিয়ানকে বিপর্যস্ত করবার জন্য। তিনি রাশিয়া জয় করতে পারেন নি, কিন্তু মস্কো জয় করেছেন। এমন কি Leipzig-এ তাঁর পিছু হটা (retreat) মস্ত সামরিক প্রতিভার পরিচয় বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু এখন হাওয়া উল্টে গেছে কিনা, তাই তাঁর সামরিক প্রতিভাকে উড়িয়ে দেবার প্রবৃত্তি দেখা যায়। এমনও বলা হয় যে নেপোলিয়ান কিছু নয়, তাঁর সেনাপতিরাই হল আসল ধুরন্ধর। চেঙ্গিস খাঁ সম্বন্ধেও একই ধরনের মনোবৃত্তি দেখা যায়। সে নাকি একটি গলাকাটা! অথচ এই চেঙ্গিস খাঁই সমস্ত এশিয়ার ও ইউরোপের একাংশে শৃঙ্খলা ও নিয়ম এনেছে, তাদের সংহত রূপ দিয়েছে, যার ফলে ব্যবসাবাণিজ্য নিরাপদ হয়েছে। সে সফল হয়েছে এইজন্যে যে সমস্ত ব্যবসায়ীদের সে সাহায্য পেয়েছে, কেননা তাদের বিশেষ প্রয়োজন ছিল যে নদীর পাশে পাশে সমস্ত রাস্তাগুলি ব্যবসার জন্যে নিরাপদ হয়।

এটা ঠিক কথা যে শেষের দিকে নেপোলিয়ানের সামর্থ্যের হ্রাস হয় তাঁর অসুখের জন্যে।

নীরদ : অসুখটা নাকি Pituitory tumour, তাতে তাঁর মননশক্তি কমে যায়।

শ্রীঅরবিন্দ : ইতিহাসের মতে পেটের cancer। কিন্তু কে বলল যে তাঁর মননশক্তি লোপ পেয়েছে? ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার মননশক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। ওসব বাজে কথা।

নীরদ : আপনি সেদিন বাস্তবীকরণের (materialisation) কথা বলছিলেন। মৃত্যুর দশ বছর পরেও কি সেটা সম্ভব ?

শ্রীঅরবিন্দ : যদি আত্মা (spirit) এই পৃথিবীর পরিবেশ থেকে বহু দূরে গিয়ে না থাকে। সাধারণতঃ আত্মা নাকি তিন বছর পর্যন্ত কাছাকাছি থাকে। গুরুর শক্তি সূক্ষ্মশরীরকে অপেক্ষাকৃত সহজে বাস্তবরূপ দিতে পাবে। কখনও কখনও অন্য কোন শক্তিও নানা রূপ গ্রহণ কবতে পাবে।

১৮।১।৩৯

আজ শ্রীঅরবিন্দকে নেপোলিযান সম্বন্ধে Huxley-র মতটা পড়ে শোনান হল। বইটার নাম এখন মনে নাই। শোনার পর শ্রীঅরবিন্দ বললেন "একেবারে অসার নীতি বচন ছাড়া কিছু নয়। এদের যদি আমরা শ্রদ্ধা না করি, বলতে হবে যে মানুষের সামর্থ্য আর তার গুণ শ্রদ্ধার যোগ্য নয়। নেপোলিযান ও সীজারকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়, তারা 'সাফল্য' লাভ করেছে বলে নয়। প্রচুর লোক সফল হচ্ছে, অথচ শ্রদ্ধা পায়নি। সীজারই রোমসাম্রাজ্যের মহত্ত্ব পত্তন করেছে। আর সেই যুগটাই হল মানব-সভ্যতার একটা শ্রেষ্ঠ যুগ। নেপোলিয়ানের ছিল মস্ত সংগঠনের প্রতিভা (organiser)। তিনিই ত ফরাসীবিদ্রোহকে দৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড় করিয়েছেন। ফ্রান্সকে তিনি সুশৃঙ্খল বিধানে ব্যবস্থিত করেন এবং ফ্রান্সের সাহায্যে সমস্ত ইউরোপকে। তাঁর অপরিমেয় শক্তি ও সামর্থ্য—এগুলো বড় না হলে বড় কি ?

পুরাণী : মানুষ তাঁদের সম্মান করে এই জন্যে যে তাঁদের মাঝে আমাদের নিদ্রিত আত্মশক্তি পরিস্ফুট হয়েছে।

শ্রীঅরবিন্দ : অবশ্য। Huxley-র মতে এরা দুজনেই যেন পৃথিবীর প্রথম ডিকটেটার। তা ত নয়। পৃথিবীর জন্ম থেকে এই ডিকটেটারত্ব রয়েছে। কামাল, পিলসুর্ডস্কি, ষ্টালিন, বলকান রাজ্যের রাজাদের তাহলে কি বলবে? গান্ধিকে যদি স্বাধীন ভারতের গদীতে বসিয়ে দেওয়া হয়, দেখবে তিনিও ডিকটেটার হয়ে বসেছেন। আমার বাবাকেও বলতে পার রংপুর বা খুলনার ডিকটেটার। কালের প্রয়োজন অনুসারে দেখা দেয় ডিকটেটার। যখন মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে রেশারেশি প্রবল হয়ে ওঠে অথবা তারা বিরাট অরাজকতার মাঝে হাঁপিযে ওঠে তখন আসে ডিকটেটার, জাতিকে সেই নাগপাশ থেকে উদ্ধার কবে দেশে শান্তি নিয়ে আসবার জন্যে।

পুরাণী : আচ্ছা, বুদ্ধ ও যীশু ইত্যাদীব ক্ষেত্রেও কি আমরা বলতে পারি না যে সে সময় একটা শক্তি নেমেছিল?

শ্রীঅরবিন্দ : নিশ্চয়। এ হল একটা ঊর্ধ্বতর শক্তির অবতরণ। তা প্রথমতঃ একটি ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে, তারপর একটি সংঘে, শেষে তার কাজ ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত মানবজাতির মাঝে। মহম্মদের বেলায়— আঃ, এই ত আব একজন ডিকটেটার!—অবতরণটা জীবনে প্রকাশ পেয়েছে বিস্তৃতির দিকে, কিন্তু অবতরণ বহিঃপ্রকৃতিতে না হয়ে আভ্যন্তরীণ হতে পারে, সুরুতে। পরে আস্তে আস্তে অপর ব্যক্তিদের মাঝে ছড়ায়।

না, আমি ভাবছিলাম অন্য কথা। নেপোলিয়ান সম্বন্ধে Lasky-র মত। তিনি বলেছেন যে Jacobin-রাই রিপাবলিক বাঁচায়। অতি

সত্যি কথা। তাদের হাতে যদি শাসনক্ষমতা না থাকত, তাহলে জার্মানরা প্যারিসে ঢুকে গোড়াতেই রিপাবলিক ধ্বংস করে দিত সন্দেহ নেই এবং পুরোনো রাজত্বকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করত। এই Jacobinদের জন্যেই ত Bourbonরা যখন ফিরে এল Louis XVIIIএর অধীনে, তখন তারা নিয়মতান্ত্রিক শাসন স্বীকার করল এবং ইউরোপের সমস্ত রাজারা বাধ্য হল গণতন্ত্র মেনে নিতে।

একথা ঠিক যে নেপোলিয়ানের সময় গণসভা (assembly) ছিল শুধু নামে, কিন্তু পুরো রিপাবলিক গড়ে উঠতে যদিও প্রচুর সময় নিয়েছে, কার্যতঃ তখনই সেটার পত্তন হয়ে গেছে। পলিটিক্স কি জিনিষ? উপরের একটা সাজ বই ত নয়। সমাজের কতখানি প্রকৃত পরিবর্তন হল সেটাই হল আসল কথা। নেপোলিয়ান যেসমস্ত আইন-কানুন প্রচলন করেছেন সেগুলো এখনও চলছে। আইনের চোখে সকলেই সমান: ধনী গরীব, উচ্চ নীচ কোন ভেদাভেদ নেই—এটা ত নেপোলিয়ানই প্রথম প্রবর্তন করলেন। এখন সেটা খুবই স্বাভাবিক বলে মনে হয় কিন্তু তখন কতখানি বিপ্লবাত্মক ছিল ভেবে দেখ। বলতে পার সাধারণ প্রজাদের ডিমোক্রেটিক শাসন ত ছিল না; তা বটে কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীরাই ছিল সেই ডিমোক্রেসির শাসনকর্তা। নেপোলিয়ানের আইনগুলি এখনও তারা মেনে চলছে।

Huxley যেন বলতে চায় যে তখন দুটো সম্ভাবনা উপস্থিত ছিল: হয় যুদ্ধ অথবা সামরিক বলপ্রয়োগ, নয় অহিংস শান্তিময় পথে এগিয়ে যাওয়া কিন্তু জীবনের গতি ত সহজ, নিখুঁত ধারায় চলে না। নেপোলিয়ান যদি না থাকতেন, রিপাবলিক সুরুতেই ধ্বংস হত এবং ডিমোক্রেসীর আবির্ভাব পিছিয়ে যেত বহু বছর। না, বিশ্বপুরুষ (cosmic

spirit) এত কাঁচা কাজ করেন না। এত বোকা তিনি নন। কারলাইল অবস্থাটা বরং আঁচ করেছিলেন, তাই লিখেছেন, 'হয় আমি তোমায় হত্যা করি, নয় তুমি আমায় হত্যা কর। কাজেই তোমার হাতে মরার চাইতে তোমায় মারা বুদ্ধিমানের কাজ'।

পুরাণী: কিন্তু Huxley একথাও বলছেন যে যুদ্ধ অনিবার্য নয়।

শ্রীঅরবিন্দ: এই লোকগুলো যুদ্ধ অহিংসা ইত্যাদি সম্বন্ধে কথা বলতে গিয়ে সব গুলিয়ে ফেলে। যুদ্ধ অনিবার্য নয়! কি করে নয়? যতদিন পর্যন্ত অন্য একজন যুদ্ধ চাইছে, তুমি কি করে তা বন্ধ করবে? বন্ধ করবার উপায় হল যদি তুমি বিপক্ষের চাইতে বেশি শক্তিমান হতে পার। অথবা (হেসে) গান্ধির পথে—নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ দ্বারা বিপক্ষের হৃদয় পরিবর্তন করে'।

পুরাণী: (?) কিন্তু গান্ধিজীকেও স্বীকার করতে হয়েছে যে তিনি নিজে ছাড়া আর কেউ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বোঝেনি। সত্যাগ্রহের পক্ষে বড় আশার কথা নয়। বস্তুতঃ ওধরনের স্বীকারোক্তিতে সত্যাগ্রহেরই মর্যাদা হানি হল, তাকে আর আমাদের সমস্যার একমাত্র সমাধান বলে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। ভারতবর্ষের নানাজায়গায় তার যে রূপ প্রকাশ পেয়েছে, তাকে সত্যাগ্রহ বলব, না বলব দুরাগ্রহ?

শ্রীঅরবিন্দ: Huxley আর কি বলেছেন?

নীরদ: বলেছেন আধ্যাত্মিকতা—

শ্রীঅরবিন্দ: বেশ, কিন্তু আধ্যাত্মিকতা বললে ত হবে না। তাকে পাওয়ার পথ কি?

পুরাণী: বলছেন 'অনাসক্ত' (non-attached) আদর্শ পুরুষ চাই যারা নিঃস্বার্থভাবে পরের হিত করবে।

শ্রীঅরবিন্দ : অবশ্য ! অবশ্য ! কিন্তু তাকে পাওযার উপায় ? তাকে পেলেও 'আসক্ত' যারা, তারা এই 'অনাসক্তদের' মানবে কি করে ? আর অনাসক্ত পুরুষেরাই বা কিসের জোরে তাদের মত বা বিধান আসক্ত ব্যক্তিদের মেনে নিতে বাধ্য করবে ?

এখানে শ্রীঅরবিন্দ যে ভাবে একটার পর একটা **'how'** এবং প্রশ্নের পর প্রশ্নের বাণে আমাদের জর্জরিত করলেন, মনে হল আমরাই যেন **Huxley !**

তারপর বলে চললেন, ''এগুলো হল মন দিয়ে ভেবে বের করা প্রতীকার বা সমস্যার সমাধান। মন ত এপর্যন্ত মানুষের প্রকৃতির মূল পরিবর্তন সাধন করতে পারেনি। পারবেও না, যতদিন মন চিন্তার মধ্যে আবদ্ধ থাকবে এবং বুদ্ধিগত যুক্তিতত্ত্বের উপর নির্ভর করবে তার কর্মপ্রণালী। মন একটা আদর্শ গ্রহণ করে সেটাকে রূপায়িত করতে প্রয়াস পায় কিন্তু তার চেতনা মানসাতীত নয়। মন বুদ্ধি দিয়ে যত ইচ্ছা সমাজ, নীতিরীতি ইত্যাদি গড়, ভাঙো, বদলাও কিন্তু একদিন না একদিন দেখবে যে এদের ভেতর থেকে গলদ ফেটে বের হবে।

সত্যেন্দ্র : তাহলে সমাধান কোন পথে ?

শ্রীঅরবিন্দ : আমার মতে সমাধান আধ্যাত্মিক। তার লক্ষ্য হল মানবপ্রকৃতির সমস্ত ভিত্তিটাই বদলে দেওয়া। একদিনের বা কয়েক বছরের কাজ নয়। যতদিন আধ্যাত্মিকতা তোমার জীবনের ভিত্তি না হচ্ছে ততদিন কিছু হবে না।

সত্যেন্দ্র : অনেক যোগী পুরুষের ত আবির্ভাব হল, তাঁরা আমাদের জীবনের মোড় ফেরাতে চেষ্টা করলেনও কিন্তু কুকুরের লেজ ত তেমনি বাঁকা রইল।

শ্রীঅরবিন্দ : ঠিকই। তার কারণ আমি বলেছি যে আধ্যাত্মিকতায় মিথ্যার শক্তি প্রবেশ করে তাকে দূষিত করেছে। এই জন্যেই ত ধর্মের অবনতি। কি রকম হয় জান? এই শক্তিগুলো প্রথমে কোন নূতন জাগরণের পথে বাধা দিতে চেষ্টা করে; যখন হীনবীর্য হয়, তখন তারা তাদের কৌশল বদলায় এবং এই জাগরণে যোগ দেয়, কিন্তু মনে রেখো তাকে ভাঙবার, কলুষিত করবার উদ্দেশ্যে। খ্রীষ্টধর্মের দৃষ্টান্তই নাও না কেন? ধর্মের নামে এতখানি অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা আর হয়েছে কি? আবার এই ধর্মকেই কি কম অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে প্রথমে? শেষে সে প্রতিশোধ নিল। আমি জোর করে বলতে পারি যে খ্রীষ্টান শহীদ (martyrs) যারা ধর্মের জন্যে প্রাণ দিয়েছে, তাদের মাঝে একটা জিঘাংসার প্রবৃত্তি লুকিয়ে ছিল যে যদি তারা সুযোগ পায় তাহলে তাদের যন্ত্রণার শাস্তি সুদে আসলে উসুল করবে। আর, ক্ষমতা যখন পেল তাই করল। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ শেষে হল অত্যাচারের কাহিনী। প্রাণজগতের ময়লা মিশে যায় বলেই সমস্ত আন্দোলন দূষিত হয়ে ওঠে।

এই সত্য, লেনিনও এই সত্যের একটা আভাস পেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আমাদের আদর্শকে সম্পূর্ণ নির্দোষ রাখতে হবে। আমরা আমাদের ১৫০,০০০ কম্যুনিষ্ট মেম্বর নিয়ে যতদিন খাঁটি থাকতে পারি এবং আমাদের আদর্শে অটল থাকি, কোন বাধা আমাদের আটকাতে পারবে না।" যতদিন সে আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন, ততদিন কম্যুনিজম অদ্ভুত সাফল্যলাভ করেছে।

হিটলারও এই সত্যের আভাস পেয়েছে। যখন সে র-কে দুর্নীতির (immorality) অপরাধে হত্যা করল—যদিও তার অপরাধ

বহু আগে থেকেই সে জানত—সে নেহাৎ ভণ্ডামির পরিচয় দেয় নি। আবছাভাবে সে অনুভব করেছে যে জয়লাভ করতে হলে পার্টিকে শুদ্ধ নির্দোষ হতে হবে।

এই কারণে আমি চাই এমন এক শক্তি নামিয়ে আনতে যার নাম দিয়েছি ঋতচিৎ (Truth Consciousness)—যার সাথে প্রাণ-জগতের কোন ব্যবসাদারী বা নিম্নশক্তির কোন দফা রফা অসম্ভব। ঋতচিৎ অর্থে আমি বলছি সক্রিয় দিব্য চেতনা। সেই শক্তি জীবনের ক্ষুদ্রতম অংশের উপব এবং মানুষের প্রত্যেক কাজের উপর কর্তৃত্ব করবে। কথা হল সেটা পৃথিবীতে নামিয়ে আনা, এখানে তার ভিত্তি পত্তন করা এবং তাকে নিষ্কলুষ রাখা। কারণ মাধ্যাকর্ষণের মত নিম্নপ্রকৃতির বরাবর নীচের দিকে টানবার প্রবল শক্তি রয়েছে, কাজেই এমন শক্তি চাই যা তাকে শুধু প্রতিরোধ করবে না, জয় করবে।

সত্যেন্দ্র: সারা পৃথিবীতে কাজ করতে হলে যে অনেকদিন বসে থাকতে হবে!

শ্রীঅরবিন্দ: অবশ্য। কিন্তু প্রথমে মুষ্টিমেয় লোক চাই—বলতে পার পৃথিবীতে দেবজাতি। তারা সেই শক্তিকে ধারণ করবে এবং ঢেউয়ের মত পৃথিবীর উপর তাকে ছড়িয়ে দেবে। সেই কর্মশক্তির যখন দৃঢ় স্থাপনা হয়ে যাবে, তখন পৃথিবী ক্রমে ক্রমে সেদিকে মুখ ফিরাবে।

মানুষের প্রকৃতিকে বদলাবার পথে এই বিরাট বাধা দেখেই ত প্রতীকারস্বরূপ প্রচার করা হল বৈরাগ্য, সংসারত্যাগ। পরিবর্তন হবে না দেখে বলল 'তাকে খসতে দাও।' বিবেকানন্দ আখ্যা দিলেন, প্রকৃতি কুকুরের লেজ।

সত্যেন্দ্র : আশ্রমে কারও কারও মত যে যাদের আত্মা মুক্তি বা লয় পেয়েছে তাদেরও ফিরে আসতে হবে প্রকৃতিকে বদলাবার জন্যে।

শ্রীঅরবিন্দ : কেন আসতে হবে ?

সত্যেন্দ্র : অর্থাৎ তারা মনে করে যে শঙ্কর, বুদ্ধ ইত্যাদি যাঁদের লয় হয়েছে তাঁরা সত্যিকারের মুক্তি পাননি।

শ্রীঅরবিন্দ : তাঁরা আত্মার মুক্তি পেয়েছেন বই কি, সেটাই ত তাঁদের কাম্য ছিল।•

পুরাণী : প্রশ্নটা যদি এভাবে করা যায় তাঁদের এই যে লয়, সেটা কি ভাগবত ইচ্ছার (fiat) বিরুদ্ধে ?

শ্রীঅরবিন্দ : তা কেন ? তাঁদের অন্তর্যামী ভগবান যদি সে পথ নিয়ে থাকেন, তাহলে ত কোন প্রশ্ন থাকতে পারে না।

পুরাণী : তাঁদের প্রকৃতি কি লয় পেতে পারে ? তাঁদের মন, প্রাণ, দেহ-সত্তার কি গতি হবে ?

শ্রীঅরবিন্দ : 'তাঁদের প্রকৃতি' মানে কি ? একবার তাঁরা লয় পেলে তাঁদের 'প্রকৃতি' বলে ত কিছু থাকে না। প্রকৃতিও আপনি খসে পড়ে।

সত্যেন্দ্র : মানুষের আত্মা বা চৈত্যপুরুষ কি লয় পেতে পারে না ?

শ্রীঅরবিন্দ : বললাম ত, লয় যদি চাও, পেতে পার বই কি ! রূপান্তর চাও, কি লয় চাও সেটা তোমার বিবেচ্য, কিন্তু সৃষ্টি সম্বন্ধে আমার মত যদি মান, তাহলে ক্রমবিবর্তন মানতে হবে।

সত্যেন্দ্র : সমাধানটা বড় কঠিন, স্যার, অন্ততঃ আমার পক্ষে।

শ্রীঅরবিন্দ : মোটেই সহজ নয়। দুটো উপায় আছে। একটা হল, তামিল সাধু Nammalwar যেমন বলেছেন বিষ্ণু তাঁর সমস্ত দেবদেবতা নিয়ে নেমে আসবেন আর সারা পৃথিবী অধিকার করবেন।

অন্যটা আমার উপায়, মানুষকে ক্রমবিবর্তনে আমি যাকে বলি, দেবজাতিতে পরিণত করা। এই মানুষ-প্রকৃতি আর থাকবে না। হিন্দুমতে সমাধান হল যে কল্কি অবতার এসে সমস্ত ধ্বংস করে দেবে। সেটা অবশ্য সোজা কিন্তু কঠোর।

ভাগবত চেতনা নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে নিয়ে (involution) এই অচেতনে প্রবেশ করেছে। বাহ্যতঃ অচেতন হলেও তা মূলতঃ অতিচেতন (superconscient)। সেই অচেতন থেকে তার ক্রম-বিবর্তন চলেছে এবং রূপ নিচ্ছে তার বিভিন্ন অভিব্যক্তিতে (manifestation)। যদি কেউ এই ভাগবত অভিব্যক্তিতে অংশ নিতে না চায়, সেটা তার ইচ্ছা: তার উপর কোন জোর জবরদস্তি নেই। কেউ মহর্ষির সম্বন্ধে মাকে প্রশ্ন করলে, মা বলেন, 'মহর্ষির অন্তর্যামী যদি রূপান্তর না চায়, তাহলে সেটা তাঁর পক্ষে প্রয়োজন নয়।'

সত্যেন্দ্র: একজনের প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি বলেন 'আমার ভিতর সেরকম কোন সঙ্কল্প নেই।' আত্মার উপর ত জোর চলেনা, তাকে তার ভাগবত নির্দিষ্ট পথে চলতে দিতে হবে।

শ্রীঅরবিন্দ: সকলকে এই যোগ করতে হবে এমন কথা নেই। যদি কেউ মনে করে যে আমি তা চাই তাহলে ভুল হবে।

সত্যেন্দ্র: কারও কারও ধারণা যে বুদ্ধ, শঙ্করকেও আবার জন্ম নিতে হবে।

শ্রীঅরবিন্দ: তাঁরা যে জন্ম নেবেন না, এমন কথাও আমি বলি না, কিন্তু কোন বাধ্যবাধকতা নেই, রামকৃষ্ণ যেমন বলেছেন যে যারা ঈশ্বর-কোটি, তারা স্বচ্ছন্দে যাওয়াআসা করতে পারে। কাজেই এই যোগ সর্বসাধারণের জন্যে বললে ভুল হবে।

সত্যেন্দ্র: আপনার পথও শেষ পর্যন্ত একটা নূতন ধর্ম হয়ে না ওঠে! সে রকম লক্ষণ যেন দেখা যাচ্ছে।

শ্রীঅরবিন্দ: কিন্তু আমি মোটেই ধর্মস্থাপন করতে চাইনা। আমার দর্শনে আমি নূতন কথা কিছু বলিনি। বাস্তবপক্ষে, দার্শনিক প্রকৃতিই আমার নয়। র আমায় বললে, চল, সমস্ত জ্ঞানের একটা সমন্বয় করা যায় কিনা দেখি। আমি সায় দিলাম, বললাম 'বেশ ত সমন্বয় করা যাক।' আমার যোগাভ্যাসে যেরকম অভিজ্ঞতা আহরণ করেছি, সেগুলোই আমি লিপিবদ্ধ করেছি, তাতে চিন্তাপ্রসূত কিছু নাই। এমন কি সব জায়গায় সঙ্গতি রেখেছি কিনা, চিন্তাগুলো সুসম্বদ্ধ কিনা, তাও খুঁটিয়ে দেখিনি।

কেউ বলেছে যে Hegel-এর সাথে আমার অনেক মিল আছে, যেহেতু আমি 'সমন্বয়' কথাটা প্রয়োগ করেছি। আর তিনিও 'সমন্বয়' বিরোধ বিশ্লেষণ ইত্যাদি কথা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সত্যি বলছি, হেগেলের দর্শন সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নেই। পাশ্চাত্য দার্শনিক-দের লেখা সাংঘাতিক নীরস ও চিন্তাসর্বস্ব (mental)। মনের কসরৎ শুধু! 'বিচার কাকে বলে', 'বিচার (judgment) কাকে বলেনা' এই সমস্ত তত্ত্ব বের করতে তাদের দিন যায়। ফলটা কি দাঁড়াল, মনের খেলা ছাড়া? সত্য কি, তা জানবার বা তাকে পাবার আগ্রহ বা উদ্দেশ্য নাই।

এখন Platonism-এর চর্চা চলছে। প্লেটো মানুষ ও জীবন সম্বন্ধে যা ভেবেছেন এবং যে সব অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তাই লিখে গেছেন। আর একটা ধুয়া উঠেছে, Neo-Platonism. অধর দাস যখন আমার দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তাকে

অভিহিত করলেন, 'Aurobindoism' বলে, আমি একটা শক্ পেলাম, বলতেই হবে।

নীরদ উপায় কি? বেশ সরল ও উপযোগী কথা কিন্তু।

সত্যেন্দ্র আপনাকে সে উপাধি দেবার অধিকার আছে কেননা আপনি আচার্যদের পথ অনুসরণ করেছেন, বেদ উপনিষদ, গীতা ইত্যাদির ভাষ্য লিখে।

শ্রীঅরবিন্দ সেটা স্বীকার করছি।

সত্যেন্দ্র তাছাড়া প্রত্যেকেই মনে করছে যে আপনি তার মতবাদের স্বপক্ষে।

শ্রীঅরবিন্দ তাই। সেদিন নিম্বার্কের এক শিষ্য আমায় লিখেছে যে নিম্বার্কের দর্শনের সাথে আমার অনেক মিল। মধ্বাচার্যের শিষ্যরা পর্যন্ত বলছে যে আমি তাদের দলের একজন।

সত্যেন্দ্র কিন্তু একবার যদি আপনার দর্শন তারা মনোযোগ দিয়ে পড়ে তাহলে সকলে একসাথে আপনাকে আক্রমণ করবে।

শ্রীঅরবিন্দ আমি ত নূতন কিছু বলিনি। গীতার আমার কোন দর্শন অনুযায়ী ব্যাখ্যা করিনি ত। গীতার প্রকৃত অর্থ বলে যা আমার অভিজ্ঞতার আলোকে বুঝতে পেরেছি তাই ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছি মাত্র। তবে হ্যাঁ, নূতন যোগের পথ দেখিয়েছি, স্বীকার করছি।

দর্শনের উপর যে সব ভারতীয় টীকা লেখা হয়েছে, সেগুলো যে আমার খুব মনঃপূত বলতে পারি না। ভয়ানক পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও জাহিরিপনা বলে আমার ধারণা, কথার মারপ্যাঁচ, তর্কাতর্কি, শব্দ নিয়ে— আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাকে উড়িয়ে দিয়ে। যেমন রামানুজ এক জায়গায়

বলেছেন চেতনা বলে' কোন বস্তুই নেই এবং বিশুদ্ধ চৈতন্য (pure consciousness) কেউ উপলব্ধি করতে পারে না ! অদ্ভুত কথা !

সত্যেন্দ্র : আপনি যে কঠোপনিষদ অনুবাদ করেছিলেন, ভারী সুন্দর হয়েছিল। পরে আর ছাপা হয়নি কেন ?

শ্রীঅরবিন্দ : আমার অল্পবয়সে সেটা অনুবাদ করেছি। আমার উদ্দেশ্য ছিল অনুবাদে তার সাহিত্যিকগুণটা ফুটিযে তুলতে। কিন্তু এখন নানা অদলবদল দরকার।

সত্যেন্দ্র : সেখানে আপনি তিনটি নচিকেতা অগ্নির কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলো কি কি ?

শ্রীঅরবিন্দ : একটা হ'ল হৃৎকেন্দ্রে, একটি উপরে। তৃতীয়টির দুইপ্রান্ত জানা নেই ; শুধু মধ্যভাগটা জানা আছে। একটা আছে দেহে, প্রাণে ও মনে ভূঃ, ভূবঃ ও স্বর্ মনের উচচতম স্তর ব্যাপ্ত করে। আরও অনেক কিছু বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু এখন সব কিছু দোদুল্যমান অবস্থায়।

সত্যেন্দ্র : ঈশোপনিষদ লিখলেন কেন ?

শ্রীঅরবিন্দ : কেননা আমার সাধনা ও অভিজ্ঞতার সাথে সেটার সাদৃশ্য আছে।

সত্যেন্দ্র : কত পথই ত চেষ্টা করা হল। আমার বিশ্বাস প্রত্যেক পথেই কিছু না কিছু সত্য রয়েছে।

শ্রীঅরবিন্দ : কেন থাকবে না ? সবই ত এক সত্যের অংশ।

সত্যেন্দ্র : কিন্তু এখানে সাধকেরা যে রকম চরমপন্থী !

নীরদ : তার কারণ আমরা এখনও ঋতচিতের দেখা পাইনি।

শ্রীঅরবিন্দ : তাই !

১৯।১।৩৯

আজ আবার Dr. Rao এসেছেন এবং আবার তাঁব প্রিয় পুরাণো প্রসঙ্গটি তুলেছেন : কবে শ্রীঅববিন্দেব splint তুলে নেওয়া হবে? এ-কথা সে-কথাব পব তিনি বললেন যে সমস্ত অসুখই এক হিসাবে বলা যায় inflammation। তিনি চলে গেলে শ্রীঅরবিন্দ আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হিসাবে সমস্ত অসুখ inflammations?" আমার যথাসাধ্য ব্যাখ্যা কবলাম।

তারপর পুবাণী কালকেব বিষয উত্থাপন করল। Huxley-র Ends and Means থেকে পড়ে বলল, Huxley দুটো উপায় দেখাচেছন। একটা হল প্রচলিত শিক্ষা, কাবখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান-গুলি বদলান এবং সে-সবেব মাধ্যমে ব্যক্তির পরিবর্তন আনা। কাবখানাগুলিকে ছোট ছোট শাখায় বিভক্ত করে তাদের একটা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত সংঘবদ্ধ রাখা। যত ঝঞ্চাটের মূল হল বিরাট শিল্প উৎপাদন, তাতে এটা বন্ধ হযে যাবে। দ্বিতীয় উপায়, ব্যক্তির পরিবর্তন, তাকে Huxley-র সংজ্ঞানুসারে অনাসক্ত আদর্শ মানুষে (non-attached ideal man) পবিণত করা। পুরাণী একজন ফরাসী লেখকেরও এই ধরনেব শিল্প-প্রতিষ্ঠানের স্বপক্ষে মতামত উল্লেখ করল।

শ্রীঅরবিন্দ : আমারও ত এই ধারণাই ছিল, তার কথা আমি ম'কে বলেছিলাম অর্থাৎ একটা আধ্যাত্মিক commune গড়ে তোলা। আমি অবশ্য commune কথাটা ব্যবহার করিনি, বলেছি সংঘ, তা

স্থাপিত হবে আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর। তার নিজের শিল্প, কৃষি, তাঁত ইত্যাদি আয়োজন থাকবে, সংঘদের মাঝে আবদ্ধ থাকবে নিজেদের উৎপন্ন জিনিষপত্রের আদান প্রদান। এইভাবে সংঘের জীবন সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবে, কোন অর্থনৈতিক সমস্যায় পড়তে হবে না।

সত্যেন্দ্র: ওটা কি দয়ালবাগের প্রতিষ্ঠানের মত কিছু? কিন্তু সেখানে ত খুব আধ্যাত্মিকতা আছে বলে শুনিনি।

শ্রীঅরবিন্দ: ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে গেছে বলে বোধ হয়। হয়ত বিপুল পরিমাণে জিনিষপত্র উৎপাদন করতে চায় বলে। অনুকূল ঠাকুরও নাকি একই আইডিয়ায় কাজ করছেন।

নীরদ: অনুকূল ঠাকুর দয়ালবাগের সম্প্রদায়ের নন?

শ্রীঅরবিন্দ: না, না। রাধাস্বামী সম্প্রদায়ের।

সত্যেন্দ্র: কিন্তু এরকম সংঘ প্রতিষ্ঠানে বিপদও নেই কি? তার আগে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হওয়া চাই। কাজেই বিস্তর সময়সাপেক্ষ।

শ্রীঅরবিন্দ: কেন? অবশ্য আধ্যাত্মিক উপলব্ধির অপেক্ষা করতে হলে সময় নেবে কিন্তু সকলের পক্ষে সর্বোচ্চ বা অতিমানস উপলব্ধির ত প্রয়োজন নেই। আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট, আর সেটা লাভ করা তেমন শক্ত নয়। আমি 'ম'-কে বলেছিলাম যে ভিত্তি আধ্যাত্মিক হওয়া চাই। নতুবা সাফল্য পরিণত হবে ব্যর্থতায়।

এইরকম ধর্মসংঘ আগেও ছিল। রাশিয়ার **Dukhobors commune** খুব শক্তিমান ও সুসংবদ্ধ প্রতিষ্ঠান ছিল, তাদের বিশ্বাস (**faith**) ছিল খুব প্রবল। কত অত্যাচার গেছে তাদের উপর, তবুও তাদের টলাতে পারেনি। শেষকালে কানাডাতে তারা বাস তুলে

নেয়। তাদের একটা নীতি ছিল নগ্ন থাকা; কানাডা সরকারের সেটা পছন্দ হয়নি বলে তাদের সাথে গোলমাল বাধে।

তারপর **Mormon**-দের কথা। **United States**এ তারা সুপরিচিত। তাদের প্রতিষ্ঠাতার নাম হল **Joseph Smith**—ভগবৎ প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত পুরুষের (**prophet**) পক্ষে গদ্যময় নাম বটে। কিন্তু **Brigham Young**-ই আসলে এই সংঘকে গড়ে তোলে, অসাধারণ লোক সে। মজার বিষয় দেখ, এদেরও একটা নীতি ছিল বহুবিবাহ। **Old Testament**-ই ছিল তাদের ধর্মের উৎসস্বরূপ। কিন্তু সেটা যখন ত্যাগ করতে তাদের বাধ্য করা হল, তারা একেবারে সাধারণ মানুষে পর্যবসিত হল, তাদের বিশিষ্ট লক্ষণগুলি কোথায় উধাও হল। **Mark Twain** লিখেছে যে যখন তাদের দলপতিকে প্রশ্ন করা হত, সে জবাব দিত যে সে তার সন্তানদের চেনে নম্বর অনুসারে, নামের সাহায্যে নয়!

আমেরিকায় আর একটা সংঘ ছিল, তাতে বিয়ে নিষিদ্ধ ছিল।

সত্যেন্দ্র: আমাদের দেশে সেরকম সংঘ আছে কি?

শ্রীঅরবিন্দ: ভারতবর্ষে? শিখরাই একমাত্র সম্প্রদায় যার ভিত্তি হল ধর্মের অনুশাসনের উপর। ঠাকুর দয়ানন্দ বিবাহিত সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গড়েছিলেন কি গড়তে চেষ্টা করেছিলেন, মনে পড়ছে না। তবে সন্তান উৎপাদনের বিধি ছিল কিনা জানিনা।

সত্যেন্দ্র: তাঁর শিষ্যদের জন্যে তিনি বিধি দিয়েছিলেন বলে শুনেছি।

শ্রীঅরবিন্দ: শিষ্যদের কথা আলাদা।

সত্যেন্দ্র: আমার বিশ্বাস সন্ন্যাসীদের জন্যেও।

শ্রীঅরবিন্দ: বৈষ্ণবদের মাঝেও এই প্রথা রয়েছে, তারা বৈষ্ণবী গ্রহণ করে।

সত্যেন্দ্র: কত রকমের চেষ্টা যে হয়েছে! কিন্তু ফল দেখে হতাশ হতে হয়, সেই লোকটির মত, যে Edward VIIএর টাক মাথা দেখে হতাশস্বরে বলেছিল "না, না, বৃথা চেষ্টা, বৃথা চেষ্টা" (হাস্য)। আপনার অতিমানসই এখন একমাত্র ভরসা। অতিমানসের রীতি-নীতি কি রকম হবে আপনার কোন ধারণা আছে?

শ্রীঅরবিন্দ: কোন ধারণা নেই! ধারণা থাকলে ফল অতীতে যা হয়েছে সেরকমই হবে। অতিমানসকে তার কাজ করতে দেওয়া হবে সমীচীন।

সত্যেন্দ্র: কিন্তু সে ধরনের কাজের মূলে থাকা চাই প্রেম। সর্বজীবের প্রতি প্রেম।

শ্রীঅরবিন্দ: প্রেম? প্রেম ত যথেষ্ট নয়, প্রেম থেকে বেশী প্রয়োজনীয় হল চেতনার একত্ব।

সত্যেন্দ্র: মুস্কিল এই যে যখনই কোন কাজ সুরু করা হয়, তখনই আমাদের অহং মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে আর হোমিওপ্যাথির চিকিৎসার মত ঝগড়া বেড়ে যায়।

শ্রীঅরবিন্দ: প্রেমের মাঝে ঝগড়া নেই বলতে চাও? প্রেমিকদের মত কে বেশি ঝগড়াপ্রিয়? (পুরাণীর দিকে তাকিয়ে) জান ত সেই লাটিন প্রবচন, প্রত্যেক ঝগড়াই হল প্রেমের নূতন সূচনা? (হাস্য) প্রেম হল মনোরম ফুল আর চেতনার একত্ব হল মূল।

তারা অহং-কেন্দ্রিক হয় এইজন্যে যে যখন তাদের মাঝে উপরের শক্তি নামে, তাকে তাবা প্রাণকেন্দ্রে সংগ্রহ করে নিম্নপ্রকৃতির কাজে লাগায়, তারা ভাবে সে শক্তি তাদেরই সম্পত্তি। চন্দননগর থেকে যখন

অমুক এখানে এল সে বলল 'সেখানে সবাই ভেড়ার দল, পালকের অধীন ; আর এখানে দেখছি প্রত্যেকেই এক একটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার।'

(হাস্য)

পুরাণী : আর একজনের মতে প্রত্যেকে তার গুহায় এক একটি সিংহবিশেষ।

শ্রীঅরবিন্দ : আমরা যখন সংখ্যায় মুষ্টিমেয় ছিলাম, আর আশ্রমও ক্ষুদ্র ছিল, ব আর স হরেক রকমের লোককে যোগে টানতে চেষ্টা করত। তাদের মত প্রচারক কমই দেখা যায়। ন আর ম ছিল শান্তশিষ্ট। ব একদিন ভেড়ার মত নিরীহ একটি তামিল ছেলেকে পাকড়াও করল। কয়েক মাস পরে দেখা গেল সে আর ভেড়া নেই, সিংহের চামড়া পরে ঝগড়াঝাঁটি করছে, হুঙ্কার ছাড়ছে। দারুণ পরিবর্তন। (হাস্য) ড-কে পাকড়াও করে স। ড-এর বর্তমান পরিণতির মূলেও হল স। একটি জিনিষের জন্যে স-কে বাহাদুরী দিতেই হবে : তার কৃপায় ড-এর নীতিবোধের বালাই বিদায় নিয়েছে—ভাল, মন্দ, পাপ, পুণ্য এসব জ্ঞান তাকে পীড়া দেয় না। ড একদিন অমুককে নাকি বলেছে 'আমার পক্ষে অকৃতকার্য হওয়া অসম্ভব। আমি শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য।' কিন্তু একটা বিষয়ে সবাই একবাক্যে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে তার শক্তি আছে আর সে-ই একমাত্র লোক যে ইচ্ছা করলে পণ্ডিচেরীর কিছু উন্নতি করতে পারে। মা-ই তাকে এই শক্তি দিয়েছেন। সে ভাবত সে একজন ভাগবত-পুরুষ (God-man), আমেরিকান শব্দ।

ব-কে অমুকই এখানে পাঠায়। সে অন্যতম প্রচারক। সেও মনে করত সবাই যোগের উপযুক্ত, কোন অধিকার ভেদ নেই।

এখানে কিছুকালের জন্যে থাকতে এসেও মানুষ কি রকম

অহংকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে, দেখ। মিসেস র লিখেছে 'অমুকের কি হয়েছে বল ত? সে আমাদের হুকুম পাঠাচ্ছে, এটা কর, ওটা কর। আর পদে পদে আমাদের কাজের ত্রুটি ধরছে।' অবশ্য জাপানেও তাদের ঝগড়া করার অভ্যাস ছিল।

পুরাণী: গান্ধিজীর শিষ্যদের সাথে আমাদের তুমুল বাক-বিতণ্ডা হয় নীতিবোধ নিয়ে। তারা মনে করে যে দ্বৈত জ্ঞানের (duality) অতীত হওয়া মানে দুর্নীতিপরায়ণ হওয়া (immoral)। তাদের নীতিজ্ঞানের সাথে না মিললেই সেটা immoral হল।

সত্যেন্দ্র: সেটা হল নীতিতত্ত্বের দিক থেকে।

শ্রীঅরবিন্দ: অবশ্য সবাই ত আর দ্বৈতবোধের উপরে যেতে পারে না। তাদের নীতিতত্ত্ব তার নিজস্ব ক্ষেত্রেই খাটে। নীতি হল মনের সৃষ্টি। যতদিন পর্যন্ত সক্রিয় ভাগবত উৎসের সন্ধান না পাওয়া যাচ্ছে, ততদিন চালচলনে এই নীতিবোধ অনুসারে চলতে হবে বই কি। নতুবা কেউ বেশ স্বচ্ছন্দে বলতে পারে, "পাপও নেই, পুণ্যও নেই। কাজেই ফূর্তি করে পাপ করা যাক!" গীতায় কৃষ্ণ বলেছেন বটে সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য; কিন্তু সেটা গীতায় শেষের দিকে, প্রারম্ভে নয়। শুধু তা নয়, মামেকং শরণং ব্রজ ভুললে চলবে না। নীতিবাদীদের হল সাত্ত্বিকভাব। অধিকাংশ লোককেই সেই স্তর অতিক্রম করতে হবে, খুব অল্প সংখ্যক লোকই প্রথম থেকেই দ্বৈতাবস্থার অতীত স্তরে চলা সুরু করতে পারে।

সত্যেন্দ্র: চৈত্যপুরুষ কি সব সময়ই রূপান্তর চায়? প্রশ্নটা অন্য একজনের। তার মতে চায়, কেননা, সে বিবর্তনের মাঝে আবদ্ধ। আত্মা অপর পক্ষে লয়ে মিশে যেতে পারে।

শ্রীঅরবিন্দ : যদি চৈত্যপুরুষ সামনে থাকে বা তার বিশেষ পরিণতি হযে থাকে, তাহলে তার মত ঠিক কিন্তু চৈত্যপুরুষের রূপান্তর চাইতেই হবে এমন কথা নেই। সে আধ্যাত্মিক উপলব্ধিও চাইতে পারে।

নীরদ : কোন ধরনের রূপান্তর? প্রকৃতির না চৈত্যিক?

সত্যেন্দ্র : চৈত্যিক।

শ্রীঅরবিন্দ : সেটা ত অনেক যোগীর ও সাধুর হয়েছে, যাদের ভক্তিমার্গ তাদের। কিন্তু আধ্যাত্মিক পুরুষ যাঁদের বলি তাঁদের সেটা নাও হতে পারে। সব আধ্যাত্মিক পুরুষ কিন্তু সাধু (saint) নয়, অবশ্য হরগৌরী মিলন সম্ভব।

নীরদ : সাধু আর আধ্যাত্মিক পুরুষদের আপনি আলাদা করছেন?

শ্রীঅরবিন্দ : অবশ্য। সাধুরা তাদের চৈত্যপুরুষের গণ্ডী অতিক্রম করে না। আধ্যাত্মিক পুরুষেরা বাস করে ঊর্ধ্বচেতনায়। সাধুরা হল ভক্ত।

সত্যেন্দ্র : খুব পরিষ্কার হল না, স্যার।

শ্রীঅরবিন্দ : চৈত্যপুরুষ অর্থ হল হৃদয়ে যে পুরুষ, চিৎসত্তা (spirit) নয়। আমি ত নিজেকে কখনও সাধু বলে মনে করিনা, যদিও Merg আমায় সাধু ও দার্শনিক আখ্যা দিয়েছে। কৃষ্ণকে কেউ সাধু বলে না। আধ্যাত্মিক পুরুষের ব্যবহার সাধুর মত নাও হতে পারে, যেমন দুর্বাসার। তার মাঝে আরও অনেক জিনিষ থাকতে পারে।

সত্যেন্দ্র : এই যোগে নাকি প্রত্যেককে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নামতে হবে (অন্তরের কুরুক্ষেত্র), প্রত্যেককেই হতে হবে অর্জুনের মত যোদ্ধা।

শ্রীঅরবিন্দ : না, তেমন কথা নেই। সত্তার প্রকৃতির উপর সেটা নির্ভর করবে। যেমন কেউ কেউ স্বপ্নে বা তাদের প্রাণ-প্রকৃতির

প্রাবল্যে নানা শক্তিদের সাথে যুদ্ধ করে, আর কেউ বলে, 'ভগবান, বিপদ থেকে রক্ষা কর।' এই চৈত্যিক (psychic) মনোভাব যাদের, তাদের যুদ্ধ নিষ্প্রয়োজন। প্রাণময় বা মনোময় যাদের প্রকৃতি তারাই যোদ্ধা হয়। মনোময় যারা তারা আইডিয়ার সাথে যুদ্ধ করে।

সত্যেন্দ্র : কেউ কেউ ভগবানের সাথে ঝগড়া করা তাদের মনস্কামসিদ্ধির পথ মনে করে ; সেটা নাকি psychic পথ।

শ্রীঅরবিন্দ : তাহলে বলতে হবে এখানে সবাই psychic ! (হাস্য)

পুরাণী : আমার বেশ মনে আছে অমুক আপনাকে লম্বা লম্বা চিঠি লিখেছিল রামপ্রসাদের ভঙ্গীতে এই দাবি করে যে, যেহেতু সে ভগবানের জন্যে সব কিছু ত্যাগ করেছে, ভগবানের উচিত তার দাবী-দাওয়া মেটান।

শ্রীঅরবিন্দ : দাবী ? কিসের জোরে ? তার যুক্তিটা কতকটা এই ধরনের : তোমায় ওই জিনিষটা দিতে হবে কারণ ওটা না হলে আমার চলবে না।

নীরদ : আপনি কি জবাব দিয়েছিলেন ?

শ্রীঅরবিন্দ : চিঠি ত লেখা হয়েছে কৃষ্ণকে, আমায় নয়।

নীরদ : ওঃ! আমি তাহলে বলব এবার থেকে আপনাকে লিখতে।

শ্রীঅরবিন্দ : না, না, তা করোনা। আমায়ও তাহলে কৃষ্ণের মতো কঠোর হতে হবে।

নীরদ : শিব নাকি খুব সদাশয় দিলদরিয়া দেবতা, অল্পে তুষ্ট হন এবং সহজে বর দেন ?

শ্রীঅরবিন্দ : জানি না। তবে তাঁর বরগুলি ভয়ানক বিপত্তিজনক।

অসুরদের প্রতিও তিনি উদার। পরে যখন ফ্যাসাদে পড়েন, উদ্ধারের পথ খুঁজে পান না। দেবতা বটে! বর দিয়ে তার ফলাফল কি হবে তার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন! শেষে আসতে হয় বিষ্ণুকে সঙ্কট ত্রাণের জন্যে।

সত্যেন্দ্র: কৃষ্ণ নাকি ভয়ানক কঠোর?

শ্রীঅরবিন্দ: তাই।

পুরাণী: কৃষ্ণের কথা বলতে গিয়ে আমার অমুকেব কথা মনে পড়ছে। সে নাকি বৌদ্ধধর্ম নিযেছে।

শ্রীঅরবিন্দ: সর্বনাশ!

পুরাণী: কৃষ্ণের প্রতি তার এমন ভক্তি ও প্রেম থাকা সত্ত্বেও!

শ্রীঅরবিন্দ: দুঃখেব কথা বটে। বৌদ্ধ হবার কি দরকার ছিল আমি বুঝতে পারছি না। তার উপলব্ধিগুলিকে দুর্গস্বরূপ করে সেখান থেকে জ্ঞানের যত অভিজ্ঞতা চাই সেগুলো আহরণ ও বৃদ্ধি করলে তার ঐশ্বর্য বাড়ত। জ্ঞানের জন্যে ভক্তি ছেড়ে দেবে কেন? তার লেখা গুলিতে জ্ঞানের দিকে ঝোঁকটা আমি লক্ষ্য করেছি। তার গীতা ভাষ্যটা আমার কাছে ত ভয়ানক শুষ্ক ও তর্কপরায়ণ মনে হয়েছে। জীবনের ও অন্তরের সাড়া নেই। ঊর্ধ্বমানসের দৃষ্টি যেন উবে গেছে, তার চিঠিতে সে আভাস রয়েছে।

পাশ্চাত্য মনের বৌদ্ধধর্মের প্রতি একটা প্রবল টান আছে। **Merg** প্রথমে ছিল বৌদ্ধ। **Blavatsky**-র উপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব পড়েছিল। বুদ্ধের পরে তারা শঙ্করকে বুঝতে শেখে এবং মনে করে যে ভারতবর্ষে শঙ্করের বেদান্ত ছাড়া আর কিছু নেই। শঙ্করকেও বলা হয় প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ।

...বৌদ্ধসাধনা ভয়ানক শক্ত পথ ; কঠোর তপস্যার পথ। কড়া তার দাবী, কোন শিথিলতার প্রশ্রয় দেয় না।

চম্পকলাল: মাঝে মাঝে শুনি যে অমুক অমুক যোগীর পতন হয়েছে অথচ তারা নাকি সিদ্ধিলাভও করেছে। সত্যিকারের উপলব্ধি হলে 'পতন' সম্ভব?

শ্রীঅরবিন্দ: সত্যিকারের উপলব্ধি বলতে কি বোঝ? যোগভ্রষ্ট হওয়ার কথা শোননি?

২০।১।৩৯

ধ্যানের পর মা চলে গেলে শ্রীঅরবিন্দ গতকাল যাব কথা হচ্ছিল তাব বিষয পাড়লেন, বললেন "অমুকের চিঠি পড়লাম। কাল যা বলেছি তা পুরো ঠিক নয়। চিঠিতে দেখা যাচ্ছে তার মনের দৃষ্টি তেমনি স্বচ্ছ রয়েছে। তার ভাষ্যগুলি নীরস লেগেছে বোধ হয় তার ষ্টাইলের জন্যে, যুক্তি ও চিন্তাপ্রধান বলে (intellectual)।

নীরদ: তিনি কোন সম্প্রদায বা দলভুক্ত হতে চাননা বলেই নাকি বৌদ্ধ হয়েছেন।

শ্রীঅরবিন্দ: তাহলে কিছু বলবার নেই।

পুরাণী: Chamberlain ও Mussolini-র সাক্ষাতের ফল ত কিছুই জানা গেল না। দুজনেই বলছে যে তারা সন্তুষ্ট।

শ্রীঅরবিন্দ: ইংরাজ রাজনীতি আমি বুঝতে পারছি না। তাদের উদ্দেশ্য কি ভগবান জানেন। ফ্রান্সকে ত লেজের মত জুড়ে নিয়ে

ইচ্ছামত ঘোরাচ্ছে। গুজব যে মুসোলিনি স্পেনে ফ্রাঙ্কোর জয়ের অপেক্ষা করছে। তারপর ফ্রান্সের কাছে তার দাবী উপস্থিত করবে। ফ্রাঙ্কো যদি জেতে, ফ্রান্সের অবস্থা ভয়ানক বিপদ্‌জনক হবে কিন্তু তাতে ইংরাজের কি লাভ সেটাই বুঝতে পারছি না। কেননা যে মুহূর্তে ইটালি ও জার্মানী ফ্রান্সকে ধ্বংস করবে, পরের বলিদান হবে ইংলণ্ড। ইংরাজ বেশ ভাল করেই জানে যে মুসোলিনি তার ইটালিয়ান সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে চায় অর্থাৎ তার পূর্ব অধিকারভুক্ত দেশগুলি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করবে। ইংরাজ তবুও হিটলার ও মুসোলিনীকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইচ্ছা করে তুলে ধরছে আর ফ্রান্সকে দুর্বল করছে। জানি না কেন। ফ্রান্সের সাম্রাজ্য তিনজনের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করে নিয়ে শেষে মুসোলিনি ও জার্মাণীকে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লাগাবে এই কি ইংরাজের মতলব? তাহলে তার চিরাচরিত স্বার্থপর নীতিরই পুনরাবৃত্তি হবে, কিন্তু এ খেলা বড় সাংঘাতিক।

পুরাণী: কিন্তু কি করে সম্ভব? ফ্রান্স যুদ্ধে নামলে ইংরাজ কি করে চোখ বুজে সরে থাকবে?

শ্রীঅরবিন্দ: কেন? চেম্বারলেন কি বলেনি যে যতদিন পর্যন্ত ইংরাজের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না হচ্ছে ততদিন তার যুদ্ধে নামবার কোন বাধ্য-বাধকতা নেই? বলবে যেহেতু ইটালির দাবীগুলি মেটান হয়নি সে ফ্রান্সের সাথে যুদ্ধ করছে আর জার্মাণী তার সাহায্যে নেমেছে। ওটাকে আক্রমণ (aggression) বলা যায় না। কাজেই ইংলণ্ড কেন ফ্রান্সের পক্ষ নেবে? ওজরের অভাব হবে না। Daladier স্থু'এর বন্ধুকে—দুজনেরই বন্ধু—বলেছে যে সে Czekoslovakia-র সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে বাধ্য হয়েছে, কারণ চেম্বারলেন তাকে

জানিয়েছে যে যতক্ষণ পর্যন্ত রাজনৈতিক উপায়ে (diplomatically) ফ্রান্সকে সাহায্য করা সম্ভব সে করবে কিন্তু যুদ্ধ বাধলে ফ্রান্স যেন ইংলণ্ডের উপর ভরসা না করে। এটা Daladier-এর বন্ধুর কাছ্ থেকেই শোনা, কাজেই বিশ্বাসযোগ্য।

পুরাণী: কিন্তু Flandin কেন socialist হয়ে Franco-র পক্ষ নিচ্ছে, Blum যখন বিরুদ্ধে? জানেন ত Flandin মুসোলিনিকে তার করে অভিনন্দন পর্যন্ত জানিয়েছে। হিটলার তাকে বন্ধু ভাবছে। সে কি Rome-Berlin Axis-এ যোগ দিয়ে ইংলণ্ডকে একঘরে করতে চায়?

শ্রীঅরবিন্দ: কি করে? তাব আগে ফ্রান্সকে ইটালির দাবী মেটাতে হবে না? স্পেনের গোলমাল মিটলে দেখবে ইটালি নিশ্চয় চেয়ে বসবে Tunis, Nice, Djibouti; Flandin দিতে প্রস্তুত? ইটালি তার আফ্রিকার সাম্রাজ্য চায়। সেজন্যে Nice, Djibouti অপরিহার্য, ভূমধ্যসাগরের আধিপত্যের জন্যেও বটে।

Blum একটা অপদার্থ। সে-ই ত যখন Premier ছিল স্পেনের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করতে রাজী হয়নি। না, না, এধরনের কিছু প্রত্যাশা করাই স্রেফ বাতুলতা।

বর্তমানে দেখা যাচ্ছে দুটো মাত্র লোক সবাইর বিরুদ্ধে তাদের অস্ত্র শানাচ্ছে। অন্যেরা কোনমতে নিজেদের চামড়া বাঁচাবার জন্যে সন্ত্রস্ত। একটি লোকের কাছে শুধু সমস্ত ব্যাপারটা ঝরঝরে, সে হল Roosevelt, কিন্তু সে বহুদূরে, আমেরিকানরা তাকে সাহায্য করবে কি না সে সম্বন্ধেও সে নিশ্চিত নয়।

নীরদ: রাশিয়া?

শ্রীঅরবিন্দ: বিশ্বাস করা যায় না। তার সামরিক শক্তি কি রকম তাও জানা নেই। একসময় তারই নাকি বৃহত্তম air force ছিল কিন্তু Lindberg সে ধারণা উলটিয়ে দিয়েছে।

জার্মাণীর ভিতরের অবস্থা কি রকম কেউ জানে না। তারা সব কিছু সযত্নে গোপন রাখছে।

পুরাণী: জহরলাল বলছেন যে হিটলার ও তার সেনাপতিরা আশা করেনি যে অষ্ট্রীয়া যুদ্ধ করবে না। তারা ত অবাক!

শ্রীঅরবিন্দ: ঠিক কথা। সেনাপতিরা হিটলারের বিরুদ্ধে ছিল কারণ তারা যুদ্ধে রাজী নয়। এখন হিটলার বলবে "দেখলে ত, আমি ঠিকই বলেছিলাম? যা বলেছি ঠিক তাই হয়েছে!"

পুরাণী: Czekoslovakia-র বিরুদ্ধে যে tank ও machine gun সাজান হয়েছিল সেটা নাকি জার্মাণীর ধাপ্পা।

শ্রীঅরবিন্দ: বলা যায় না। জার্মাণী অত্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ জাত। ও রকম ধাপ্পা দেবে না।

পুরাণী: হল্যাণ্ড-এর সীমান্তে গোলমাল দেখা দিয়েছে। জার্মাণী হল্যাণ্ডকে ভয় দেখাচ্ছে যে তার বাণিজ্যের ব্যাঘাত করবে। Amsterdamকে বাদ দিয়ে বাণিজ্যপথ Antwerp-এর উপর দিয়ে চালাবে।

শ্রীঅরবিন্দ: তাহলে ইংলণ্ডের মাথায় টনক নড়বে। তখন চেম্বারলেনের বাধ্য হয়ে যুদ্ধে নামতে হবে, শান্তির কথা আর আওড়াবে না। ইংলণ্ড জার্মান Navyকে কিছুতেই আসতে দেবে না North Seaতে। কিন্তু জার্মাণীও ইংলণ্ডের সাথে নেহাৎ যুদ্ধ করতে না চাইলে তা করবে না।

২১।১।৩৯

আজ আবার ডাক্তার রাও এসেছেন। অন্যান্য বারের মত শ্রীঅরবিন্দের পা'টা মালিশ করছেন। শ্রীঅরবিন্দের অসুস্থ হাঁটুতে একটু ব্যথা হয়েছে বলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ব্যথাটা কমেছে কি না। শ্রীঅরবিন্দ বললেন, প্রায় একই অবস্থা। (splint এখন খুলে নেওয়া হয়েছে, কবে আমার ঠিক মনে নেই। মালিশের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে হাঁটুর জোর ফিরে আসে।)

রাও: আপনি অনেকদিন পরে পা'টা নাড়ছেন কিনা, স্যার, তাই একটু ব্যথা হয়েছে। অভ্যাস হয়ে গেলে চলে যাবে।

শ্রীঅরবিন্দ . কিসে অভ্যাস? ব্যথায়? (হাস্য)

রাও ঠাট্টা ধরতে পারেননি। তাই আমাদের হাসিতে যেন একটু বিব্রত হলেন।

মালিশের পরে মা এলেন ও আমরা ধ্যানে বসলাম। কিছুক্ষণ পরে রাও সত্যেন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি কিছুক্ষণ থাকতে পারেন কি না। সত্যেন্দ্র উত্তর দিলেন, মাকেই জিজ্ঞেস করুন। মা শুনে শুধু হাসলেন। ৭টা প্রায় বাজতে চলল; মা নীচে ধ্যানে যাবার জন্যে উঠলেন এবং রাওকে বললেন, "তুমি আসছ? আমি ধ্যানে যাচ্ছি।" রাও একলাফ দিয়ে উঠে মার পিছনে পিছনে চললেন।

পুরাণী: অমুক নাকি সন্ন্যাসী ও যোগীদের মোটেই পছন্দ করে না। কেবল দুটো আশ্রম তার মনঃপূত, আমাদের ও তার নিজের আশ্রম।

শ্রীঅরবিন্দ: কেন? সে কি অনেক যোগী সন্ন্যাসী দেখেছে? না কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তার অভিযোগ?

পুরাণী: বোধহয় সন্ন্যাসী নির্বিশেষে।

সত্যেন্দ্র: কিন্তু মহর্ষি? মহর্ষি সম্বন্ধে লেখা একটা বইএর ত সে ভাল সমালোচনা করেছে।

শ্রীঅরবিন্দ: ওটা একটু বাড়াবাড়ি। সেই আমেরিকান মহিলার মত বাইরটা দেখে বিচার করেছে। রমণ মহর্ষিকে মহিলার ভাল লাগেনি মহর্ষির ময়লা পোষাক ও কতকগুলি অভ্যাস দেখে; একটা হল তাঁর আঙুলের নখ কামড়ান।

সত্যেন্দ্র: কিন্তু ইউরোপীয়ানরা তা করে না? আমার ফরাসী শিক্ষক করত, এমন কি থুথু দিয়ে বোর্ড পরিষ্কার করত।

নীরদ: আমিও ত নখ কামড়াই, খাবার জন্যে নয় অবশ্যি, কাটবার জন্যে।

শ্রীঅরবিন্দ: খবর্দার, এই মহিলার সামনে করোনা। ভাগ্যিস, সে আজ চলে যাচ্ছে! এগুলো হল সামাজিক অভদ্রতা। মহিলাটি ছিল Protestant, এখন হয়েছে Catholic। আমি ভেবেছিলাম বুঝি ধর্মভাবের দরুন, তা নয়, বিয়ের সুবিধার জন্যে। এখন দেশ-বিদেশ ঘুরছে শান্তির খোঁজে।

সত্যেন্দ্র: ভারতবাসীদের মাঝেও খাঁটি খ্রীষ্টানের অভাব নেই, সাধু সুন্দর সিং যেমন। কিন্তু ক্যাথলিকরাও ভারতীয় খ্রীষ্টানদের তফাতে রাখে।

শ্রীঅরবিন্দ: ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ও রোমান ক্যাথলিক কিন্তু সর্বদা হিন্দু দেবদেবীর নাম জপত।

নীরদ: ধর্মটা কি তাঁর জন্মসূত্রে পাওয়া?

শ্রীঅরবিন্দ: না, নিজেই দীক্ষা নিয়েছে। পোপের সাথেও দেখা করেছে।

এখন কথা উঠল East Africa সম্বন্ধে। সেখানে গোলমাল দেখা দিয়েছে বলে পেটেলকে পাঠাবার কথা চলছে।

পুরাণী: ভারতবাসীদের উপর বোধহয় গুলি চালাবে।

শ্রীঅরবিন্দ: পেটেলকে ওখানে না পাঠিয়ে গান্ধিকে হিটলারের কাছে পাঠালে বেশ হয়। হিটলার গান্ধিকে বলবে, 'মিঃ গান্ধি, তুমি তোমার ভিতরের আদেশ শুনে চল, আমি চলি আমারটা শুনে।' তখন হিটলাবের ভুল হচ্ছে বলা যাবেনা, কেননা দুটো বাণী এক রকমের হবে এমন কথা নেই। আমার পক্ষে যে বাণী হবে উপকারী ও প্রয়োজনীয়, তোমার পক্ষে সত্যি হতে পারে ঠিক তার উল্টোটা। বিশ্বাত্মার (Cosmic spirit) অভিপ্রায় হিটলারের জন্যে এক রকমের হবে এবং তাকে তার পথে নিয়ে যাবে, কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে তার অভিপ্রায় আলাদা হতে পারে।

নীরদ: তাতে লাগবে দুজনের মাঝে ধাক্কা, ফলে দুটি পাত্র ভেঙে চৌচির!

সত্যেন্দ্র: তাতে কি, যদি ফল ভাল হয়?

পুরাণী: ওটা প্রায় অদৃষ্টবাদের কথা!

শ্রীঅরবিন্দ: আপত্তি কি? দৈবে, অদৃষ্টে বিশ্বাসী লোক কি নেই, না জন্মায়নি? তৃতীয় নেপোলিয়ান বলত 'যতদিন আমার দ্বারা কোন কাজ হবার আছে, ততদিন আমার প্রয়োজন থাকবেই। প্রয়োজন যেদিন মিটবে, সেদিন পুরানো হাঁড়ির মত রাস্তার পাশে আমায় ফেলে

দেবে।' বস্তুতঃ ঠিক তাই হল। প্রথম নেপোলিয়ানও দৈবে বিশ্বাস করতেন।

সত্যেন্দ্র : হ্যাঁ। যখন কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করল দৈবে বিশ্বাসী হলে তিনি এত ভাবেন, প্ল্যান করেন কেন, জবাব দিলেন তাও দৈব-নির্দিষ্ট বলেই তাঁকে করতে হয়।

শ্রীঅরবিন্দ : সব মহৎ ও শক্তিমান লোকই বিশ্বাস করেছে যে কোন না কোন ঊর্ধ্বশক্তি তাদের চালাচেছ। সক্রেটিস তাকে বলতেন তাঁর Daemon অর্থাৎ ভাগবত সত্তা। শুনতে অদ্ভুত লাগে যে— সামান্য সামান্য বিষযেও তাদের কেউ কেউ এই শক্তির আদেশের (voice) উপব নির্ভর করেছে। একবাব সক্রেটিস তাঁর শিষ্যেব সাথে কোথায যাচিছলেন। এক পথের মাথায় এসে শিষ্যটি বলল 'চলুন, এই পথটি নিই।' সক্রেটিস বললেন, 'না, আমার Daemon বলছে অন্য পথটি নিতে।' শিষ্যটি রাজী না হয়ে নিজের পথে চলল। কিছুদূর যেতেই তাকে এক শূকরেব পাল আক্রমণ করল এবং পায়ে দলিয়ে দিল।

কেউ কেউ আবার ভিতরের বাণী শোনে না, তারা চলে ভেতরের আলোর নির্দেশে, যেমন Quakers.

নীরদ : তারা আলো দেখতে পায়?

শ্রীঅরবিন্দ : জানিনা। কিন্তু একটি উক্তি আছে, 'সাবধান, দেখো, তোমার আলো যেন আঁধারের নামান্তর না হয়।'

এই ভেতরের বাণী কিন্তু কোন কারণ দর্শায় না। শুধু বলে, 'এই কর, সেই কর; এরকম না করলে ভুগবে', আর মজা হল, তুমি যখন বাণী উপেক্ষা করবে, তখন দেখা দেবে তোমার দুর্গতি। লেলে

বলেছিলেন যে যখনি তিনি বাণী উপেক্ষা করতেন, তখনি তাঁর কষ্ট ও দুর্ভোগ হত।

পুরাণী: কিন্তু বাণী ত অনেক রকমের, নানা স্তরের। বোঝা মুস্কিল কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক। মন, প্রাণ, দেহের নানা স্তরের বাণী রয়েছে; অধিকন্তু একই লোক শুনতে পায় বিপরীত বাণী।

শ্রীঅরবিন্দ: বটেই ত। হিটলারের বন্ধু বলত যে হিটলার আজ যা বলবে, কাল তা বাতিল করে দেবে।

আমিও অবশ্য পণ্ডিচেরী আসবার আদেশ পেয়েছি; তবে সেটা ভিতরের আদেশ নয়।

সত্যেন্দ্র: এতে ভুল হবার আশঙ্কা নেই?

শ্রীঅরবিন্দ না, সেই আদেশ ভুল বা অমান্য করা অসম্ভব। কতগুলি আদেশ বা বাণী আছে যাদের ভুল করবার কোন সম্ভাবনা নেই। অমুকের ইচ্ছা ছিল আমায় ফ্রান্সে পাঠাতে, যাতে সে গোলমালের হাত থেকে নিস্তার পায়। আমি যখন চন্দননগরে উপস্থিত হলাম সে আমায় জায়গা না দিয়ে ম'র ঘাড়ে ফেলে দিল।

নীরদ: আপনাকে জায়গা দেবার বাধ্যবাধকতা ছিল কি?

শ্রীঅরবিন্দ: হ্যাঁ, বিপ্লবী বলে।

নীরদ: সে ভদ্রলোকও বিপ্লবী?

শ্রীঅরবিন্দ: কি বলছ? আমরা যে একসঙ্গে ছিলাম জেলে। জেলের অভিজ্ঞতাই বোধহয় তাকে কাবু করেছে। গোড়াতে কিন্তু বিপ্লবে তার প্রবল উৎসাহ ছিল।

পুরাণী: নলিনী বলছে যে ভদ্রলোক জেলে কেবল কাঁদত।

তার অজস্র কান্না দেখে জেলের কর্তারা ভাবল যে এ কিছুতেই বিপ্লবী হতে পারেনা, কাজেই তাকে মুক্তি দিল।

শ্রীঅরবিন্দ: না, সে কারণে নয়। ফরাসী সরকারের মধ্যবর্তিতায় বোধ হয় সে মুক্তি পায়। ব একদিন তার বাড়ী চড়াও করে তাকে বিপ্লব সম্বন্ধে লম্বা বক্তৃতা দেয় এবং একদিনেই তাকে দলভুক্ত করে ফেলে। প্রথমে তার জ্বলন্ত উৎসাহ ছিল এবং অন্যদেরও বিপ্লবের পথে উদ্দীপ্ত করত।

পুরাণী: হাঁ, ব-এর ভিতব সে সময় আগুন জ্বলত। একদিন তাকে দেখেছিলাম, বরোদায় আমার ভাইএর সঙ্গে বিপ্লব সম্বন্ধে আলোচনা করছে। তখন তার চোখ দুটো যেন আগুনের শিখার মত জ্বলছিল। নিবেদিতাও কি একরকমের বিপ্লবী ছিলেন?

শ্রীঅরবিন্দ: সে কি? বিপ্লবী নেতাদের তিনি ছিলেন অন্যতম। লোকের সংস্পর্শে আসবার জন্যে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। খোলাখুলি, সরল প্রকৃতির মানুষ; বিপ্লবেব কথা খোলাখুলিভাবে সকলকে বলতেন, কোন লাকালুকি ছিল না তাঁর মাঝে। যখন বিপ্লব সম্বন্ধে কথা বলতেন, যেন তাঁর আত্মাই,—তাঁর খাঁটি স্বরূপ—বেরিয়ে আসত. তাঁর পুবো মন ও প্রাণ ভাষায় ব্যক্ত হত। যোগ করতেন বটে, কিন্তু তাঁর আসল কাজ যেন এটা। একেই বলে আগুন। তাঁর বই, Kali the Mother উদ্দীপনাপূর্ণ বই, তেমনি বিদ্রোহমূলক। অহিংস নয়। রাজপুতনার ঠাকুরদের কাছে গিয়ে বিদ্রোহ প্রচার করতেন। একবার বরোদায় এসে মহাবাজাকেও তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ দেন এবং শেষে বলেন, 'আরও কিছু জানতে চান ত মিঃ ঘোষকে জিজ্ঞাসা করবেন।' কিন্তু মহারাজা পরে আমার সাথে কোনদিন

রাজনীতি চর্চা করেননি। ভাল কথা, মহারাজা নাকি আমার স্বদেশী যুগ ও পণ্ডিচেরীর প্রথম যুগের মধ্যবর্তী জীবন সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, 'মিঃ ঘোষ এখন নিভিয়ে পড়া আগ্নেয়গিরি। তিনি এখন যোগী হয়েছেন।'

কিন্তু নিবেদিতার একটা ব্যবহার আমার কাছে অবোধ্য ছিল। গোখলেকে তিনি খুব সমীহ করতেন। কোন বিপ্লবীর পক্ষে গোখলেকে শ্রদ্ধা করা আমার ধারণার অতীত। গোখলে ছিল যাকে বলে **as tepid as warm water.** একবার গোখলের জীবন সংশয়াবস্থায় নিবেদিতা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে আমার কাছে ছুটে এসে বলেন, 'মিঃ ঘোষ, আপনার দলের ছেলে কি এই কাণ্ড করেছে?' আমি বললাম 'নাঃ'। তখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন 'তাহলে কোন **free lancer** হবে।' প্রথমবার যখন আমার সাথে দেখা করতে আসেন, আমায় জিজ্ঞেস করে বসলেন,' মিঃ ঘোষ, আপনি নাকি শক্তি-উপাসক?' তাঁর কোথাও অহিংসার নামগন্ধ নেই। তাঁর সৌন্দর্যবোধও ছিল আবার। ক ও আমি যখন তাঁকে আনতে ষ্টেশনে যাই, ধর্মশালা দেখে চিৎকার করে উঠলেন, 'কী সুন্দর!' কিন্তু কলেজ বিলডিং দেখে বললেন ' কী জঘন্য!' কাশীরাও বলল, 'মেয়েটির মাথায় বোধহয় ছিট আছে।'

পুরাণী: সেই কলেজ দালান **Eton**-এর নকল।

শ্রীঅরবিন্দ: কিন্তু **Eton** এ **dome** কোথায়?

পুরাণী: এটা পুরোনো আর নূতনের সম্মিলন, দোআঁশলা স্থাপত্য।

শ্রীঅরবিন্দ: যাই হোক, অত্যন্ত কুৎসিত ডোম্ বলতেই হবে। রামকৃষ্ণ মিশনকে নিবেদিতার রাজনৈতিক কাজ নিয়ে ভয়ানক বিব্রত

হতে হয়। বাধ্য হয়ে তারা নিবেদিতাকে মিশনের কাজ ও রাজনৈতিক কাজ আলাদা রাখতে অনুরোধ করে।

পুরাণী : তাঁর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি কি রকম?

শ্রীঅরবিন্দ : জানিনা। যখনি আমাদের দেখা হত, আমরা রাজনীতি আর বিপ্লবের কথাই বলতাম। কিন্তু তাঁর চোখে একাগ্রতার ক্ষমতা স্পষ্ট প্রকাশ পেত এবং বুঝতে পারা দেত সমাধিতে তাঁর সহজ অধিকার ছিল। নিশ্চয় কিছু উপলব্ধি হয়েছে।

নীরদ : যোগের উদ্দেশ্যেই ত তিনি ভারতে আসেন?

শ্রীঅরবিন্দ : হাঁ, কিন্তু বিবেকানন্দের কাজ হিসাবেই তিনি রাজনীতি গ্রহণ করেন। বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তাঁর লেখা বইই শ্রেষ্ঠ। বিবেকানন্দ নিজেও রাজনৈতিক বিষয়ে ভাবতেন ও মাঝে মাঝে বিপ্লবের প্রকোপে পড়তেন। একবার একটি vision দেখেন অনেকটা মানিকতলা বাগানের সাথে তার মিল আছে। আশ্চর্যের বিষয় বলতে হবে যে বহু সন্ন্যাসী ভারতের স্বাধীনতার কথা ভেবেছে। মহর্ষির যুবা শিষ্যরা অনেকে বিপ্লবী; যোগানন্দের গুরুও বিপ্লবের কথা ভেবেছেন, ঠাকুর দয়ানন্দ অন্যতম। যে সন্ন্যাসী উত্তর যোগীর উল্লেখ করেছেন, তিনি আর একটি।

পুরাণী : ব্রহ্মানন্দও ইংরাজদের তাড়িয়ে দেবার কথা বলতেন।

শ্রীঅরবিন্দ : তাই নাকি? জানতাম না ত!

পুরাণী : তিলক প্রভৃতির গ্রেপ্তারের পর দেশের নির্জীব ও নিষ্প্রাণ অবস্থা দেখে নিবেদিতা নাকি ভয়ানক ভেঙে পড়েন, এমন কি কাঁদেন।

শ্রীঅরবিন্দ : তখন সবাই চেয়েছিল একটা বিদ্রোহের স্ফুরণ।

বহু রাজপুত ঠাকুরের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, যারা বিপ্লবীভাব ও প্রবৃত্তি পোষণ করত, সরকারের অজ্ঞাতে। ঠাকুর রামসিং বলে একজন পরে ধরা পড়ে এবং জেলে বন্দী হয়। অত্যন্ত অল্প সময়ের মাঝে হঠাৎ তার মৃত্যু হয়। মোরোপান্ত বলেছিল, ভয়েই তার মৃত্যু হয় কিন্তু সে ত ভয় পাবার পাত্র নয়। কি জানি বিষটিষ খাইয়েছে কিনা। জানই ত—মোরোপান্ত শেষে মডারেট হয়ে যায়। ভারতীয় সৈন্যদের মাঝেও কয়েকটি দল আমাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিল। আমি আলিপুরের এক পাঞ্জাবী প্রহরীকে চিনতাম, সে আমায় বিপ্লবের কথা বলত।

(পুরাণীকে সম্বোধন করে) Mandalay বলে কাউকে জান?

পুরাণী : চোখে চশমা পরা ?

শ্রীঅরবিন্দ : হাঁ।

পুরাণী : জানি বই কি। ভদ্রলোক এখন শান্ত সংসারী।

শ্রীঅরবিন্দ : সে-ই আমায় প্রথম Secret Society–র এক মেম্বরের সাথে আলাপ করিয়ে দেয়, এবং তাতে তিলক প্রভৃতির সাথে যোগাযোগ হয়।

নীরদ : গান্ধি একবার নিবেদিতার সম্বন্ধে বলেন যে তিনি চঞ্চল, অস্থিরমতি। (mercurial and volatile)। তাতে Modern Review ভয়ানক আপত্তি করায় গান্ধি তাঁর মত প্রত্যাহার করেন।

শ্রীঅরবিন্দ : নিবেদিতা Volatile! বাজে কথা। তিনি একেবারে খাঁটি কর্মী।

২২।১।৩৯

কথা আবম্ভ হতেই পুরাণী এল। আমি বললাম, 'পুরাণী যেন খবরে ভর্তি, টগবগ করছে যেন।'

শ্রীঅববিন্দ : তাই নাকি ?

পুরাণী : না, না, তেমন কিছু নয়। **Lindberg** রাশিয়ার **air fleet** সম্বন্ধে কি বলেছে পড়ে দেখলাম। শুধু এইটুকু যে তার **air fleet**-কে যে রকম প্রকাণ্ড মনে কবা হয়, আসলে তা নয়। কারণ কিছু দেয় নি কিন্তু।

শ্রীঅরবিন্দ : ও ত ভয়ানক অস্পষ্ট। সে কি বলতে চায় যে এরোপ্লেনগুলি খুব মজবুত নয়, না বৈমানিকেরা তেমন পাকা নয়? গত রুশোজাপান যুদ্ধে জাপানীরা স্বীকার করেছে যে রাশিযার কামান অব্যর্থ কিন্তু তার পদাতিক তেমন সুবিধার নয়, সুযোগ পেয়েও তার সদ্ব্যবহার করতে পারেনি। অপর পক্ষে জাপানী সৈন্যই বোধ হয় পৃথিবীতে সকলের সেবা। চীনে তাদের লড়তে হয়েছে বিপুল সৈন্যের বিরুদ্ধে, তবুও তাবা জিতেছে। **Changkaiseik** শুধুই বড়াই করেছে যে জাপানীদের তুড়ি দিয়ে হারিয়ে দেবে। জাপানীরা টুঁ শব্দ না করে কাজ হাসিল করে নিল ক্রমশঃ চীনের ভিতরে ঢুকে।

পুরাণী : জাপানীরা নাকি বিমানযুদ্ধে তেমন পটু নয়, বহুবার তাদের লক্ষ্য ব্যর্থ হয়েছে।

শ্রীঅরবিন্দ : জানি না, তবে জাপানীরা একই সময়ে বহু জিনিষের উপর মনঃসংযোগ করতে পারে না; একটা জিনিষেই তারা মনঃপ্রয়োগে অভ্যস্ত।

পুরাণী : মুসোলিনী সমস্ত ইটালিয়ানদের Djibouti থেকে চলে যেতে আদেশ দিয়েছে। রেলে কোন খাবার জিনিষ সেখানে পাঠাতে নিষেধ করেছে, গরীবদের উপোসে মারবার উদ্দেশ্যে! তাছাড়া Abyssinia-Djibouti রেলসংযোগ কেটে ফেলে আর একটি রেল লাইন খুলবে Eritrea থেকে Asmara পর্যন্ত।

শ্রীঅরবিন্দ : সে ভেবেছে তাতে ফ্রান্স Djibouti ছেড়ে দেবে? এই সমুদ্র বন্দর ফ্রান্স আর তার প্রাচ্য উপনিবেশের যোগসূত্র। প্রধান মন্ত্রী আর Flandin ছেড়ে দিলেও ফরাসীরা মারমুখী হয়ে উঠবে।

নীরদ : আচ্ছা, কাল যে আমরা 'বাণী' (voice) সম্বন্ধে কথা বলছিলাম, কি করে বুঝব বাণী ঠিক না ভুল? তা বিচার করবার কোন মাপকাঠি (standard) আছে?

শ্রীঅরবিন্দ : কোন মাপকাঠি? সে রকম কোন মাপকাঠি নেই। কি করে তুমি বিচাব করবে কোনটা ঠিক 'বাণী', কোনটা ভুল?

নীরদ : তাহলে, হিটলার যখন বলছে 'আমি বাণী শুনেছি এবং তাকে মেনে চলছি, সেটা ঠিক?'

শ্রীঅরবিন্দ : কোন হিসাবে ঠিক? নৈতিক হিসাবে?

পুরাণী : সে বলছে আধ্যাত্মিক হিসাবে বোধ হয়।

শ্রীঅরবিন্দ : কি করে বলবে যে তার বাণী ঠিক নয়? সে প্রমাণ পেয়েছে যে সেই বাণী মেনে চলে সে অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকার করেছে, আরও অনেক বিষয়ে সুফল পেয়েছে। তাহলে তুমি বলতে পার কি সে বাণী মিথ্যা? যেমন বলে এসেছি বিশ্বপুরুষের হয়তঃ ইচ্ছা যে সে এই পথে চলুক। নৈতিকহিসাবেও বলতে পারনা যে হিটলার দুর্নীতিপরায়ণ লোক। খাদ্য বিষয়ে সে খুব সংযত, তার

স্ত্রী বা প্রেমিকাও নাকি নেই এবং অন্যান্য বিষয়েও সে নিয়মপরায়ণ। এগুলো ত নৈতিক গুণ। রবেস্‌পিয়ারও নীতিপরায়ণ লোক ছিল, অথচ অজস্র লোক মেরেছে।

নীরদ: তাহলে 'ঠিক বাণী' বলতে আপনি কি বোঝেন?

শ্রীঅরবিন্দ: ওঃ! সেটা ত চৈত্যপুরুষের বাণী। কিন্তু সেটা ছাড়া, নানা স্তর থেকে নানা রকমের বাণী শোনা যেতে পারে। কি করে বলবে কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল? লর্ড কার্জন সম্বন্ধে কি বলবে?

নীরদ: বাংলার বিভাগ সম্বন্ধে?

শ্রীঅববিন্দ: হাঁ। সে ঠিক কাজ করেছে? সে ত মনে করেছে যে সে যা করেছে তা ঠিক, কিন্তু অন্যদের মতে এমন ভুল আর হতে পারে না। তথাপি এই বাংলা বিভাগ যদি না হত ভারতবর্ষ আজ অর্ধেকও স্বাধীন হত কি না সন্দেহ। কাজেই বিশ্বপুরুষই হয়ত কার্জনকে যন্ত্র করে, সে পথে নিয়ে গেছে এই ফলের জন্যে। একটা Cabbalist ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে স্বর্ণযুগ আসবে সেদিন, যেদিন ঈহুদীরা সর্বত্র অত্যাচারিত ও বিতাড়িত হবে। হিটলার হয়ত সেই বাণী পূর্ণ করছে।

নীরদ: দাযিত্ব বলে তাহলে কিছু থাকে না। যা ইচছা তা করা চলে এবং পরিণতি দাঁড়ায় অদৃষ্টবাদে।

শ্রীঅরবিন্দ: না, যা খুসী তা করতে পার না। সবাই ত আর হিটলার নয় এবং হিটলার যা করছে তাও করতে পারে না, কেননা তার প্রকৃতিই তাকে চালাচ্ছে। তোমার প্রশ্নে আমার দিদিমার গল্প মনে পড়ল: তিনি বললেন, 'ভগবান এত বদসৃষ্টি করেছেন কেন?

তাঁর দেখা পেলে তাঁকে শিখিয়ে দিতাম সুনীতি কাকে বলে'। দাদা-মশাই উত্তর দিলেন 'তা বটে। তবে ভগবানের এমন কলকব্জা যে তুমি ইচ্ছা করলেও তাঁর কাছে পৌঁছাতে পারবে না।' (হাস্য)

আমরা যখন বলি যে হিটলারকে অসুরশক্তি অধিকার করেছে, তথ্য হিসাবে সেটা বলছি, কোন নীতিবিচার থেকে নয়। সে যা করছে এবং যেভাবে করছে দুটোই তার পরিষ্কার প্রমাণ।

এক যুবা সন্ন্যাসী এসেছিল বরোদায়। লম্বা লম্বা নখ তার। গাছের তলায় দিন কাটাত। দেশপাণ্ডে ও আমি গেলাম তাকে দেখতে। দেশপাণ্ডে তাকে জিজ্ঞেস করল 'কাজ করব কোন নীতি অনুসারে ? কোন নৈতিক বিধান বা মানদণ্ড অনুসারে ?' সন্ন্যাসী জবাব দিল, 'সে রকম কোন মানদণ্ড ত নেই। চোরের চুরি করা ন্যায্য হতে পারে, কেননা সেটা তার ধর্ম।' দেশপাণ্ডে ভয়ানক চটে গেল। আমি বললাম 'এ একটা মত বই ত নয়।'

কিন্তু তা বলে মনে করোনা যে কর্মের ফল বলে কিছু নেই। খ্রীষ্ট বলেছেন 'অপরাধ ঘটে কিন্তু যে ঘটায় তাকে ভুগতে হবে।' (Offences come, but woe unto him by which the offence cometh.) এই বিশ্বপ্রকৃতির একটা নিয়ম আছে (law of being) যা তোমার দ্বারা হত্যা, অত্যাচার ইত্যাদি ঘটাতে চাইবে। স্বেচ্ছাচারের বশবর্তী হয়ে যদি তুমি কাউকে যন্ত্রণা দাও, সে যন্ত্রণা তোমার উপর উল্টো প্রক্ষিপ্ত হবে। এটা কর্মের বিধান।

পুরাণী : সোমনাথ আমায় দুর্যোধনের সেই শ্লোকটা শোনাত : জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তি ইত্যাদি। ধর্ম কি আমি জানি, অধর্ম কি তাও জানি কিন্তু আমার এমন শক্তি নেই যে যা উচিত তা করি।

শ্রীঅরবিন্দ : তুমি যে অন্য অংশটা বাদ দিলে। ত্বয়া হৃষিকেশ... মূল সমস্যা দাঁড়ায় যখন তুমি নিজেকে বা অন্যকে বদলাতে চাও, তখন তুমি বল 'এটা যাওয়া উচিত, ওটা এরকম করা ঠিক নয়', ইত্যাদি। তোমার প্রাণের উপব তুমি মনের একটা নীতি বা নিযম চাপাও। কিন্তু মনেব উর্ধ্বে উঠলে তোমাব আত্মসাক্ষাৎকার হয এবং সেই আত্মার রূপ হল আলো, সত্য পবিত্রতা। যখন তুমি কোন নিয়মশৃখলা বিধান মান, সেটা তোমার আত্মার মঙ্গলের জন্যেই, কোন মনগড়া নীতির বশে নয। যদি তুমি পবিত্রতার একটা আদর্শ অবস্থা পেতে চাও তার পথে সমস্ত অন্তরায তোমায় বর্জন করতে হবে। তেমনি মিথ্যা বলা সম্বন্ধে। যদি সত্য চাও, মিথ্যা বলা বন্ধ করতে হবে; সেটা মনের বিধান অনুসারে ঠিক অথবা ভুল বলে নয, তোমাব আত্মার মঙ্গলেব জন্যে। বহু অংশের মিশ্রণে আমাদের প্রকৃতি গড়া। এক অংশ চায় তার পবিবর্তনেব পক্ষে যে সব জিনিষ বাধাস্বরূপ বা অন্যান্য অংশেব প্রতিকূল, সেগুলো বর্জন করতে কিন্তু আর একটা অংশ প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে।' বোমান কবি যেমন বলেছে 'শ্রেয় কি আমি জানি, কিন্তু চলি প্রেয় পথে।'

পুবাণী : বেদান্ত মতে হাতীর মত দুবকমেব দাঁত আছে, একটা দেখাবার, অন্যটা চর্বণেব জন্যে।

শ্রীঅরবিন্দ : আধ্যাত্মিক দৃষ্টি কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। সেখানে মনের বিচারে ভুল বা নির্ভুলের কোন প্রশ্ন ওঠে না। এ সমস্ত বিধানের অতীত স্তরে গিয়ে সেখানকার দৃষ্টিতে সব কিছুর বিচার চলে। কিন্তু তার জন্যে চাই সর্বভূতে ভগবান দর্শন ও অনুভব। তখন দেখতে পাবে সমস্ত গুণের পেছনে রয়েছেন ভগবান। গীতা গুণ সম্বন্ধে যা বলেছে তার সমর্থন পাবে এবং বুঝবে যে মানুষ তার গুণদ্বারা চালিত

হচেছ্। এইজন্যে রামকৃষ্ণ এক সন্ন্যাসী সম্বন্ধে বলেছেন যে সে তামসিক নারায়ণ। কিন্তু যখন অন্য এক বৈদান্তিক একটি স্ত্রীলোককে সঙ্গে নিয়ে তাঁর কাছে এল, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'ওই মেয়েটিকে নিয়ে ঘুরছ কেন?' বৈদান্তিক উত্তর দিল 'সব কিছুই যখন মায়া, তুমি যা খুসী করতে পার।' রামকৃষ্ণ বললেন 'তোমার ওই বেদান্তের মুখে আমি থুথু ফেলি।'

পুরাণী: বামমার্গে কোন সত্য আছে কি?

শ্রীঅরবিন্দ: জানি না। তবে নিম্নশক্তিদের উপর দিকে তোলবার উদ্দেশ্যে নিশ্চয় এই সমস্ত পরীক্ষা করা হয়েছে। উপনিষদ বলছে সন্তান উৎপাদন করতে হবে ঊর্ধ্বচেতনার বশবর্তী হয়ে।

আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল প্রকৃতির নিয়ম, সেখানে ফিরে আসা যাক। আমার বক্তব্য থেকে তোমরা যেন এই ধারণা করোনা যে নৈতিক আদর্শ বলে কিছু নেই। মানুষ আদর্শ ছাড়া চলতে পারে না, সেটা তার উন্নতির সহায় হয়। হিটলার যে আলোর শক্তির বিরুদ্ধে কাজ করছে, সে ত পরিষ্কার। ঈহুদীদের মতে সে অধর্মের (unrighteousness) সেবা করছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে বলব সেটারও দরকার আছে হয়ত। এমন কি অসুরদেরও প্রয়োজন আছে, রাবণেরও ছিল। প্রবাদ আছে না কি—নানা মালমশলা নিয়ে এই পৃথিবী সৃষ্টি (It takes all sorts to make the world)?

তেমনি আবার অন্যান্য স্তরের (plane) অস্তিত্বও স্বীকার করতে হবে। প্রাণস্তরের ধর্ম হল শক্তি ও সাফল্য। তোমার শক্তি থাকলে তুমি জিতবে। বেগে দৌড়তে পারলে অন্যদের হারিয়ে দেবে। মনের নিয়ম (laws) রয়েছে ভারসাম্য রক্ষার জন্য। সেই নিয়ম-

গুলির সাহায্যে একটা মানসিক জৈবিক আদর্শ খাড়া করা হয় (mental vital standard)।

তার উর্ধ্বে চলে যাও, তখন গীতার সর্বধর্মান্ পরিত্যাজ্য ইত্যাদির সীমায় এসে পৌঁছবে। সেটাই তখন তোমার ধর্ম হবে। কিন্তু শেষের অংশ অর্থাৎ মামেকং শরণং ব্রজ যদি বাদ দাও, তাহলে তোমার অহংকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে, তখন পতন অনিবার্য। হয় অসুর, নয় পাগল, নয় পশু হয়ে বসবে। কিন্তু পশুদেরও ন্যায় অন্যায়ের জ্ঞান আছে। Kipling-এর 'Jungle book'-এ সেটা চমৎকার ফুটিয়েছে। পড়েছ বইটা ?

নীরদ : না !

শ্রীঅরবিন্দ : কিপলিং দেখাচ্ছেন যে দলের কেউ যদি নিয়ম (standard) ভঙ্গ করে, দলশুদ্ধ তারা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মানুষের সঙ্গলাভ করে পশুরা সেই বোধটা আরও বেশি—

এই সময় শ্রীঅরবিন্দের রাত্রের খাবার নিয়ে মা উপস্থিত হলেন।

২৩।১।৩৯

অদৃষ্ট, নিয়তি, বিশ্বপুরুষ ইত্যাদি সম্বন্ধে কালকের আলোচনা আমার মাথা গুলিয়ে দিয়েছে। নানা প্রশ্ন মাথায় ঘুরছে। মনে হচ্ছে যেন শ্রীঅরবিন্দের উত্তরগুলোর মাঝে কোথাও বিরোধ উঁকি-ঝুঁকি মারছে, অথচ সাহস করে বলতে পারছি না। চিঠিপত্রে এরকম দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছি কিন্তু মুখোমুখি বলা যায় কি করে ? তাই পুরাণীকে আমার সমস্যার কথা জ্ঞাপন করলাম।

পুরাণী: নীরদ আপনাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চায়, কিন্তু ইতস্ততঃ করছে, কাল আপনার বক্তব্যের মাঝে বিরোধ রয়েছে যেন...

নীরদ: একবার আপনি বললেন হিটলার যে পথে চলেছে বিশ্ব-পুরুষ তাকে সেই পথে চালিয়ে নিয়ে যাচেছ্ন। আবার বললেন, হিটলারের কর্মের জন্যে বিশ্বপুরুষ দায়ী নয়। এই দুটো কথা কি পরস্পরবিরোধী নয়?

শ্রীঅরবিন্দ: সাধারণতঃ তাই মনে হয়, যখন তুমি কোন উচচতর সত্য প্রকাশ করতে চাও। স্বতোবিরোধী ভাষা ছাড়া প্রকাশ করবার উপায় নেই।

পুরাণী: নীরদ প্রত্যাশা করছে যে আপনার মতামতগুলির যুক্তিবিচারে অসঙ্গতি থাকবে না।

শ্রীঅরবিন্দ: সত্য কি সব সময় যুক্তিসঙ্গত? কিন্তু বিরোধ অর্থ এই নয় যে দায়িত্ব বা নীতি, ন্যায় বা অন্যায় বলে কিছু নেই। ব্যক্তির দায়িত্ব আছে, কেননা সে প্রকৃতির গুণের ক্রিয়া মেনে চলে।

নীরদ: কিন্তু বিশ্বপুরুষই যদি তাকে চালায়?

শ্রীঅরবিন্দ: না, বিশ্বপুরুষ প্রত্যক্ষভাবে তা করে না, ব্যক্তির মাধ্যমে তার কাজ চলে—জীবাত্মা নয় (true individual), যে প্রকৃতির মাঝে আবদ্ধ, সেই ব্যক্তি। বলতে পার ব্যষ্টিসত্তার ব্যক্তিত্ব (individual personality)। আবার, ব্যক্তিত্ব আর পুরুষ (Person) এক নয়। ব্যক্তিত্ব হল তাই, যা মন, প্রাণ ও দেহ-প্রকৃতির সমবায়ে গঠিত।

নীরদ: পুরুষের মাধ্যমে কাজ নাই বা করলেন। ব্যক্তিত্বের বা প্রকৃতির মাধ্যমে যখন কবছেন, আমি বলতে পারি যে আমার প্রকৃতির ক্রিয়ার জন্যে আমি দায়ী নই।

শ্রীঅরবিন্দ: কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম মানবে কি মানবে না সে বিষয়ে তার স্বাধীনতা আছে। অর্জুন ত যুদ্ধ করতে রাজী হলেন না; ফলে, তাকে রাজী করাবার জন্যে ১৮ অধ্যায় গীতা উচ্চারিত হল। ব্যক্তির অন্তরে যে পুরুষ রয়েছে প্রকৃতির ক্রিয়ায় অনুমতি না দেবার ক্ষমতা তারই আছে। তখন প্রকৃতি আর তার স্বাধীন ইচ্ছায় চলতে পারে না। তখনই প্রকৃত মুক্তি আসে যখন পুরুষ জেগে ওঠে এবং জানে যে সে-ই ঈশ্বর।

নীরদ: কিন্তু সাধারণতঃ পুরুষ বদ্ধ?

শ্রীঅরবিন্দ: হাঁ, পুরুষ অনুমন্তা, কিন্তু সে প্রকৃতির কাজে তার সম্মতি নাও দিতে পারে। সে মুক্তি পেতে পারে যদি বিবর্তনধারা থেকে উপরে উঠে যায় অর্থাৎ অহং ও প্রকৃতি নির্মিত ব্যষ্টিরূপ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে।

বিশ্বপুরুষ হল বিবর্তনের উর্ধ্বে, আর ব্যষ্টিসত্তা রয়েছে বিবর্তনের মধ্যে ভালমন্দ দুইই নিয়ে।

নীরদ: তাহলে মন্দের জন্যে ব্যষ্টিসত্তা দায়ী নয়?

শ্রীঅরবিন্দ: প্রথমতঃ মানুষের ভালমন্দের মাপকাঠি দিয়ে সে বিচার করে না। তুমি বলতে পার না যে সে শুধু কোন কোন কাজের দায়িত্ব নেবে, অন্যগুলির নেবে না। বিশ্বপুরুষ ভাল মন্দ, আলো-আঁধারের ভেতর দিয়ে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করছে।

নীরদ: হিটলারকে কেন এই অত্যাচার, নৃশংসতার পথ দিয়ে নেওয়া হচ্ছে?

শ্রীঅরবিন্দ: তার যে রকম প্রকৃতি সে ভাবে ত তার ক্রমবিকাশ হবে।

পুরাণী : যখন পুরুষ প্রকৃতির বশ্যতা হতে মুক্তি লাভ করে তখনই কি ব্যষ্টি বিশ্বপুরুষের ঊর্ধ্বে বিশ্বাতীতের ধারণা করতে পারে ?

শ্রীঅরবিন্দ : হাঁ, অর্থাৎ অজ্ঞান প্রকৃতির যন্ত্র না হয়ে তুমি তখন ভগবানের যন্ত্র হয়ে উঠবে।

পুরাণী : বিশ্বপুরুষ অর্থে কি নৈর্ব্যক্তিক চেতনা বলতে চাচ্ছেন ?

শ্রীঅরবিন্দ : না, বিশ্বপুরুষের ব্যক্তিস্বরূপ (personality) রয়েছে তবে আমাদের সঙ্কীর্ণ অর্থে নয়। তিনি নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয়, সগুণ ও নির্গুণ, দুইই। নির্গুণ সগুণকে আশ্রয় করে আছে।

পুরাণী : আপনি বলেছেন psychicও একটা personality।

শ্রীঅরবিন্দ : হাঁ, সে চৈত্যপুরুষও বটে।

পুরাণী : চৈত্যপুরুষ কি জন্মজন্মান্তরে পরিণতি লাভ করে ?

শ্রীঅরবিন্দ : চৈত্যপুরুষ বা psychic entity যে পরিণতি লাভ করে তা নয়। ব্যক্তির প্রকৃতিতে psychic উপকরণগুলো সে বৃদ্ধি করে এবং ক্রমবিবর্তনের পথে তাকে এগিয়ে নেয়।

পুরাণী : psychic যদি ভগবানের স্ফুলিঙ্গ হয়, তাহলে যাত্রার পুরোধা হিসাবে বেদের অগ্নির যা কাজ, তার কাজও হবে একই।

শ্রীঅরবিন্দ : তাই। অগ্নি হল psychicএর দেবতা এবং সে জীবন যাত্রাকে ঊর্ধ্বপথে নিয়ে যায়।

পুরাণী : psychic আমাদের personality গুলি কি করে জন্মান্তরে নিয়ে যায় ?

শ্রীঅরবিন্দ : মৃত্যুর পর সে তার উপকরণগুলি সংগ্রহ করে জন্মান্তরে সঙ্গে নিয়ে যায়, কিন্তু তা বলে একই personality যে জন্মায় তা নয়। সাধারণ লোক সহজে এসব জিনিস ভুল বোঝে, বিশেষ

করে যখন মনের ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়। অতীত personalityকে রাখা হয় ভিত্তি হিসাবে এবং যে নূতন personality তৈরী করা হয়, সেটা হয় তাব ভবিষ্যৎ বিকাশের প্রয়োজন অনুসারে। একই personality যদি ঘুবে ঘুরে আসে, তার কাজও হবে বৃথা পুনরাবৃত্তি।

পুবাণী: বিশ্বপুরুষেব উপলব্ধি আর অধিমানস উপলব্ধি কি একই ?

শ্রীঅরবিন্দ: হাঁ, কিন্তু বিশ্বচেতনার অভিজ্ঞতা হতে পারে যে কোন স্তবে। সাধাবণতঃ সেটা হয উর্ধ্বতর মনের স্তরে, যেখানে নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয দুটো দিক মনে হয় পৃথক। আরও উপরে উঠলে দেখা যায অধিমানস সকল স্তরকে খিলানের মত ঢেকে রয়েছে এবং একই চেতনার মাঝে এই দুটো দিকই বিধৃত রয়েছে।

(নীরদের দিকে তাকিয়ে) কাজেই দেখ যতক্ষণ হিটলারের বোধ রয়েছে যে সে হিটলার ততক্ষণ সে তাব দায়িত্ব নেই বলতে পারে না। তার শৈশবে সবাই তাকে ভাবত একটা আধপাগলা, কেউ তার দিকে ফিরেও চাইত না। এই অসুরটা তাকে অধিকার করার দরুণ তার মূল্য ও গুরুত্ব বেড়ে গেছে। অসুরশক্তিটা না থাকলে লোকে মনে করত সে একটা খামখেয়ালী অমায়িক গ্রাম্যব্যক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। এই ধরনের লোক যাদের psychic দুর্বল ও অপরিণত তাদেরই দানবে পায়। তাদের সত্তায় এমন কোন পদার্থ নেই যাতে এই সব শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে। তার সাম্প্রতিক ফটোগ্রাফে আমি লক্ষ্য করেছি সে ক্রমশ: কেমন দুর্বৃত্ত (criminal) হয়ে উঠছে এবং দ্রুত নেমে যাচ্ছে। দুটো ছবিতে তবুও তার psychic অংশটা একটু সামনে ছিল, একটায় তার মা'র কবরের সামনে দাঁড়িয়ে সে কাঁদছে—এটা কিন্তু যেন কৃত্রিম ;

অন্যটায়, তার সাবেক গ্রামে বেড়াতে গেছে—এটা আন্তরিক, তার ভাব স্পষ্ট।

নীরদ: লণ্ডন গাড়ীওয়ালার psychic?

শ্রীঅরবিন্দ: হ্যাঁ। মুসোলিনির psychic তার তুলনায় বেশি পরিণত এবং প্রাণশক্তিও প্রবল। কিন্তু সেখানেও তার শেষ ফটোতে দুর্বলতা দেখা দিয়েছে। হয় সে অসুস্থ, নয়ত বুড়ো হচ্ছে, আর নয়ত তার শক্তির অপব্যবহার করেছে। সেজন্যে এই প্রতিক্রিয়া চলেছে।

নীরদ: হিটলার তার কাজের জন্যে নিজেকে দায়ী মনে করে কি?

শ্রীঅরবিন্দ: শুধু নিজের কেন, সমস্ত জার্মানীর দায়িত্ব তার উপর!

পুরাণী: সমস্ত 'আর্যদের'!

শ্রীঅরবিন্দ: অবশ্য! আর্যরা ত জার্মান! দায়িত্ব হতে নিস্তার পেতে হলে অহংকে দূর করতে হবে অর্থাৎ মন, প্রাণ ইত্যাদি কোন ব্যক্তিত্ববোধ (personality) থাকলে চলবে না।

নীরদ: দায়িত্বজ্ঞান না রেখে কাজ করতে পারলেই ত মুক্তি?

শ্রীঅরবিন্দ: এত সোজা নয়! একবার চেষ্টা করে দেখ না! মুখে বলতে পার তোমার কোন দায়িত্ব নেই কিন্তু ভিতরে সে জ্ঞান টনটনে থাকবে। দায়িত্বজ্ঞান থেকে মুক্ত হবার আগে প্রথম তোমায় মুক্ত হতে হবে। তার জন্যে তিনটি উপায় আছে। (১) প্রকৃতি থেকে পুরুষকে পৃথক করা, তাতে উপলব্ধি হবে যে পুরুষ মুক্ত। (২) আত্মার উপলব্ধি, যে আত্মা এই বিশ্ব-প্রকৃতির দ্বারা আবদ্ধ নয়। (৩) বিশ্বাতীতের সঙ্গে একত্ব,—পরমাত্মার উপলব্ধি। বৌদ্ধদের শূন্যে লয় পেলেও মুক্তি হতে পারে।

সত্যেন্দ্র: প্রথম দুটির উপলব্ধিতে পুরুষ কি সাক্ষী হিসাবে থাকে?

শ্রীঅববিন্দ: তেমন কোন কথা নেই। প্রথমটাতে তা হতে পাবে, কেননা পুরুষ প্রকৃতি থেকে পৃথক হযে সাক্ষীস্বরূপ থাকে। দ্বিতীয়টায অর্থাৎ আত্মার উপলব্ধিতে, তোমার বিশ্বব্যাপারের সাক্ষী হবাব প্রযোজন নেই। আত্মা তখন কূটস্থ থাকতে পাবে। নানা অবস্থা আছে, আত্মাব (Spirit) পক্ষে যে কোন অবস্থা লাভ কবা সম্ভব।

এই যোগেব পক্ষেও কোন না কোন রকমেব নির্বাণের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ তোমাব বোধ হওযা চাই যে এই পৃথিবীর কোন মূল্য নেই তোমার কাছে, কারণ বর্তমানে যে ভাবে ও যে উপাদানে সেটা তৈরী, তাকে অজ্ঞানের সৃষ্টি বলতে হবে। তাহলেই সম্ভব হবে প্রকৃত সৃষ্টিব আবির্ভাব—সত্যের ও আলোব জগৎ।

সত্যেন্দ্র: গীতায যে বলেছে 'তুমি সকলেব মাঝে আত্মাকে দেখবে এবং আত্মায় দেখবে সকলকে এবং পরে আমার মধ্যে', কোন আত্মাব কথা বোঝাচ্ছে?

শ্রীঅববিন্দ: ব্রহ্ম-চেতনা অর্থাৎ তুমি সর্বত্র একটিমাত্র চেতনা উপলব্ধি কববে এবং দেখবে যে একই আত্মাব (Self) মাঝে সব বিধৃত। তারপরে তোমার সেই উপলব্ধি হবে যাতে সেই এক যুগপৎ সগুণ ও নির্গুণ, আবাব দু'য়ের অতীত।

বেচারলাল: যাদেব মাঝে আধ্যাত্মিক টান দেখা যায়, তারা নাকি সে 'অধিকাব' নিয়ে জন্মায। সত্যি কি?

শ্রীঅববিন্দ: সত্যি।

বেচারলাল: 'অধিকার' অর্জন করা যায় না?

শ্রীঅরবিন্দ: যায় বই কি। আমরা যখন বলি যে অমুক তৈরী

নয়, তার মানে সে 'অধিকারী' হয়নি কিন্তু নিজেকে তার জন্যে তৈরী করতে পারে।

সত্যেন্দ্র: সৃষ্টির কথা ভাবতে গেলে কোন পার পাওয়া যায় না, ফলে বিরক্তি ও অবসাদ আসে।

শ্রীঅরবিন্দ: শুধু বিরক্তি আসা ত যথেষ্ট নয়। মুক্ত হবার শক্তি থাকা চাই, হয় এই বিবর্তন-চক্র থেকে সরে গিয়ে, নয়ত এমন কিছু লাভ করে যাতে তোমায় এই বিবর্তনের চাকায় বেঁধে রাখতে পারা যাবে না। এমন অনেক যোগী আছে যাঁরা ব্রহ্মে (Spirit) বা বিশ্ব-চেতনায় উঠে গিয়ে বিশ্বপ্রকৃতির হাতে নিজেদের প্রকৃতির কাজকর্ম সঁপে দেয়; সমস্ত দায়িত্বজ্ঞান তখন তাদের লোপ পায়। তাদের চেতনা ঊর্ধ্বচেতনায় নিবদ্ধ থাকে বা তার সাথে এক হয়ে যায়। তাদের বহিঃপ্রকৃতি হয়ত মাঝে মাঝে বশে থাকে না। এই কারণে দেখবে যোগীরা অভদ্র ভাষায় মাঝে মাঝে কথা বলে। অমুকের সেটা ভয়ানক বিসদৃশ লাগে। যোগীরা শিষ্টাচার মেনে চলে না। কখনও তাদের জড় ভাব, কখনও পিশাচ বা বালভাব—তাদের চেতনা ঊর্ধ্বের সাথে সংযুক্ত বলে কিন্তু তাদের প্রকৃতিকে দেওয়া হয় নিজস্ব স্বাধীনতা। সেই ঊর্ধ্বচেতনা লাভ হলে 'আমি কেন ওই ভাল কাজটি না করে মন্দটি করলাম' এরকম অনুতাপ থাকে না।

আর একটা সমস্যা হল—প্রায় যোগীরাই দার্শনিক হিসাবে নিকৃষ্ট। তাদের অভিজ্ঞতা মনের ভাষায় প্রকাশ করবার সামর্থ্য তাদের নেই, কিন্তু বলা চলে না যে তাদের প্রকৃত অভিজ্ঞতা হয়নি বা নেই। তাদের যা অভীপ্সা তাই তারা পায় এবং তাতে সন্তুষ্ট থাকে। মানসিক উৎকর্ষ হল কিনা তার জন্যে তাদের কোন মাথাব্যথা নেই। কাজেই

যে সব জিনিষ যোগী কাম্য মনে করেনি সেগুলো যদি তুমি তার কাছে প্রত্যাশা কর, তাহলে সেই আমেরিকান মহিলার মত ঠকতে হবে। মহর্ষি যেখানে সেখানে থুথু ফেলছেন বলে তার সুরুচি আহত হল। আধ্যাত্মিকতার সাথে তার কি সম্বন্ধ?

সত্যেন্দ্র: সৎ—শুদ্ধ সত্তা যাকে বলি—তাব মাঝে কি চিৎ-চেতনা নেই বলা যায়?

শ্রীঅববিন্দ না। তুমি যাকে সৎ (Being) বলছ, তাতে চেতনা রয়েছে। সেই সৎ থাকে পেছনে অথবা বলা যায় নিষ্ক্রিয়, আর তার চিৎ দিকটা থাকে সামনে।

পুবাণী: আপনি ত বহুবার বলেছেন যে সৎ, চিৎ ও আনন্দ, এরা হল ত্রিপুটি। তাদেব কোন একটি অংশকে আলাদা ভাবা যায় না।

সত্যেন্দ্র: মুস্কিল হল যে এত মতবাদ (system) নিযে পরীক্ষা হয়েছে যে এখন কোনটা বেছে নেব বোঝা শক্ত।

পুরাণী: মনই কি বাছে সব সময়?

সত্যেন্দ্র: তাছাড়া উপায কি? বিভিন্ন তত্ত্ব বা মত আলোচনা করে কি জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় না?

শ্রীঅববিন্দ: তাতে তোমায় জ্ঞানের পথে প্রবেশ করতে সাহায্য করতে পাবে মাত্র। দর্শনেব চেষ্টা হল মানসাতীত যা তাকে মনের গোচর করা। কিন্তু পাশ্চাত্য মনীষার কাছে চিন্তাই হল শেষ ধাপ। এই বিশ্বের একটা ব্যাখ্যা যদি চিন্তার সাহায্যে বের কবতে পার, তাহলে ব্যস। তোমার মননশক্তি সিদ্ধিলাভ করল। এরা মনের খাতিরে মনের ব্যবহার করে, তাতে কোন ফল হয় না। (নীরদের দিকে তাকিয়ে) কাজেই দেখ, বিশ্বটা চেতনার ব্যাপার, তর্কশাস্ত্রের নয়।

নীরদ: দর্শন পড়া কি নেহাৎ দরকার? অভিজ্ঞতা দ্বারা সে জ্ঞান লাভ হয় না?

শ্রীঅরবিন্দ: অভিজ্ঞতা হলে দর্শন পড়া জ্ঞান ত পাবেই, অধিকন্তু আরও কিছু পাবে যা দর্শনশাস্ত্রে পাবে না।

সত্যেন্দ্র: সাংখ্যের পুরুষ আর প্রকৃতির মাঝে ভাগটা একহিসাবে খুব তীক্ষ্ণ। প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার পক্ষে সাহায্য করে।

শ্রীঅরবিন্দ: হাঁ, নিঃসংশয় (Categorical)। সাংখ্য মনে করে পুরুষ ও প্রকৃতি, এই দুটো হল চরম তত্ত্ব। ইউরোপে সাংখ্য ও বৌদ্ধধর্ম সমাদর লাভ করেছে সাংখ্যের এই পুরুষপ্রকৃতির মাঝে তীক্ষ্ণ ভেদ টানার জন্যে। পুরুষ, সাংখ্যের মতে, চেতনাস্বরূপ আর প্রকৃতি জড়, অচেতন। পুরুষের চেতনার আলো প্রকৃতিকে চেতনা-যুক্ত করে। বুদ্ধিও তাদের মতে জড়। আমাদের সেটা গ্রহণ করবার দরকার নেই। বৌদ্ধধর্ম তারা পছন্দ করে তার প্রবল যৌক্তিকতার জন্যে। তার যুক্তির পরিণতি হল শূন্যে। অ-সৎ (Non-being) তার শেষ উদ্দেশ্য। তার মাঝে অজ্ঞেয়বাদের (agnosticism) যে একটা প্রবল স্বর আছে সেটা পাশ্চাত্যমনকে খুব নাড়া দেয়। ওটা যেন শূন্যে ঝুলে থাকার মত অবস্থা, তার ভিত্তি কোথায় বলবার জো নেই।

সাংখ্য ও বিজ্ঞানের মাঝে কিছু মিল আছে। কারণ বিজ্ঞানের মতে বিবর্তনের স্নুরু হয় জড় বা অচেতন থেকে এবং চেতনার ক্রম ধরে অগ্রসর হয়।

সত্যেন্দ্র: আমাদের ভেতরটা এতখানি আঁধারে ভর্তি যে ক্ষুদ্র চেষ্টায় তাকে খালি করা অসাধ্য। যদি সামান্য আলোও পাওয়া যেত—

শ্রীঅরবিন্দ না, সামান্য আলো, সামান্য প্রদীপশিখা যা মনকে একটু প্রদীপ্ত করবে তাতে হবে না। একেবারে গোটা সূর্যের আলো চাই। প্রচুর সময়সাপেক্ষ বটে কিন্তু যদি কোথাও ফাঁক করা যায় তাহলে আলো শনৈঃ শনৈঃ বেশি পরিমাণে ঢুকতে পাবে।

নীরদ কিন্তু আলোর খবর না জানলে কি করে তাকে গ্রহণ করব ?

শ্রীঅরবিন্দ তার অর্থ তোমার মাঝে এমন কিছু আছে যা আলো চায় না। নতুবা জিনিষটা সহজ। পৃথিবীর কথা যদি বল, সে ত বরাবরই আলো প্রত্যাখ্যান করেছে। পৃথিবী প্রস্তুত কি না জানার পক্ষে এটা হল একটা কষ্টিপাথর। দৃষ্টান্তস্বরূপ Pilate-এর কথা ধর। যীশুখৃষ্টকে যখন দণ্ড দেওয়া হল, চারজনের মাঝে একজনকে মুক্তি দেবার ক্ষমতা Pilate-এর ছিল, তার বদলে সে ইহুদীদের উপর ভার দিয়ে তাদের জিজ্ঞেস করল কাকে তারা মুক্তি দিতে চায়। তারা চাইল, ডাকাত Barabbasকে, খ্রীষ্টকে নয়। এখন ধুয়ো উঠেছে যে Barabbas ছিল দেশের বীর, ডাকাত নয়। আর যদি ডাকাতই হয়, তবে হয়ত Robin Hood-এর মত ডাকাত, অথবা রাজনৈতিক বিপক্ষ কেউ। যেটাই হোক, ঈশ্বরের সন্তানের পরিবর্তে অনুগৃহীত হল এক রোমান্টিক ডাকাত, অথবা সত্যের দিশারীর পরিবর্তে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী।

নীরদ আপনি বললেন অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান আসে। আমি যখন মাথার উপর একটা চাপ অনুভব করি, কই আমার ত এই জ্ঞান হয় না যে ওটা ঊর্ধ্বচেতনার ক্রিয়া ?

শ্রীঅরবিন্দ জানবে আস্তে আস্তে। সম্প্রতি তোমায় গুরুবাক্য মেনে চলতে হবে। প্রথমে শ্রবণ, পরে মনন—শাস্ত্রবাক্য।

২৪।১।৩৯

'কোন খবর আছে, পুরাণী?' শ্রীঅরবিন্দ কথা সুরু করলেন। পণ্ডিচেরীতে এখন রাজনৈতিক গোলমাল চলছে। মা ও শ্রীঅরবিন্দ সে সম্বন্ধে খবর জানতে চান। কাজেই যখনই পুরাণী উপস্থিত হয়, শ্রীঅরবিন্দ প্রত্যাশা করেন পুরাণী কিছু খবর নিয়ে আসবে। পুরাণীর সহরের লোকের সাথে আলাপপরিচয় আছে বলে তার খবর পাওয়ার সুবিধা।

পুরাণী: না, কোন নতুন খবর নেই; কিন্তু চম্পকলাল একটা খবর দিল। গান্ধিজী **Dr. Kagawa**কে (জাপানী পরিব্রাজক) উপদেশ দিয়েছেন যে তিনি যেন তাঁর ভ্রমণ-তালিকায় পণ্ডিচেরী আশ্রম ও শান্তিনিকেতনের নাম লেখেন। এই দুই জায়গা না দেখলে নাকি তাঁর ভ্রমণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

শ্রীঅরবিন্দ: ওঃ সে খবর! ওটা আমি শুনেছি। আচ্ছা, আমি তোমায় কিছু খবর দিচ্ছি।

পুরাণী: বলুন।

শ্রীঅরবিন্দ: ফরাসী মন্ত্রীপরিষদ তাদের দুজন ডেপুটিকে আদেশ দিয়েছে অবিলম্বে যেন তারা এরোপ্লেনে পণ্ডিচেরী রওনা হয়। মন্ত্রী যেন আর ড'এর পক্ষ (পণ্ডিচেরীর জনৈক নেতা) সমর্থন করছে না। তাহলে ড'কে এখন দুর্ভেদ্য বলা চলে না। কিন্তু হঠাৎ কেন মন্ত্রীর এই মত পরিবর্তন হল আমি বুঝতে পারছি না। (ড-এর কথা পূর্বের বৈঠকে কিছু আছে)

পুরাণী: ড-এর সম্বন্ধে কিছু খবর আমি শুনেছি, কিন্তু গুজব

বলে চুপ করে ছিলাম। সে নাকি গভর্ণরের অনুপস্থিতিতে সরকারী কাগজপত্র কিছু ওলটপালট করেছে এবং তার বিরুদ্ধে মন্ত্রীকে রিপোর্ট পাঠিয়েছে। গভর্ণর বোধ হয় জানতে পেরে ড-কে জব্দ করতে চায়।

শ্রীঅরবিন্দ : একটা গ্রীক প্রবাদ আছে যে যখন কেউ সৌভাগ্য ও প্রতিপত্তির উচচ শিখরে ওঠে, সে তখন উদ্ধত হয়। ফলে তার কাজ-কর্মে ভ্রান্তি দেখা দিতে থাকে। পরিশেষে তার ঔদ্ধত্য ভগবানের সিংহাসন পর্যন্ত কাঁপিয়ে তোলে। তখন সুরু হয় তার শাস্তি। ড-এর সেটা জানা উচিত ছিল।

গ কিন্তু কখনও ওরকম ছিল না। সে কখনো উদ্ধত ছিল না এবং বরাবর মাত্রা বজায় রেখে চলত। র যখন গ-কে তাদের বিপক্ষ নেতাকে গ্রেপ্তার করতে বলল, গ জবাব দিল, 'কখনো না। সেটা ভয়ানক খারাপ রাজনৈতিক চাল' (Ca, c'est une mauvaise politique) কিন্তু র ছিল গোঁয়ারগোবিন্দ। একই কারণে হিটলারও বেশি দিন টিঁকবে না।

পুরাণী : তাই। সে বড্ড তাড়াতাড়ি উঁচুতে উঠেছে। সেই বেগ সামলাতে পারবে না।

শ্রীঅরবিন্দ : আর একটি বিখ্যাত গ্রীক গল্প আছে, Syracuse-এর tyrant Polycrates সম্বন্ধে। জান? এই tyrant আর একজন tyrant-এর সাথে বন্ধুত্ব করতে চাইল—দুজনেই Sicily বাসী। দ্বিতীয়টি উত্তর দিল 'তুমি বড্ড বেশি ভাগ্যবন্ত। যদি তোমার ভাগ্যশ্রীর কতকটা হ্রাস না হয় অথবা যদি কিছু সম্পত্তি তুমি বিলিয়ে না দাও তোমার সাথে বন্ধুত্ব করতে পারব না।' Polycrates করল কি, তার সৌভাগ্য খর্ব করবার জন্যে উৎসর্গস্বরূপ তার মূল্যবান আংটিটি

জলে ফেলে দিল। একটি মাছ সেটা খেয়ে ফেলল কিন্তু মাছটা ধরা পড়ল একজন জেলের জালে। সে জেলে আবার মাছটা Polycrates-এর কাছে নিয়ে এল। অন্য tyrant ব্যাপারটা শুনতে পেয়ে বলল 'না, না, তোমার সাথে আমার বন্ধুত্ব চলবে না। তুমি বড্ড বেশি ভাগ্যবান!' পরে Polycrates তার প্রজাবিদ্রোহে মারা গেল। 'Polycratesএর আংটি' ইংরেজীতে একটি প্রবাদবাক্য হয়ে গেছে।

রোমান কবি বলেছে 'অসুরদের গুরুভারই (mass) তাদের পতনের কারণ।' উপনিষদেও ওরকম কথা আছে 'অসুরদের ওজন পৃথিবীর পক্ষে অসহ্য ভারী।' কিন্তু এমন চতুর অসুরও আছে প্রবাদ-বাক্য সত্ত্বেও যাদের সৌভাগ্য দিব্যি বাড়তে থাকে।

পুরাণী: একথা কি বলা যায় যে অসুরের কাজ হল প্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করা অথবা মানুষের অন্তরের মূল অভীপ্সার অন্তরায় হওয়া?

শ্রীঅরবিন্দ: (কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে) না, সেরকম কোন ব্যাপক নিয়ম নেই। আসল কথা হল অসুরদের পক্ষে সাম্য রাখা (balance) সম্ভব নয়। কাজেই যে নিয়মের দায়িত্ব হল ভারসাম্য রক্ষা করা, সেটা তখন তাদের আঘাত করে।

এইটুকু বলে শ্রীঅরবিন্দ চুপ করলেন এবং ছাতের দিকে তাকাতে লাগলেন। আমরা প্রতীক্ষা করে আছি আরও কিছু শুনবার জন্যে। কতক্ষণ পরে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "নীরদ, তোমার বিশ্বসমস্যার সমাধান হল?' (তিনি গতকালের প্রশ্নের উল্লেখ করছেন।)

নীরদ: যতদিন অভিজ্ঞতা না হচ্ছে ততদিন ত আশা দেখছি না।...অ নাকি বলেছে যে বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিকতার সাথে লোকসেবা মিশিয়ে দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবটা বিশুদ্ধ রাখতে পারেননি।

শ্রীঅরবিন্দ: কি হিসাবে?

নীরদ: সেটা জানি না। এইটুকুমাত্র আমি শুনেছি।

শ্রীঅরবিন্দ: ওটা যথেষ্ট নয়। সে সম্বন্ধে আমার কোনও জ্ঞান নেই। কিন্তু বিবেকানন্দ কি শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব অনুসারে কাজ করেছেন? লোকসেবা কি তাঁর আদেশ?

নীরদ: যতদূর আমার মনে পড়ছে তিনি যেন 'লোকহিত' বলেছেন।

শ্রীঅরবিন্দ: লোকহিত আর লোকসেবা ত এককথা নয়। গীতাও লোকহিতের কথা বলেছে। লোকহিত করবার অনেক উপায় আছে।

পুরাণী: আমার ধারণা রামকৃষ্ণ সে রকম কিছু বলেননি। বাস্তবিকপক্ষে তাঁর শিষ্যদের মাঝে বিবেকানন্দের এই সমস্ত আইডিয়া নিয়ে বেশ বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়। শেষে কেউ কেউ বিবেকানন্দের পক্ষ নিয়ে বলে 'সে নিশ্চয় আমাদের চাইতে ভাল জানে।' দরিদ্র-নারায়ণ কথাটাই বোধহয় বিবেকানন্দের আবিষ্কার।

সত্যেন্দ্র: কিন্তু কেউ কেউ আপত্তি না করলেও তাতে যোগ দেয় নি, যেমন ব্রহ্মানন্দ। ব্রহ্মানন্দের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি নাকি বিবেকানন্দের চাইতে বেশি?

শ্রীঅরবিন্দ: আমি একবার ব্রহ্মানন্দের সাথে দেখা করতে যাই, বেলুড় মঠে। তিনি সরকারের কাছ থেকে কি একটা চিঠি পান। বিষয়টা আমার সঠিক মনে নেই। সে সম্বন্ধে আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। আমি তাঁকে বললাম কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকতে।

সত্যেন্দ্র : তাঁদের মিশন ত দেখছি এখন বাইরের কাজ নিয়েই বেশি ব্যস্ত। আধ্যাত্মিকতা কিছু আছে কি ?

শ্রীঅরবিন্দ : অনেকের মুখে এ অভিযোগ শোনা যায় ; কি কাজ তাদের ?

সত্যেন্দ্র : ডাক্তারী কাজ, দুর্ভিক্ষে সাহায্য।

শ্রীঅরবিন্দ : দুর্ভিক্ষ ত আর সারাবছরব্যাপী চলছে না। ডাক্তারী একটা কাজ বটে।

সত্যেন্দ্র : শিক্ষাও।

পুরাণী : এখন সর্বত্র গরীবদের খাওয়ান একটা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে—নাম দিয়েছে দরিদ্রনারায়ণের সেবা। মহর্ষির জন্মদিনে, রামদাসের আশ্রমে অজস্র গরীবদের খাওয়ায়।

শ্রীঅরবিন্দ : এতে আমি কোন সার্থকতা খুঁজে পাই নে। সারা বছর ধরে ওরা উপোসে কাটাবে আর একদিন মাত্র তাদের খেতে দেবে, এতে কি লাভ ? একটুখানি বিবেকতৃপ্তি হতে পারে, এই যা। তবে তুমি যদি দারিদ্র্যের মূল কারণটি বের করে সেটা দূর করতে পার, একটা স্থায়ী কাজ করলে বটে।

সত্যেন্দ্র : কিন্তু সেটা ত সোজা নয়, স্যার : রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক ইত্যাদি কত বাধা, অসুবিধা রয়েছে !

শ্রীঅরবিন্দ : তা বলে তার সমাধান নেই বলে আমি মনে করি না। লোকদের শিক্ষা দাও। শিক্ষা বলতে আমি যথার্থ শিক্ষার কথা বলছি, আধুনিক শিক্ষা নয়। তখন সমস্যার সমাধান হবে। ইংলণ্ডে বা ফ্রান্সে আমাদের মত দারিদ্র্য নেই কেন ? এই শিক্ষার জন্য। তারা এত অসহায় নয়।

চম্পকলাল : মহর্ষির গত জন্মদিনে প্রায় ৬০০০ লোককে আনন্দ দান করা হয়েছে। কিন্তু কাউকে তাঁকে স্পর্শ করতে দেওয়া হয়নি। দূর থেকে তাঁকে প্রণাম করে বা তাঁব দর্শন নিয়ে তাবা চলে গেছে। বিশেষ কয়েক ক্ষেত্রে অবশ্য নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছে।

শ্রীঅরবিন্দ : সকলকে যদি স্পর্শ করতে দেওয়া হত, তাহলে তাঁর অবস্থা হত আমেরিকার প্রেসিডেন্টের মত। হাজার হাজার লোকের সাথে করমর্দন করে নাকি তাঁর হাত ব্যথা হয়ে গিয়েছিল। মহর্ষিও নানা জনের প্রসাদ খেয়ে পেটের অসুখে ভুগেছেন। প্রসাদেব স্তূপই নাকি তাঁর পালিয়ে যাবার একটি কারণ।

সত্যেন্দ্র : কিন্তু নিয়তি ফিরিয়ে আনে। ওখানে মহর্ষিকে প্রচুর টাকাও দান করা হয়।

পুরাণী : টাকার কথায় একটা ঘটনা মনে পড়ল। আমি একবার অমুকের কাছে কতকগুলি আর্টের ব্লক চাই। ভদ্রলোক এমন দাম চেয়ে বসলেন যে বাধ্য হয়ে আমার আর্থিক অবস্থার কথা তাঁকে জানাতে হল এক বন্ধুর মারফতে।

শ্রীঅরবিন্দ : তুমি লিখতে পারতে যে তোমার মাসিক আয় দুই টাকা।

পুরাণী : তাই ভাবছিলাম। যাই হোক, তিনি কতকগুলি ব্লক বিনা পয়সায় দিলেন, কিন্তু লিখলেন যে আর্ট আমাদের দেশে নিষিদ্ধ ফল, কোন আর্ট বই বের করা মানে অনর্থক ঋণগ্রস্ত হওয়া। সাধারণ মানুষ আর্টের মর্যাদা বোঝে না।

শ্রীঅরবিন্দ : নীরদের কাছে দর্শনশাস্ত্র যেমন, এদের কাছে আর্টও তাই। (হাস্য)

পুরাণী: Elie Faure-এর মতে গ্রীক আর্ট—স্থাপত্য আর কলাবিদ্যা—নাকি উদ্দাম আবেগের (passion) অসংযত অভিব্যক্তি মাত্র। তাতে কোন রহস্যের ইঙ্গিত নেই।

শ্রীঅরবিন্দ: সে কি? বলছে কি? ভারী অদ্ভুত মন ত। গ্রীস স্থাপত্যে কোথায় উদ্দাম আবেগের অভিব্যক্তি রয়েছে? বরং সর্বত্র তার সংযমেরই ত অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রীকদের সংযম ত সর্বজনবিদিত। অন্যান্য জাতির শিল্পের সাথে তুলনায় মনে হবে এদের আর্ট কত নিস্তেজ নিষ্প্রাণ। কেবল তার অসাধারণ সৌন্দর্যের গুণে সেটা অনুভব করা যায় না। এই বৈশিষ্ট্য অবশ্য Phidias হতে Praxiteles-এর যুগের কথা। পরে Laocoon যুগে তুমি প্রগাঢ় বা উদ্দাম ভাবের প্রকাশ দেখতে পাও বটে।

পুরাণী: Satyrদের কথা স্মরণ করে বোধ হয় এই মত দিয়েছে।

শ্রীঅরবিন্দ: সেটা ত অন্য ব্যাপার। Satyr হল রূপক।

পুরাণী: তার আরও অদ্ভুত যুক্তি হল যে সক্রেটিসকে বিষদান, Themistocles-এর নির্বাসন এবং অন্যান্য মহৎ লোকদের হত্যা, এগুলো উদ্দাম ভাবের পরিচায়ক। গ্রীক জীবনে তখনও শান্ত সাম্য অবস্থা আসেনি।

শ্রীঅরবিন্দ: তার সাথে আর্টের কি সম্বন্ধ?

পুরাণী: অর্থাৎ গ্রীক মনোভাব এই রকম ছিল বলেই সেটা আর্টে প্রকাশ পেয়েছে।

শ্রীঅরবিন্দ: আমি বরং বলব যে এটা তাদের সংযমের পরিচয়, কেননা এভাবে তারা তাদের নেতাদের সীমার মাঝে বেঁধে রেখেছে,

বাড়াবাড়ির অবকাশ দেয়নি। দুজন নেতা যখন শক্তিতে বেড়ে ওঠে, তখন একজনকে তারা নির্বাসিত করে।

এর পরে শ্রীঅরবিন্দ নীরব রইলেন কিছুক্ষণ, যেন কিছু ভাবছেন। আমরা অপেক্ষা করছি আগ্রহসহকারে। "আমি ভাবছিলাম" তিনি সুরু করলেন, "কতকগুলো জাত আছে, সৌন্দর্যবোধ যেন তাদের মজ্জাগত। এখনও আমাদের কাছে যেসব চিহ্ন অবশিষ্ট আছে তা দেখে মনে হয় যেন তাদের প্রত্যেকেরই এককালে সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ ছিল। আমাদের pottery, wood carving ইত্যাদি তার পরিচয়। কিন্তু এগুলো আস্তে আস্তে লোপ পাচেছ। গ্রীস, পুরোনো ইটালির চমৎকার সৌন্দর্যবোধ ছিল। জাপানের বিষয় ত জানই। সেখানকার গরীবদের মাঝেও সেই বোধ রয়েছে। তারা কোন কুৎসিত জিনিষ তৈরী করে ত সেগুলো বিদেশে চালান দেয়। কিন্তু ভয়ের কারণ হচেছ যে তারাও বোধহয় এই অমূল্য সম্পদ হারাতে বসেছে। বর্তমান ধুয়ো হল সব কিছু জনপ্রিয় (vulgarisation) হওয়া চাই। চীন ও জাপানীরা তাদের আর্ট প্রেরণা পায় ভারতবর্ষ থেকে। তাদের বুদ্ধমূর্তিতে ভারতীয় ছাপ রয়েছে। পরে তারা তাদের নিজস্ব ধারায় চলতে থাকে। এখন অনেকের দৌলতে আর্টের শেষ বিদায়ের দিন ঘনিয়ে এল। হিটলার নিশ্চয় জার্মাণ আর্টের দফা শেষ করে দিয়েছে। স্বাধীনতা যেখানে নেই, সেখানে কি আর্ট বাঁচতে পারে? একটি জিনিষের শুধু তোমায় স্তুতি করতে হবে Nazism। আশা করি মুসোলিনি কিছুটা সৌন্দর্য অন্তত বাঁচিয়ে রেখেছে।

নীরদ: কিন্তু ভারতীয় চিত্র পাশ্চাত্য চিত্রের মত উদ্ভট নয়।

পুরাণী: মুসোলিনী ত 'আমাদের আর্ট', 'আমাদের কবি'

ইত্যাদি বুলি আওড়ায়। কাজেই আশা করা যায় পুরোনো ধারা কিছুটা অন্তত বজায় রেখেছে। আমার এক বন্ধু ইটালিতে বেড়াতে যায়; বলছে যে এখনও ইটালিয়ানদের মাঝে শিল্প ও সৌন্দর্যবোধ জীবিত আছে।

শ্রীঅরবিন্দ: সঙ্গীতও। আর্ট আর গানবাজনা হল তাদের প্রাণ (passion)। মাও তাই বলেন। মা যখন উত্তর ইটালিতে বেড়াতে যান, একদিন তিনি এক গির্জায় একা একা অর্গেন বাজাচ্ছিলেন। যখন বাজনা শেষ হল, চতুর্দিক থেকে তুমুল হাততালির শব্দ শোনা গেল। মা দেখলেন, ঘরভরা লোক তাঁকে বাহবা দিচ্ছে।

পুরাণী: ভারতীয় সঙ্গীত, বিশেষ করে দক্ষিণে, আমাদের মন্দিরগুলির দৌলতে বেঁচে আছে। ওস্তাদ গাইয়ে যারা, তারা উৎসবের দিনগুলিতে ওখানে এসে গানবাজনা করে।

নিষ্ঠা ত ভারতীয় জিনিষ দেখে মুগ্ধ। আমাদের মেয়েদের চাল-চলন তাঁর চোখে খুব সুন্দর লাগে। তিনি বলেন, 'তোমরা বুঝবে না, কিন্তু আমি আমাদের পাশ্চাত্য মেয়েদের ভাল করে চিনি, তাদের বুঝি। তোমাদের মেয়েদের চলার ভঙ্গি দেখে মনে হয় তারা আজন্ম নর্তকী। কী সুন্দর ছন্দ!'

শ্রীঅরবিন্দ: সত্যি কথা। মাথায় কলসী নিয়ে চলতে হয় বলে বোধ হয়। তাতে টাল ঠিক রাখতে হয় কিনা।

পুরাণী: আমাদের মেয়েদের রঙিন শাড়ীও তাঁর খুব পছন্দ, বলেন যে তাদের রঙের বোধ আছে।

শ্রীঅরবিন্দ: সেটাও সত্যি। আশা করি আধুনিকতার কবলে পড়ে তারা এসব জলাঞ্জলি দিচ্ছে না।

নীরদ : কিন্তু শাড়ী দেখতে মনোরম হলেও কাজের বেলায় বড্ড অসুবিধাজনক।

শ্রীঅরবিন্দ : কেন? রোমানরা টোগা পরে পৃথিবী জয় করেনি? অনেক মেয়ে শাড়ী পরে শক্ত কাজ করে। অসুবিধা, সুবিধা, উপকারিতা ইত্যাদি বুলি যখন পেয়ে বসে, তখন সৌন্দর্যকে শ্মশানবাসী হতে হয়। এটাই হল আধুনিকতার হাওয়া। সমস্ত জিনিষকে বিচার করবে এক মাপকাঠি দিয়ে—উপযোগা কি না। সৌন্দর্য যেন কিছু নয়।

নীরদ : সৌন্দর্য আর উপযোগিতা (utility) একসাথে মিলেমিশে থাকতে পারে ত?

শ্রীঅরবিন্দ : পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উপযোগিতাই বড় হয়ে দাঁড়ায়।

নীরদ : আমার নিজের বেলায় দেখেছি যে সাহেবি পোষাকে কাজে একটা উৎসাহ ও বেগ পাওয়া যায়; ধুতি পরলেই মনে হয় একটু আরাম করি।

শ্রীঅরবিন্দ : তবুও তার মত জঘন্য পোষাক আর নেই। আমি প্রচুর লোক দেখেছি যারা ধুতি পরে বেশ পরিশ্রমের কাজ করে। সাহেবরা ত এখন short ও shirt পরছে। খুব সুবিধার নিশ্চয়!

পুরাণী : ভারতীয় মহিলারাও সাহেবি পোষাক পরছে।

শ্রীঅরবিন্দ : ভারতীয় মেয়ের সাহেবি পোষাক! কদর্য! তাও আবার মোজা ছাড়া।

পুরাণী : তাই, কিন্তু পাশ্চাত্য মেয়েরাও তাই করছে। তাদের চামড়া পর্যন্ত দেখা যায়।

শ্রীঅরবিন্দ : তাই নাকি? এখন তারা মোজাও ত্যাগ করছে, কিন্তু আগে তাদের হাত ও মুখ ছাড়া সমস্ত শরীর ঢাকা থাকত। লণ্ডনে বাপুভাইএর কথা মনে পড়ছে। সে তার বাথরুম থেকে খালি পা'য়ে যখন বের হয়ে আসছে হঠাৎ এক মহিলার সামনে পড়ে যায়। মহিলাটি লম্বা দৌড়! হোটেলের ম্যানেজারের কাছে নালিশ করে যে সে অর্ধনগ্ন অবস্থায় ঘুরে বেড়াচেছ—ম্যানেজাব তাকে ডেকে সাবধান করে দেয়। চেন তাকে?

পুরাণা : চিনি, বোধ হয়। একবাব রাস্তা পার হবার সময় পুলিশ তাঁকে পাকড়াও করে। ভদ্রলোক ত তাকে ইংরেজীতে লম্বা লেকচার ঝেড়ে হতভম্ব করে দিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ : (হেসে) নিশ্চয়ই সে। ওটা তার বৈশিষ্ট্য বটে।

পুরাণা : এখন বেচারীব মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

শ্রীঅরবিন্দ : মাথা ছিল কোনদিন? সে-ই আমার প্রথম বরোদার বন্ধু। তার বাড়ীতে আমায় নিয়ে যায়। কিছুদিন তার সাথে ছিলাম। বেশ ভাল লোক, কিন্তু একটু—গান্ধি যা বলেন volatile!

২৫।১।৩৯

সময় সন্ধ্যা অর্থাৎ ৭টার পর। মা ধ্যানে চলে গেছেন। পূর্ব-দিনের বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ আবার তোলা হল। শ্রীঅরবিন্দ বললেন যে তিনি বিবেকানন্দ সম্বন্ধে অনেক বই পড়েছেন, কিন্তু খুব অল্প বইতে তাঁর যৌগিক উপলব্ধির উল্লেখ আছে।

সত্যেন্দ্র: তাঁর যেন নির্বাণের উপলব্ধি হয়েছিল। তিনি নিজে সেরকম কিছু বলেছেন।

শ্রীঅরবিন্দ: হাঁ, সেটা সবাই জানে।

পুরাণী: অমরনাথে তাঁর নানা Visionও হয়েছে, কিন্তু কাজ এবং সাধনা—তাঁর এই দুটো প্রবণতার মাঝে যেন একটা দ্বৈতভাব ছিল। তাদের সমন্বয় করতে পারেননি বলে মনে হয়।

শ্রীঅরবিন্দ: তাই!....লেখাব চাইতে তাঁর কথাবার্তায় সম্বোধির দীপ্তি বেশি দেখা যায়। 'The Master as I saw him.' বইটি পড়ে আমাব সে ধারণা হয়েছে। সাধারণতঃ কথাবার্তায়ই এরকম সম্বোধির সাক্ষাৎ ঘটে, অন্ততঃ তাঁর বেলায ত বটে।

নীরদ: আপনি বলেছেন যে তাঁর চিৎপুরুষ (Spirit) আপনার কাছে আসত এবং আপনাকে সম্বোধি বিষয়ে শিক্ষা দিত।

শ্রীঅরবিন্দ: ঠিকই। এসব বিষযে আমার তখন কোন জ্ঞান ছিল না, তাঁকে আমি প্রত্যাশাও করিনি, তবুও তিনি এসে ওসব শিখিয়ে যেতেন। একেবারে ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম বিষয়েবও নিখুঁত ও যথার্থ বর্ণনা দিতেন।

নীরদ: এ ত ভারী মজার ব্যাপার! জীবদ্দশায় তিনি যা জানতেন না, পবে তাঁর আত্মা তা জানত?

শ্রীঅরবিন্দ: কেন নয়? আত্মা পরে সে জ্ঞান লাভ করতে পারে।

সত্যেন্দ্র: তাহলে মৃত্যুর পর আত্মার বিকাশ হয়?

শ্রীঅরবিন্দ: অবশ্য। জীবদ্দশায় তিনি হয়ত জানতেন না, কিম্বা জানতেন কিন্তু বলতেন না। যোগী যা জানে, তার সব কিছু বলে না। যতটুকু দরকার, ততটুকুই বলে। আমি যা জানি সমস্তই যদি লিখতাম, তাহলে ত লেখা আরও দশগুণ বেড়ে যেত।

সত্যেন্দ্র: আপনি যা লিখেছেন, তা দিয়েই ত আপনার বিচার হবে।

শ্রীঅরবিন্দ: (হেসে) হোক না।

পুরাণী: লোক না পোক!

নীরদ: তাহলে এত সব জিনিষ আমাদের জানা হবে না?

শ্রীঅরবিন্দ: যা লিখেছি, আগে সেগুলো অভ্যাস ও উপলব্ধি কর ত!

নীরদ: যাঁরা উর্ধ্বচেতনায় বাস করেন, তাঁরা কি অন্য যোগীদের উপলব্ধি সম্বন্ধে জানতে পাবেন?

শ্রীঅরবিন্দ: হাঁ, যদি তাঁদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন হয়।

পুরাণী: বিবেকানন্দ তাঁর লেখায় সকলের মধ্যে ব্রহ্মের উপলব্ধি —এটার উপর জোর দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন, "তাঁরই আবাধনা কর এবং অন্য সব প্রতিমা ভেঙে ফেল। আমি পূজা করি আমার পতিত, পারিয়া ও অস্পৃশ্য ভগবানকে।"

শ্রীঅরবিন্দ: কিন্তু অন্য সব প্রতিমা ভেঙে ফেলতে হবে কেন? তিনি কি বলতে চান যে অন্যদের চাইতে পতিত ও দরিদ্রদের মাঝে ব্রহ্মের অংশ বেশি রয়েছে?

পুরাণী: ব্রহ্ম যদিও থাকেন, তিনি হবেন 'সমম্ ব্রহ্মম্'

শ্রীঅরবিন্দ: অ ঠিকই বলেছে। লোকসেবার আইডিয়াটা বিবেকানন্দ এনেছেন বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টধর্ম থেকে। গান্ধি সম্বন্ধেও তাই। কিন্তু শুধু লোকের সেবা কেন? বৌদ্ধ ও জৈনধর্মে পশু সেবারও স্থান আছে। তবুও বৌদ্ধ ধর্মের আইডিয়া হল 'করুণা'।

প্রাচীন ঋষিরাও বলতেন, 'সর্বভূতেষু'—সমস্ত প্রাণীদের মাঝে, শুধু মানুষ নয়।

সত্যেন্দ্র : কিন্তু তাকে কাজে পরিণত করবার উপায় কি ?

শ্রীঅরবিন্দ : সেটা নির্ভর করবে ব্যক্তিবিশেষ ও তার প্রবণতার উপর।

সত্যেন্দ্র : বুদ্ধ মুক্তি চাইলেন সমস্ত মনুষ্যসমাজের জন্যে, তাঁর নিজের জন্যে নয়।

শ্রীঅববিন্দ : মুক্তি ত তিনি চাননি। তিনি চেয়েছেন কি করে সংসাবেব দুঃখ যন্ত্রণা হতে নিষ্কৃতি পাওযা যায়।

সত্যেন্দ্র : তা হলেও তিনি নিজের জন্যে সেটা চাননি, সবাইর জন্যে চেযেছেন।

শ্রীঅববিন্দ : ঠিক কথা। কিন্তু নিজেব জন্যে আগে সেটা লাভ না করে পরেব জন্যে কি করে চাইবে ?

সত্যেন্দ্র : তিব্বতী বৌদ্ধরা বলে নির্বাণ একটা ধাপ মাত্র।

শ্রীঅরবিন্দ : তাই নাকি ?

পুবাণী : বৌদ্ধধর্মেও দুটো পথ আছে : জ্ঞান ও ভক্তি। তারা বুদ্ধকে অবতার মনে করে।

শ্রীঅরবিন্দ : মহাযানীদের হল জ্ঞানের পথ। কিন্তু সমস্ত বৌদ্ধেরাই কি এই মন্ত্রটি জপ করে না 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শবণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি' ? অথচ বুদ্ধ বলেছেন যে নিজের চেষ্টায় সব কিছু অর্জন করতে হবে, কাজেই বুদ্ধ এই মন্ত্রদাতা হলেন কি করে ?

সত্যেন্দ্র : বুদ্ধ নাকি নির্বাণের দুয়ার থেকে ফিরে আসেন ?

শ্রীঅরবিন্দ : আমার ত ধারণা সেটা অমিতাভ বুদ্ধের সম্বন্ধে বলা হয়। তিনিই নির্বাণে লয় পেতে চাইলেন না। জাপানীরা অমিতাভ বুদ্ধেরই একনিষ্ঠ উপাসক। আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা প্রমাণ করতে চায় যে বুদ্ধ বলে কেউ ছিল না, তাঁর জীবনীটা পরবর্তী কালের আবিষ্কার।

পুরাণী : তিব্বতী লামারা নাকি সরাসরি বুদ্ধের "Talku".

দালাই লামারা কি ভাবে নির্বাচিত হয়, কোন কোন লক্ষণের সাহায্যে, পুরাণী এখানে তার বিবৃতি দিল।

শ্রীঅরবিন্দ : আমি শুনেছি যে সব দালাই লামাদের অল্প বয়সে মৃত্যু হয়, ইউরোপীয়ানেরা তাই বলে। যেই তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে নিজেদের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করে, তাদের নাকি বিষ খাইয়ে মেরে ফেলা হয়। সত্যি কথা ?

পুরাণী : আমি সেরকম কিছু শুনিনি। বোধ হয় আজগুবী গল্প।

সত্যেন্দ্র : জাপানে কি Zen Buddhism এখনও জীবিত রয়েছে ?

শ্রীঅরবিন্দ : নিশ্চয়। Lady B ওখানে যাচ্ছে তার চর্চা করতে। Zenদের ভয়ানক কঠোর নিয়মকানুন।

পুরাণী তাদের ধ্যান বিষয়ে একটি ঘটনা বিবৃত করল এবং বলল যে যারা নিয়ম ভঙ্গ করে তাদের সাংঘাতিক প্রহার দেওয়া হয়।

শ্রীঅরবিন্দ :' আমাদের এখানেও সেরকম কিছু সুরু করা উচিত এবং পুরাণীকে নিযুক্ত করা হবে একজন প্রহারদাতা। (হাস্য)

পুরাণী : মাদাম Neele লামাদের তিনটি শ্রেণী করেছেন ; সাধারণ, তারা নীচু স্তরের, চায় শুধু আহার ও আরাম ; এরাই সংখ্যায় বেশি। দ্বিতীয় হল, যারা মননশাল ও শিল্পী এবং তৃতীয়, মিষ্টিক বা যোগী।

শ্রীঅরবিন্দ : সেটা ত সমস্ত সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়সম্মত। আমি এক ভোজের বর্ণনায় পড়েছি যে সন্ন্যাসীরা মাতাল অবস্থায় নাচানাচি করছে। আবার পণ্ডিত-সন্ন্যাসীও একটা পরিচিত টাইপ, খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মাঝেও দেখবে একটি শ্রেণী আছে পেশাদাবী সন্ন্যাসীদের দান দক্ষিণা সেবা ইত্যাদি তাদের নিত্য কর্ম। দ্বিতীয় টাইপ হল সে সব সন্ন্যাসী যারা ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি বিষয় চর্চা করে। ধ্যান ধারণা যারা করে, তাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। Carmelite সম্প্রদায় থেকে অনেক সাধুর (saint) আবির্ভাব হয়েছে, সর্বশেষ হল St. Teresa ও St. John.

সত্যেন্দ্র : এই St. Teresa হলেন স্পেনদেশীয়া। আর একটি হলেন ফরাসী, তিনি আরও পরবর্তী।

শ্রীঅরবিন্দ : স্পেনজাতের মাঝে অনেক অসাধারণ সাধুর আবির্ভাব হয়েছে। কারও কারও অভিজ্ঞতা খুব জোরালো। জার্মাণ মিষ্টিকদের মাঝে জ্ঞানের দিকটা বেশি দেখা যায়,—তারা দার্শনিক জাত কি না। Beohme, Eckhart যেমন। ফরাসী সাধুদের মাঝে দেখবে প্রেম, দানশীলতা ও জ্বলন্ত তীব্রতা। ইংরেজ সাধুরা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দারুণ রাজনীতিবিদও। কি করে যে তারা সাধু খ্যাতি লাভ করে জানি না। হয় তারা অন্যদের মারে, নয় নিজেরা মরে। Becketকে হত্যা করা হয়। St. Dunstan রাজার মন্ত্রী হয়ে মারল এক রাজাকে।

সত্যেন্দ্র : Teresa-র জীবন ছিল শান্ত অথচ তীব্র। তিনি বলতেন "মানুষের জন্যে আমি আমার স্বর্গ বিলিয়ে দেব।" তাঁর মৃত্যুর পরে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটে।

শ্রীঅরবিন্দ : Dunstan করত কি—তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের ডেকে এনে একটি রুমের অর্ধেকাংশে বসিয়ে তাকে 'মাইন' করত। এটাও একটা অলৌকিক ঘটনা বটে।

Irish বা Celt সাধু ও প্রচারকেরা ইউরোপের অধিকাংশ খ্রীষ্টানধর্মে দীক্ষিত করে। তারাই আবার দান করেছে শ্রেষ্ঠ খৃষ্টান দার্শনিক। তারা ছিল আমাদের বৈদান্তিকদের মত এবং একই ধরনের নিয়মকানুন মেনে চলত। সীজারের উত্তরাধিকাবীরা তাদের প্রথম দমন করে, পবে গির্জার পুরোহিতরা।

ঈহুদীদের নানা মিষ্টিক প্রতীক আছে তাদের কাবালায়। প্রথমে তাদের মিষ্টিসিজম্ বলে কিছু ছিল না, আত্মাব অমরতায় তারা বিশ্বাস করত না। তাদের ধারণা ছিল যে ঈশ্বর তোমার জন্মের সময় প্রাণ বাযু ঢুকিয়ে দেন এবং মৃত্যুর সময় তা টেনে নেন। ভবিষ্যৎ জীবন বা জন্মান্তর নেই, একটা মাত্র জীবন, এই জীবনেই শাস্তি বা পুরস্কার যা পাবার পাব। Chaldean ও Persianদের কাছ থেকে মিষ্টি-সিজম গ্রহণ করল, যখন তারা বাবিলন ও পারস্যে কারারুদ্ধ ছিল সেই সময়। Chaldean ও Egyptian-এর মাঝে বেশ সাদৃশ্য আছে।

২৬।১।৩৯

আজ পণ্ডিচেরী রাজনীতি সম্বন্ধে দুএকটা কথার পর স্পেনের অন্তর্যুদ্ধ সম্বন্ধে কথা উঠল। পুরাণী বলল, "Barcelona-র ত যায় যায় অবস্থা! ফরাসীরা শেষ মুহূর্তে জেগে উঠেছে।"

শ্রীঅরবিন্দ: তাই। ডেমোক্রেসীর নেতৃবৃন্দ খুব সাহস দেখাচ্ছে বলা যায় না।

সত্যেন্দ্র: এই সমস্ত পলিটিকেল আইডিয়ার জন্যে বৃথা যুদ্ধ করে কোন লাভ নেই মনে হচ্ছে। আজ ডেমোক্রেসীর জন্যে লড়লে, কাল রাজার জন্যে, পরশু ডিক্‌টেটারের জন্যে।

শ্রীঅরবিন্দ: ঠিক কথা। সমস্ত মানবীয় মূল্যবোধই অসম্পূর্ণ, আপেক্ষিক। তাদের কোন স্থায়িত্ব নেই।

সত্যেন্দ্র: যদি মানুষের মননশক্তি বাড়ত (mentalised), হয়ত তারা ভাল বুঝতে পারত।

শ্রীঅরবিন্দ: মননশক্তির সাহায্যে? না, তাদের বাধা হল তারা জীবনের নীতিনিয়ম অনুসরণ করে চলে না।

সত্যেন্দ্র: বুঝতে পারলাম না।

শ্রীঅরবিন্দ: জীবন নানা বিভিন্ন বা বিরুদ্ধ উপকরণের মাপে একটা আপোষের সৃষ্টি করে কিন্তু মন যখন একলা চলে, একলা কাজ করে, কোন আপোষ মানতে চায় না। একটা বিষয় নিয়ে তাকেই একমাত্র সত্য মনে করে, যেন অন্য সত্যের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে, এমন কি বিরোধিতার সূত্রপাত করে। হেগেল গর্ব করে বলত যে ইউরোপে তারা যুক্তিকে জীবন থেকে পৃথক করে ফেলেছে। এখন দেখ তাদের দর্শনের অবস্থা। জীবনের সাথে কোন যোগ নেই, শুধু কথার, মনের কসরত। অপর পক্ষে, ভারতীয় দর্শন বরাবর জীবনের সাথে যোগ রেখে চলেছে; জীবনেরই একটি অংশ সে, তার একটা উদ্দেশ্য আছে। এই জন্যে ইউরোপের রাজনৈতিক দর্শন হল একমুখী। ডেমোক্রেসী যদি হয় তাহলে শুধু

ডেমোক্রেসী; আর সব কিছু তার বিরুদ্ধপক্ষ। রাজতন্ত্র রাজতন্ত্রই। গ্রীসে তাই ঘটেছে, তারা ডেমোক্রেসী, অভিজাততন্ত্র, রাজতন্ত্র সব কিছুর জন্যেই যুদ্ধ করেছে। শেষে রোমানদের হাতে পরাজিত হল।

সত্যেন্দ্র: তাহলে এসব রাজনৈতিক সংঘের মূলে কোন সত্য নেই?

শ্রীঅরবিন্দ: যদি তুমি কোন স্থায়ী সত্য পেতে চাও, তাহলে জীবন থেকে শিক্ষা নিতে হবে। অর্থাৎ কি কি বিরোধিতা বা অসঙ্গতি বৈপরীত্য রয়েছে সেগুলো বিচার করে তাদের মাঝে একটা আপোষের চেষ্টা কর। শাসনকার্যের বেলায় জীবন আমাদের দেখাচ্ছে যে রাজতন্ত্রে একটা সত্য আছে, রাজতন্ত্রটা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া হোক কি নির্বাচন সম্মত হোক অর্থাৎ শীর্ষস্থানীয় কেউ একজন থাকে যে শাসনভার বহন করে। জীবনে দেখতে পাই একটা সত্য অভিজাত-তন্ত্রে, সেটা বলশালী, বিত্তশালী বা বুদ্ধিজীবী যার দ্বারাই গঠিত হোক। আমাদের ধারণা সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকেরাই শাসনকার্য চালায়—সেটা অলীক কল্পনা; সত্য হল মুষ্টিমেয় অর্থাৎ অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরাই শাসন করে। জীবন আরও দেখায় রাজার শাসনই বল বা অভিজাততন্ত্রের শাসনই বল, তাতে সাধারণের নীরব বা প্রকাশ্য সম্মতি চাই। জীবন আবার দেখাচ্ছে যে বৈশ্য বলে একটা শ্রেণী আছে।

প্রাচীন ভারতবর্ষে এ সমস্ত সত্য স্বীকার করা হত। সেজন্য ভারতবর্ষ আর চীন যুগ যুগ ধরে বেঁচে আছে। ইংরেজ রাজনীতি যে সাফল্যলাভ করেছে তার কারণ হল ইংরেজ রাজ্য বরাবর এরকম দুএকজন শক্তিমান লোক পেয়েছে। ভিক্টোরিয়ার যুগে সেই নেতা

ছিল হয় Gladstone, নয় Disraeli ; যখন তাদের পার্টির পরিবর্তন হয তখনও শাসনপ্রাপ্ত অন্য পার্টির দ্বারা আমূল পরিবর্তন কিছু হয় না। একটু আধটু অদল বদল কবে তারা পুরোনো নীতিই চালিয়ে যায়।

ফ্রান্সে কোন সরকাবই স্থায়ী হয না! কখনও কখনও অল্প দিনের ভেতর উল্টে যায়। নূতন সরকার পুরাতনেরই ছবি মাত্র। কেবল Blum কিছু আমূল পরিবর্তন করতে চেয়েছিল কিন্তু তাকে তাড়িয়ে দিল।

*

পুবাণী: অমুকের বিবৃতিটা পড়েছেন?

শ্রীঅববিন্দ: পড়েছি। তার যুক্তিটা অদ্ভুত। যেহেতু দক্ষিণ-পন্থীরা সংখ্যায় অধিক কাজেই বামপন্থীদেব পক্ষ হতে সভাপতি নির্বাচিত হোক। আব 'আমরা শেষ পর্যন্ত লড়ব' বলবার মানে কি? বিপ্লবেব সময় বলা যায কোন আপোষ চাইনা। কিন্তু একবার যখন আপোষ মেনে নিয়েচ তখন এই রকম বিবৃতি অর্থহীন। যা লাভ করা গেছে তাকে মূলধন কবে বাকী অংশের জন্য চেষ্টা করতে হবে। সত্যমূর্তি ফেডারেশনের যে নক্সা দিয়েছে সেটা আমার মনঃপূত হয়েছে। দেশীরাজ্যের প্রজাদের যদি কেন্দ্র সভায় স্থান দেওয়া হয়, আর সরকার যদি প্রাদেশিক শাসনে Veto না চালায়, তাহলে কার্যতঃ হোমরুলই পাওয়া গেল।

পুরাণী: বড়লাটের দীর্ঘদিন বোম্বাইতে থাকার অর্থ আছে যেন। গোপনে কিছু একটা চলছে। হয়ত Dr. Kher বা Rajaji-কে ফেডারেশনের কেন্দ্র সভার মুখ্য নেতা করতে চায়।

শ্রীঅরবিন্দ : তাই নাকি ? Dr. Kher বেশ সমর্থ লোক বলে মনে হয়। সোসিয়ালিষ্টদের ফাঁদে ধরা পড়েনি।

পুরাণী : বল্লভভাই ত সাংঘাতিক সোসিয়ালিষ্ট বিরোধী। বরোদায় তাদের তিনিই ধ্বংস করেন

শ্রীঅরবিন্দ : এই সোসিযালিষ্ট দল জানে না সোসিয়ালিজম্ কাকে বলে।

পুরাণী : Sind Assembly তে অনেক হাস্যকর ব্যাপার ঘটেছে। লীগের গুণ্ডামি প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

শ্রীঅরবিন্দ : Sindএর প্রধান মন্ত্রী—তার নামটা কিছুতেই মনে আসেনা—শক্তিশালী লোক বলে মনে হয়। জনসাধারণের বিরাগভাজন হলেও সে নিজের মতামত ছাড়ে না। এটা কম জোরের কথা নয়। Sindএর মুসলমানেরা ত কংগ্রেসে যোগ দিতে উৎসুক। সেখানে Coalition মন্ত্রীত্ব গঠনের জন্য কংগ্রেসের চেষ্টা করা উচিত। এখন ত কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব প্রায় সর্বত্র সফল হযেছে। তাতেই প্রমাণ হয় যে ক্ষমতা পেলে আমরা শাসন করতে পারি।

নীরদ : কেবল বাংলা পাঞ্জাব রইল লীগের অধীনে।

শ্রীঅরবিন্দ : বাংলায় লীগ তেমন প্রবল নয় , প্রজা পার্টি রয়েছে বলে। পাঞ্জাবে অবশ্য Hyat Khan বেশ উপযুক্ত লোক। কেবল U.P.তে লীগের প্রাধান্য। কংগ্রেস যদি Sindকে দলে টানতে পারে তাহলে বাংলা পাঞ্জাবের দুই প্রধান মন্ত্রী ভারতের দুই বিপরীত প্রান্তে দাঁড়িয়ে একে অন্যের মুখ চাওয়াচাওয়ি করবে।

নীরদ : হক সাহেব কি করে প্রধানমন্ত্রী হল, নাজিমুদ্দিন থাকা সত্ত্বেও ?

শ্রীঅরবিন্দ : নাজিমুদ্দিন জনপ্রিয় নেতা হতে পারবে না। হকের কোন স্থিরতা নেই। এদের অনেকেই স্বার্থান্বেষী।

পুরাণী : লীগের এখন ক্ষমতার হ্রাস হচ্ছে। গান্ধি পরিষ্কার রায় দিয়েছেন যে তাদের সাথে আর কোন আপোষ চলবে না।

শ্রীঅরবিন্দ : কিন্তু তাদের সাথে কথাবার্তা চালাবার কি প্রয়োজন ছিল কংগ্রেসের ? তাতে ওদের অযথা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাঞ্জাবে কংগ্রেস এত দুর্বল কেন ?

পুরাণী : সোসিয়ালিষ্ট ও পুরোনোদলের জন্যে বোধ হয়। বাজাজ ত আবার জয়পুরে সত্যাগ্রহ সুরু করেছেন। গান্ধি মত দিয়েছেন।

শ্রীঅরবিন্দ : বাজাজ যখন কংগ্রেসওয়ালা, তখন কংগ্রেসকে সাহায্য করতে হবে।

দেশীরাজ্য যখন ক্ষমতা পাবে, তখন রাজাদের কি অবস্থা হবে ? দস্তখত করা ও শিকার ছাড়া আর কোন কাজ ত থাকবে না। Gaekwar-এর দালান তৈরীও শেষ।

পুরাণী : শিকার কোথায় করবে ? বনজঙ্গলের ত উচ্ছেদ করে দিচ্ছে।

শ্রীঅরবিন্দ : না, না। বনজঙ্গল রক্ষা না করলে পশু সব নিশ্চিহ্ন হবে। চীনে দেখ, তাদের বনজঙ্গল নেই, সেজন্যে প্রত্যেক বছর বান ডাকছে।

নীরদ : এত রাজা মহারাজা নবাব ব্যাঙের ছাতার মত ছড়িয়ে আছে।

শ্রীঅরবিন্দ : জার্মানীরও একসময় সেই অবস্থা ছিল। নেপোলিয়ান

দিল অর্ধেক সাফ করে, হিটলাব বাকী অর্ধেক। হিটলার ঠিক নয়, যুদ্ধোত্তর যুগ। জাপানেও একই অবস্থা, কিন্তু রাজারা স্বেচ্ছায় তাদের ক্ষমতা ও উপাধি ত্যাগ করল, কর্তব্যের ডাকে—দেশের প্রতি কর্তব্য।

নীরদ : তাদের বাজাদের উদ্ভব কবে থেকে ?

শ্রীঅরবিন্দ : মিকাডো দেবী সাবিত্রীর বংশধর বলে মনে করে নিজেকে। Mikado Magi-র তাই বিশ্বাস ছিল এবং অনুভব করত যে ঊর্ধ্বশক্তিব প্রেরণাই তাদেব চালাত।

জাপানে দু'রকমের চেহাবা দেখা যায় ; একটা হল লম্বা, মুখের আভিজাত্যবিশিষ্ট সুশ্রী গঠন, লম্বা নাক। তাবা হল 'Inau', অষ্ট্রেলিয়া ও পলিনেশিয়া হতে তারা আসে। এরাই জাপানে সামুরাই সভ্যতাব (Culture) প্রচলন করে। ঠাকুর বাড়ীতে এই রকম বৈশিষ্ট্যের এক জাপানীর সাথে আমার দেখা হয়। চমৎকার তার চেহারা। অন্য রকমের জাপানী হল সাধাবণত যা আমরা দেখি, mongol টাইপের, দেখতে ভাল নয়।

পুরাণী এখন কথা তুলল ডিকটেটারদের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে। তাদের মাঝে একচ্ছত্র প্রভুত্বের লিপ্সা থাকে (authority complex), যেমন হিটলার। তার কর্তৃত্বাধীন যারা, তারাও নিজেদের মস্ত লোক মনে করে। তাদের এমন ধারণা জন্মায যে হিটলার তাদের জন্যে লড়াই করছে, তারা হিটলারের জন্যে নয়। ডিক্‌টেটাররা মনে করে ভগবান ও ধর্ম তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী, সে হেতু ধর্মের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তারা।

শ্রীঅরবিন্দ : কিন্তু মুসোলিনী সম্বন্ধে তা বলা চলে না। হাঁ,

কামাল ও ষ্টালিন তাই ছিল বটে। মুসোলিনী পোপকে অনেক ক্ষমতা দান করল এবং ক্যাথলিক ধর্মকে সরকারী ধর্ম বলে গ্রহণ করল।

পুরাণী : কামাল সম্বন্ধে একটা গল্প পড়েছি যে কামাল মাতাল অবস্থায় এক মিশরীকে চপেটাঘাত করে, কেননা তার মাথায় ফেইজ টুপি ছিল।

শ্রীঅরবিন্দ : ওঃ, সাংবাদিক সম্পর্কে গল্পটা শোননি?

পুরাণী : না ত!

শ্রীঅরবিন্দ : এক তুর্কী যুবক সাংবাদিক তুর্কী সরকারের কড়া নিন্দা করে এই বলে যে তুর্কী শাসন-কার্য চালাচ্ছে কতকগুলি মাতালের দল। কামাল তা শুনে তাকে ভোজে নিমন্ত্রণ করে পাঠাল। ভোজের শেষে কামাল তাকে বলল, 'ওহে ছোকরা, তুমি নাকি লিখেছ তুর্কী শাসন করছে কতকগুলি মাতাল? আমি বলছি, কতকগুলি মাতাল নয়, শুধু একটি মাতাল।'

পুরাণী : ষ্টালিন Ukrania-র কৃষকদের অনাহারে মেরে ফেলে, তারা খাজনা দিতে রাজী হয়নি বলে। সেখানে জোর করে যৌথ কৃষিব্যবস্থা (Collectivization) প্রচলনের চেষ্টা করছিল নাকি। ষ্টালিন বলে, একবার যদি কৃষকদের কাছে নতি স্বীকার করা হয় তাহলে আর নিস্তার নেই।

শ্রীঅরবিন্দ : একেই বলে সোসিয়ালিজম। কিন্তু প্রকৃত কম্যুনিজম্ সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিষ। সোভিয়েত যদি তার গোড়াকার প্রেরণাগুলি কার্যে পরিণত করতে পারত তাহলে একটা কৃতিত্ব হত বটে। মুসোলিনি প্রথমে একটা যুক্তরাষ্ট্র (Corporate state) গঠন করতে চেয়েছিল কিন্তু সঙ্কল্পটা ছেড়ে দিল।

পুরাণী : আমেদাবাদে সোসিয়ালিষ্টরা Trade unionগুলি ভেঙ্গে দিতে চেষ্টা করে। আমাদের কৃষকেরা ত তাদের আমলই দেয় না।

শ্রীঅরবিন্দ : কৃষকরা ? সোসিয়ালিজম সেখানে কোন পাত্তা পাবে না। তারা তোমার পক্ষ নেবে যতদিন তুমি তাদের জায়গা জমি দেবে, জমিদারী প্রথা তুলে দিতে রাজী হবে। কিন্তু যেই তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে সোসিয়ালিজমের ধার দিয়েও যাবে না। প্রকৃত কম্যুনিজম অবশ্য অন্য জিনিষ। সোসিয়ালিজমে সরকার পদে পদে কর্মচারীদের বাধা দেয়! কর্মচারীরাও তহবিলের অর্থ আত্মসাৎ করে।

পুরাণী : তাছাড়া তারা শাসনযন্ত্রের সাথে এমন ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত যে তাকে কৌশলে নিয়ন্ত্রিত করে ক্ষমতা তাদের হাতেই রাখে।

শ্রীঅরবিন্দ : আমলাতন্ত্রই তাদের হর্তাকর্তা এবং তারাই শাসন নীতি চাপায় তাদের স্বাধীন বিচার অনুসারে, সংঘের মঙ্গলামঙ্গল নিরপেক্ষ হয়ে। কিন্তু প্রকৃত কম্যুনিজমের নীতি ছিল যে জমিজমা সমস্ত সংঘেরই সাধারণ সম্পত্তি এবং সংঘের প্রত্যেক ব্যক্তি মজুব খাটবে এবং উৎপন্ন দ্রব্যের অংশ পাবে।

আমাদের দেশেও গ্রামে গ্রামে একধরনের কম্যুনিজম ছিল। গোটা গ্রামটা ছিল যেন একটা মস্ত পরিবার এবং অধস্তন ব্যক্তিরও পারিবারিক সূত্রে নিজস্ব অধিকার ছিল। ধোপা, নাপিত, কামার প্রভৃতি সবাইর প্রয়োজন মেটাবার সুযোগ ছিল।

সারাদেশময় এই রকম বহু সংঘের সৃষ্টি হতে পারে এবং প্রত্যেক সংঘ স্বস্ব স্বাধীনতা বজায় রেখে একতাবদ্ধ উদ্দেশ্যে পরস্পরের কাজকর্ম এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করবে যাতে একটা যোগাযোগ ও সমন্বয় বজায় থাকে।

শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা

২৭।১।৩৯

আজ বিকেলে বিবেকানন্দের লেখা একটা চিঠি পড়া হল। চিঠিটা লেখা হয়েছে Miss J. Macleodকে, ১৯০০ সালে কালিফোর্নিয়া থেকে। সার মর্মটা এই রকম :

জো, আমি একটি শিশুমাত্র, সেই শিশুটি যে দক্ষিণেশ্বরে বটগাছের তলায় রামকৃষ্ণের পায়ের তলায বসে তাঁর অদ্ভুত কথাগুলি মুগ্ধ হয়ে শুনত। সেটাই আমাব স্বরূপ, লোকহিত ইত্যাদি সবই বাহ্যিক দাবীদাওয়া ও আড়ম্বর। আবার আমি সেই স্বর শুনতে পাচ্ছি, সেই পুরোনো কণ্ঠ আমাব আত্মাকে আপ্লুত করে দিচ্ছে আনন্দে। বন্ধন যাচ্ছে টুটে, প্রেম শুকিয়ে ; কাজ হযেছে নীরস—জীবন ফ্যাকাসে।......

ঠিক তাই! আমি চললাম, নির্বাণ আমার সমুখে ; মাঝে মাঝে তার অনুভূতি আসে, সেই নিস্পন্দ নিথর অসীম শান্তির সমুদ্র!...

আবার আমি ভেসে চলেছি নদীর উষ্ণ বুকে সমাহিত অবস্থায় ; হাত, পা একেবারে নিশ্চল যাতে তার টুঁ শব্দটি পর্যন্ত চারিদিকের অপূর্ব স্তব্ধতা ভেঙে না দেয়। এই স্তব্ধতায় উপলব্ধি হচ্ছে সংসারটা মায়া।

আমার কাজের পেছনে ছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষা, প্রেমের পিছনে ছিল আত্মাভিমান (personality) পবিত্রতার পেছনে ভয়, নেতৃত্বের পেছনে ক্ষমতালিপ্সা। এখন সে সব খসে পড়ছে আর আমি চলেছি ভেসে। মা, আমি আসছি, দ্রষ্টার মত, আর কর্মী নয়।

...সব বস্তুই মনে হচ্ছে যেন ছায়া।

—বিবেকানন্দ

সত্যেন্দ্র : এটা নিশ্চয়ই তাঁর সাময়িক মনোভাব।

সত্যেন্দ্রের যুক্তি এই যে বিবেকানন্দ যখন এর দু-তিন বছর পরে মারা গেলেন এই সমস্ত খুঁতগুলি সেই সময় থাকতেই পারে না, কারণ এর পূর্বে নিশ্চয় তাঁর উচ্চতর উপলব্ধি হয়েছে। আমরা উত্তর দিলাম যে, উপলব্ধি সত্ত্বেও তিনি এই সমস্ত জিনিষের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছেন বলেই লিখেছেন, কাজেই সাময়িক ভাব নাও হতে পারে।

পুরাণী : উচ্চতর চেতনার সাথে এসব জিনিষ থাকতে পারে না ?

নীরদ : তাঁর মাঝে দুটো সুর ছিল। তা'ছাড়া তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে একটা অন্ধ অদৃশ্যশক্তি তাঁকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছে।

আমরা এখন শ্রীঅরবিন্দের উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম।

শ্রীঅরবিন্দ : (কিছুক্ষণ থেমে) অভিলাষ আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি জিনিষগুলো সহজে যায় না। ঊর্ধ্বতর চেতনা নামলেও তারা নীচের প্রকৃতিতে থাকতে পাবে। আর তিনি যদি অদৃশ্য শক্তির দ্বারা চালিত হয়ে থাকেন, তাহলে প্রকৃতিতে এগুলো থাকা মোটেই বিচিত্র নয়। তারা ঊর্ধ্বশক্তির ক্রিয়ার সাথে মিশে থাকে।

সত্যেন্দ্র : আশ্চর্যের বিষয় যে তিনি 'জীবন্মুক্তির' (free in the body) কথা বলছেন তাঁর মত্যুর কিছুকাল পূর্বে এবং নির্বাণ অভিজ্ঞতার পরে। আমার ধারণা ছিল যে তিনি বহু আগে মুক্তি পেয়েছেন।

শ্রীঅরবিন্দ : মুক্তি দু'রকম : সাধারণ ধারণা হল শরীর ত্যাগের পর মুক্তিলাভ হয় অর্থাৎ জীবিতাবস্থায় তোমার চেতনা মুক্ত হলেও প্রকৃতির খেলা পুরো থামে না এবং তোমার শারীর-চেতনা সেই অবিদ্যার খেলাকে ধরে থাকে। মৃত্যুর পর পূর্ণ মুক্তি আসে।

অন্য মুক্তি হল জীবন্মুক্তি। সেটা দেহের ও কাজকর্মের মাঝেই পাওয়া যায়। সেটা অবশ্য বেশি শক্ত।

সত্যেন্দ্র: বিদেহমুক্তি ও জীবন্মুক্তিতে তফাৎ আছে নিশ্চয়? আপনার বর্ণনা অনুসারে আগেরটা বিদেহমুক্তি বলতে হবে। জনক ত বিদেহমুক্ত এবং সেটাই নাকি বেশি শক্ত।

শ্রীঅরবিন্দ: আমার ত মনে হয় উল্টো।

সত্যেন্দ্র: তাহলে কথার প্রয়োগে কোন গোলমাল হয়ে থাকবে। আচ্ছা, বিবেকানন্দের মত সত্তা নাকি বিশেষ কোন কাজের জন্যে আসেন, এটা কি ঠিক?

নীরদ: রামকৃষ্ণ তাঁকে বলতেন ঈশ্বরকোটি।

শ্রীঅরবিন্দ: হাঁ। মুক্তির একটা লোক বা ভূমি আছে যেখান থেকে সত্তা নেমে আসতে পারে। রামকৃষ্ণের ঈশ্বরকোটি বা নিত্য-মুক্তের অর্থ বোধ হয় তাই অর্থাৎ যারা মই বেয়ে ওঠানামা করতে পারে।

সত্যেন্দ্র: অন্যান্য ভূমিতে বিবর্তন নেই?

শ্রীঅরবিন্দ: না। সেখানে আছে শুধু টাইপ। তারা যদি বিবর্তন চায় তাহলে তাদের পৃথিবীতে জন্ম নিতে হবে। দেবতারাও যদি ক্রমবিবর্তন চায়, তাদেরও মনুষ্যদেহে জন্ম নিতে হবে।

নীরদ: তাদের কি গরজ? তারা ত বেশ সুখেই আছে!

শ্রীঅরবিন্দ: সেই সুখ তাদের একঘেয়ে লাগতে পারে; তখন চাইবে অন্য সুখ, যেমন নির্বাণ।

নীরদ: কিন্তু নির্বাণও ত কারও একঘেয়ে লাগতে পারে।

(হাস্য)

শ্রীঅরবিন্দ: নির্বাণে 'কারও' বলে কিছু নেই। কাজেই

একঘেযে লাগবে কার? সেটাই অমলকে বোঝাতে আমার ভয়ানক মুস্কিল লেগেছে। তার মাথায ঢুকতে চায় না যে নির্বাণের অভিজ্ঞতায় ব্যক্তিসত্তার লোপ পায়। সে জিজ্ঞেস করবে, 'যদি সেই অবস্থায় কোন সত্তা না থাকে, কার নির্বাণের অভিজ্ঞতা হচেছ তাহলে?' উত্তর হল কারও হচ্ছে না। তোমার মাঝে কিছু খসে পড়ে, আর নির্বাণ তার জায়গা নেয। বস্তুতঃ ওখানে 'পাওয়া' বলে কোন জিনিষ নেই, আছে 'আমি যা' তাব মুছে যাওয়া, খসে পড়া। অমল বোধ হয় ভাবছে যে সে কোন এক জায়গায বসবে, আর তাব মনোময় সত্তা নির্বাণের দিকে তাকিযে বলবে, 'আঃ, এই ত নির্বাণ!' কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এই 'তুমি' রয়েছে, ততক্ষণ নির্বাণ হতে পারে না। সমস্ত আসক্তি সমস্ত প্রকৃতি-সত্তা (personalities) খসলে তবে নির্বাণ প্রাপ্তি। আর অমলের মনোময় সত্তার প্রতি যেরকম টান, সেটা তার পক্ষে দারুণ শক্ত।

সত্যেন্দ্র: নির্বাণ যদি ওরকম অভাবাত্মক (negative) অবস্থা হয়ে থাকে, তাহলে যে সেটা পেয়েছে এবং যে পাযনি তাদেব মাঝে তফাৎ কোথায়?

শ্রীঅরবিন্দ: নির্বাণের দিক থেকে কোন তফাৎ নেই।

সত্যেন্দ্র: জীবনের ক্ষেত্রে ত রয়েছে।

শ্রীঅববিন্দ: হাঁ, রয়েছে এইজন্যে যে নির্বাণে এই 'তুমি'টা লোপ পায়, অন্য কেউ নয়। (একটু পরে) এই চিঠিটায় একটা জিনিষ অন্ততঃ পরিষ্কার ধরা যাচেছ্। বিবেকানন্দ নির্বাণের শান্তি ও স্থিরতার কথা বলছেন, সঙ্গে সঙ্গে বোধ হচেছ্ পৃথিবীটা মায়া।

পুরাণী: চেতনার এই যে দ্বিধা ভাগ, একটা মূলতঃ মুক্ত, অন্যটা অপূর্ণ বা অশুদ্ধ এটা ত খুব সাধারণ অভিজ্ঞতা।

শ্রীঅরবিন্দ: শুধু সাধারণ কেন, সুলভ অভিজ্ঞতা। নিরভিমানী হয়ে কাজ করতে চাইলে কাজের প্রতি তোমার একটা সাম্যভাব থাকা চাই অর্থাৎ কাজ সম্পন্ন হল কিনা হল সে বিষয়ে বিচলিত হবে না। গীতার ভাষায় 'কাজের মাঝেও নৈষ্কর্ম্য'; তবুও, কাজ করতে হবে, গীতার আদেশ। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে যখন কাজ সরিয়ে নিলে বা পণ্ড হলেও তোমার চেতনার বিন্দুমাত্র তারতম্য হবে না।

সত্যেন্দ্র: নির্বাণ একটা মূলগত (fundamental) অভিজ্ঞতা নয় কি?

শ্রীঅরবিন্দ: আমার যে নির্বাণের অভিজ্ঞতা তাতে দ্বৈতাশ্রিত প্রকৃতি (separative personality) লোপ পায় এবং তখন কাজ করা হয়, 'কর্তব্যকর্ম' বোধ থেকে। ব্যক্তি অহং দূর হয়ে নির্বাণে সেই এক (the One) হয়ে যায়। নির্বাণ একটা প্রবেশ-পথ, সেটা পার হয়ে লাভ করবে তোমার প্রকৃত সত্তা। সে সত্তা ক্ষুদ্র, সীমাবদ্ধ অহং-সত্তা নয়; সে বিশাল ও অসীম, তার মাঝে পুরুষ সারা পৃথিবীকে পূরে রাখতে পারে। সে সত্তা আয়ত্ত হলে তুমি সংসারে থেকেও থাকবে তার ঊর্ধ্বে। কাজ করবে নির্লিপ্ত হয়ে। এই দ্বৈত প্রকৃতির হাত থেকে উদ্ধার পেতে হলে নির্বাণের উপলব্ধি অত্যন্ত প্রয়োজন। খুব জোরালো অভিজ্ঞতা সেটা।

সত্যেন্দ্র: নির্বাণের পরে যে উপলব্ধিটা হয় বলছেন, তাতে প্রকৃত পুরুষ (individual) অর্থাৎ জীবাত্মা বলে বোধ থাকে কি?

শ্রীঅরবিন্দ: তখন এই জ্ঞান আসে যে একই সর্বত্র, একই আবার বহু এবং সেই একই আবার তিনি।

সত্যেন্দ্র: সেটাকেই বলেছেন 'বহুসংখ্যক একত্ব' (multiple unity)?

শ্রীঅরবিন্দ : হ্যাঁ।

সত্যেন্দ্র : মুস্কিল এই যে আমাদের দেহ-মমতা, দেহাভ্যাস এত বেশি, অহংবোধ, কামনাবাসনা এত প্রবল যে এই ব্যূহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়া কঠিন কাজ। নানা সমস্যাপূর্ণ জীবনটা এত সত্যি মনে হয়।

শ্রীঅরবিন্দ : সত্যের মাঝে তাকে তার যথার্থ স্থান দিতে হবে। তার উর্ধ্বে উঠতে হলে কতকগুলি সর্ত পালন করতে হবে, যেমন বাসনাত্যাগ, আত্মসমর্পণ ইত্যাদি।

সত্যেন্দ্র : কিন্তু আমাদের এই বোঝা নিয়ে যখন ভগবানের জন্য, আপনাদের জন্যে কাজ করতে বলা হয়, তখন পথটা আরও দুরূহ হয়ে ওঠে।

শ্রীঅরবিন্দ : কিন্তু তখনও সর্তগুলি ভুললে চলবে না। বিশুদ্ধ ভাবটি রেখে বাসনা ত্যাগ করে কাজ করতে হবে। অবশ্য সেটা একদিনে হবার কথা নয়।

সত্যেন্দ্র : এখানে আবার কেউ কেউ তাদের মতামত চাপাতে চায়।

শ্রীঅরবিন্দ : হ্যাঁ, তারা তাদের মানুষী অহংকে 'ভাগবত অহং'-এ (divine ego) রূপ দেয়। 'আমি, আমার' বলার পরিবর্তে বলে 'আমাদের কাজ, আমাদের আশ্রম' ইত্যাদি। সেই অহংভাব যাওয়া চাই।

পুরাণী : সত্যেন্দ্রের সেটা বক্তব্য নয়।

সত্যেন্দ্র : না ; আমি আমাদের বাধার কথা বলছিলাম।

শ্রীঅরবিন্দ : আর আমি বলছিলাম আমার বাধার কথা। (হাস্য) এখানেও কতকগুলি প্রচারক আছে, তারা জোর জবরদস্তি করে অন্যদের

যোগে দীক্ষা দিতে চায়। কী প্রচণ্ড উৎসাহ তাদের! হাজার নিষেধ করলেও তারা শোনে না।

পুরাণী: অন্ততঃ ভ'কে থামাতেই হবে।

শ্রীঅরবিন্দ: তুমি ভেবেছ পারবে থামাতে? তাকে তাড়িয়ে দেবার ভয় দেখিয়েছি, সে গ্রাহ্যই করে না! (হাস্য)

চম্পকলাল: সে নাকি সহরে রীতিমত ক্লাস করছে ও লেকচার দিচ্ছে।

পুরাণী: ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে ব্যাখ্যাও করছে!

শ্রীঅরবিন্দ: কি? ব্ল্যাকবোর্ডে ব্যাখ্যা করছে ব্রহ্মকে। সে আমায় ত্রিশ পৃষ্ঠার এক চিঠি লেখে।

পুরাণী: তবুও ভাল! মাদ্রাজের এক মন্ত্রীকে লেখে ৬০ পৃষ্ঠার, একটি কয়েদীকে মুক্তি দিবার জন্যে!...একদিন সে বসে বসে যখন গেট্-পাহারা দিচ্ছে, অমৃত গিয়ে তাকে বলল যে বসে বসে পাহারা দেওয়া মাব নিষেধ।

শ্রীঅরবিন্দ: ঠিক কথা। আমাদের কাছে অনেক নালিশ এসেছে সাধকেরা চেয়ারে বসে বসে আগন্তুকদের সাথে আলাপ করে।

পুরাণী: অমৃত যখন ভ'কে মা'র আদেশ অমান্য করছে কেন জিজ্ঞেস করল, সে জবাব দিল 'সেটাই আমার বাধা'। (হাস্য)

শ্রীঅরবিন্দ: সে নাকি গুরু হয়ে বসেছে। এদের যদি বাইরে গিয়ে আশ্রম গড়তে বল, তারা যাবে না; এখানে থেকেই গুরুগিরি চালাবে।

নীরদ: কেউ কেউ আবার মারধর করে' স্বীকার করিয়ে ছাড়বে যে আপনারা অবতার।

সত্যেন্দ্র : ওরকম স্বীকারে লাভটা কি ? আমি আপনাদের গুরু বলে মানি কিন্তু তা'বলে নিজের অভিজ্ঞতা ছাড়া সব কিছু বিশ্বাস করা যায় না।

শ্রীঅরবিন্দ : বিশ্বাসের জন্যে সব সময় অভিজ্ঞতার দরকার হয় না। শ্রদ্ধা (faith) থাকলেও বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু জোর করে সেই শ্রদ্ধা অন্যের উপর চাপালে মুস্কিল হয়। তুমি বলতে পার 'আমার বিশ্বাস অমুক অবতার' কিন্তু যদি বল 'তুমি বিশ্বাস না করলে মার দেব', তখন অনর্থের সৃষ্টি হয়।

নীরদ : অমুক আর একজন।

শ্রীঅরবিন্দ : হাঁ। র যখন এখানে এল, সে যোগ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানত না। তবুও তার বেশ অভিজ্ঞতা হচ্ছিল, উন্নতিও করছিল। এই লোকটি একদিন তাকে পাকড়াও করে এমন লম্বা বক্তৃতা ঝাড়ল যে র বিস্মিত হয়ে বলল, 'এসব কি ব্যাপার ?' ব্যস, তার সমস্ত অভিজ্ঞতা গেল থেমে।

নীরদ : এতে আপনার কাজের বাধা হয় নিশ্চয়ই ?

শ্রীঅরবিন্দ : সাংঘাতিক ! কাউকে তার নিজের ধারায় চলতে না দিয়ে অন্যের মত চাপালে কাজের বাধা ত হবেই।

সত্যেন্দ্র : শেষে লোকটিও বোধহয় বিদ্রোহ করে।

শ্রীঅরবিন্দ : হয় নিজেকে গুটিয়ে নেয়, নয় ভুল ধারণা করে বসে। কতকগুলি লোক তাদের পরিবার শুদ্ধ যোগে নিয়ে আসতে চায়। স্ত্রী যদি রাজী না হয়, স্বামী তার উপর চটে যাবে ; যোগ যেন একটা পারিবারিক ব্যাপার। আমি ত এর কোন যুক্তি খুঁজে পাই না।

সত্যেন্দ্র : যুধিষ্ঠিরের মত তারা সপরিবারে স্বর্গে যেতে চায়।

শ্রীঅরবিন্দ : স্বর্গে হয়ত যেতে পারে, কিন্তু যোগে নয়।

সত্যেন্দ্র : সমস্ত পরিবার একটি ধর্মের উপাসক বলে এই idea তারা পেয়ে থাকবে। পরিবেশটা তখন শান্তিময় হয়।

শ্রীঅরবিন্দ : হতে পারে কিন্তু সেটা ধর্মজীবনের পক্ষে খাটে। পরিবারে অমিল থাকলেও কিছু আসে যায় না। যেমন দ্বিজেন্দ্রলালের গানে আছে, 'বুড়ো বুড়ি দুজনাতে মনের মিলে সুখে থাকত, বুড়ি ছিল পরম বৈষ্ণব, বুড়ো ছিল ভারি শাক্ত'।

তারপর ভ-এর মত কেউ কেউ অন্যদের বলে 'মা অনুমতি নাই বা দিলেন। তুমি থেকে যাও। আমিও ত অনুমতি পাইনি, কিন্তু দিব্যি রয়ে গেছি।'

সত্যেন্দ্র : পুরোনো যোগের ধারণা বোধ হয় সেটা। তারা ভাবে এটা তাদের বিশ্বাসের পরীক্ষা।

শ্রীঅরবিন্দ : বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যারা যোগের অনুপযুক্ত তারাই এরকম নাছোড়বান্দা হয়। তাদের যদি অন্য গুরু নিতে বলা হয় তারা শুনবে না।

সত্যেন্দ্র : তাদের গ্রহণ করলেই হয়।

শ্রীঅরবিন্দ : কি করে? প্রায়ই তারা পাগল, নয় খামখেয়ালী, অথবা তাদের 'ডাক' বাইরের।

এখন রাত প্রায় সাড়ে আটটা। দু একজন সাধক চলে গেলে পুরাণী আবার বিবেকানন্দের চিঠির কথা তুলল। বলল 'চিঠিটা খুব আন্তরিক। তাঁর বাধাগুলো বোঝা শক্ত নয়। ভগবানের সক্রিয় সান্নিধ্য সর্বদা অনুভব না করলে এসব দোষত্রুটি থাকবেই।'

শ্রীঅরবিন্দ : ঠিক কথা। দেখছি যে অনেকের পক্ষে এ জিনিষটা বোঝা শক্ত। এসব দুর্বলতা সহজে যায় না। সাধারণ

চেতনায় প্রকাশ না পেলেও তারা থাকে, তুমি ঊর্ধ্বচেতনায় বাস করলেও।

তাদের দূর করবার দুটো উপায় : একটা তুমি যা বললে। সেটা অধিগত না হলেও তুমি যদি তোমার দেহ-চেতনায় পর্যন্ত সাম্য, শান্তি ও স্থিরতা প্রতিষ্ঠা করতে পার যাতে কোন অবস্থায়ই তোমার চেতনার বিন্দুমাত্র নড়চড় হবে না, তাহলে উচ্চাভিলাষ ইত্যাদি দোষের হাত থেকে মুক্তি পেতে পার।

বরোদায় নির্বাণের অভিজ্ঞতার পর যখন আমি কলকাতায় এলাম, আমার মনে হল আমার কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। ব্যক্তিগত ambition-এর কথা বলছি। কিন্তু একটি অন্তঃস্বর (voice) আমায় পদে পদে সতর্ক করে দিয়ে বলত এটা সেই, ওটা এই ইত্যাদি, অর্থাৎ ambition বেশ রয়েছে। এসব জিনিষ বহুদিন লুকিয়ে থাকতে পারে। এটা কিছুটা কংগ্রেস-সভাপতি নির্বাচনের মত। উভয়পক্ষই বলছে যে কোন ambition-এর তাগিদে নয়, দেশের সেবা, কর্তব্য, আদর্শ ইত্যাদির জন্য তারা দাঁড়িয়েছে। (হাস্য)

২৮।১।৩৯

সকালবেলা : শ্রীঅরবিন্দের স্পঞ্জ-বাথের সময়। (শ্রীঅরবিন্দের আরোগ্য লাভের পরও তাঁকে বহুদিন স্পঞ্জ-বাথ দেওয়া হয়।) ঘরে বিস্তর মাছি জুটেছে। পুরাণী ও চম্পকলাল তাদের মারতে ব্যস্ত ঠাস্ ঠাস্ শব্দ করে। একসময় চম্পকলাল জোরে হেসে উঠল। তার হাসির কারণটা শ্রীঅরবিন্দকে জানাতে তিনি বললেন, "এটা ত অহিংসা নয়! তাকে গান্ধি-আশ্রমে পাঠিয়ে দাও।"

পুবাণী : তাহলে ত আর রক্ষে নেই। তার কঠোর শাস্তি বিধান হবে।

শ্রীঅরবিন্দ : ছয মাসের জন্য তাব হাসি বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

বিকেলবেলা। শ্রীঅরবিন্দ নিস্তব্ধ, আমি পুরাণীকে আস্তে আস্তে বললাম, "কই, তোমাব খবরটা বের্ কব।" পুবাণী শুধু হাসতে লাগল যেন শুভ মূহূর্তের অপেক্ষায়। কিছুক্ষণ পরে শ্রীঅরবিন্দ আমাদের দিকে তাকাতেই আমি বললাম, "পুবাণীর কিছু খবব আছে মনে হচেছ।"

শ্রীঅববিন্দ : বেব করছনা কেন?

পুবাণী : না, না, কিছু নেই।

শ্রীঅরবিন্দ : Sunday Times-এ তোমাব সর্দির ওষুধ পাওয়া গেছে। তোমায় শুধু এরোপ্লেনে উঠতে হবে, কয়েকটা ঘুবপাক খেয়ে নেমে আসবে এবং দেখবে যে সর্দি সেরে গেছে।

সত্যেন্দ্র : একেবারে?

শ্রীঅরবিন্দ : হাঁ, যদি এবোপ্লেন হুড়মুড় করে নেমে চুরমার হয় তাহলে আরোগ্যটা হবে চিরস্থাযী!

নীরদ : ব তার নাকের ভিতর দিয়ে মোটা সূতো চালান দিয়ে সর্দির চিকিৎসা করত।

সত্যেন্দ্র : সেটা ত হঠযোগ।

শ্রীঅরবিন্দ : হাঁ। কেউ কেউ পেটে কাপড় ঢুকিয়ে মলদ্বার দিয়ে বের করে নিয়ে আসে পেট পরিষ্কার করবার জন্যে। নাইট্রিক এসিড, সায়ানাইড, পেরেক ইত্যাদি খাবারও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ রয়েছে।

সত্যেন্দ্র : কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা এগুলির কি ব্যাখ্যা দেবে? কোন এক জায়গায় নাকি তাদের ডাকা হয়েছিল এসব প্রদর্শন দেখতে; তারা রাজী হয়নি।

শ্রীঅরবিন্দ : কি করে রাজী হবে? তাদের আত্ম-প্রত্যয় যদি টলে যায়?

নীরদ : হঠযোগীরা নিশ্চয় কোন প্রক্রিয়া জানে যার দ্বারা ভেতরে বিশেষ শোষণ-ক্রিয়া হয় না।

শ্রীঅরবিন্দ : তা ত বটেই। তাদের এমন শক্তি আছে যাতে বিষেব ক্রিয়া বন্ধ হয় এবং বিষ শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। প্রদর্শনের ঠিক পরেই তাদেব এসব প্রক্রিয়া করতে হয়।

নীরদ : আপনি নিশ্চয় জানেন স্যার উইলিয়াম ক্রুকস্ যখন তাঁর বৈঠকে বৈজ্ঞানিকদের আহ্বান করেন, তারা ওসব 'ধাপ্পাবাজীতে' যোগ দিতে রাজী হয়নি।

শ্রীঅরবিন্দ : জার্মাণীতে ঠিক একই ব্যাপার ঘটে। কোন জার্মাণ গ্রামে একটি ঘোড়া নাকি আঁক কষতে পারত। ঘোড়ার মালিক বৈজ্ঞানিকদের ডেকে তার প্রমাণ দেখাতে চাইল। তারা ত এলই না উল্টে সরকারের কাছে নালিশ করল যে এটা অচিরে থামান উচিত, কেননা ব্যাপারটা বিজ্ঞানসম্মত নয়!

পুরাণী : মেটারলিঙ্ক নিজে গিয়েছিলেন দেখতে। তিনি বলেছেন যে প্রথমে তাঁরও ধারণা ছিল যে ওটা গাঁজাখুরি ব্যাপার কিন্তু তিনি নিজে আঁক কষতে দিয়ে প্রমাণ পেলেন যে ঘোড়ার উত্তর একেবারে নির্ভুল।

শ্রীঅরবিন্দ : লোকের ধারণা যে পশুর চিন্তা বা যুক্তির ক্ষমতা

নেই, ওটা মোটেই ঠিক নয়। তাদের বুদ্ধিকে জীবনের প্রয়োজনার্থে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে খাটান হয়েছে বলে তাদের সুপ্ত ক্ষমতাগুলি বিকাশের সুযোগ পায়নি।

বিড়ালদের নিজস্ব ভাষা আছে। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে তারা বিভিন্ন রকমের ডাক ডাকে। ধর, মা যখন একধরনের 'মিউ' ডেকে বাচচাদের একটি বাক্সর পিছনে রেখে যায়, বাচচারা বুঝতে পারে যে তাদের মা ফিরে এসে সেই ছন্দে 'মিউ' না ডাকা পর্যন্ত তাদের স্থানত্যাগ নিষেধ। এই রকম ছন্দের ভিতর দিয়ে তারা ভাব ব্যক্ত করে।

গাধারা পর্যন্ত, যারা আমাদের মতে ভয়ানক নির্বোধ, অত্যন্ত চতুর। একবার কোন জায়গায় গাধা ও ঘোড়াকে একসাথে বেঁধে রাখা হয়, তারা বের হতে পারে কিনা পরীক্ষার জন্যে। দেখা গেল যে ঘোড়ার দল হতাশ হয়ে বসে, আর একটি গাধা 'গেট -এর হুড়কা খুলে বেরিয়ে গেছে।

এত দূরে যাওয়ার আবশ্যক কি? আমাদের আশ্রমেই দেখ মার বিড়াল চিকু কী রকম বুদ্ধিমতী ছিল। একদিন যখন তাকে একটি ঘরে বন্ধ করে রেখে দেওযা হয়, দেখা গেল মা যেভাবে জানলাটা খুলতেন ঠিক অবিকল সেই প্রকারে সে জানলাটা খুলতে চেষ্টা করছে, নিশ্চয়ই সে মার জানলা খোলাটা লক্ষ্য করেছে।

আমাদের প্রথম ভাড়াটে-বাড়িতে একটি কুক্কুরী ছিল; জানিনা কে সেটা দিয়ে যায়। সে-বাড়ীর দোতালায় কাঁচের জানলা দেওয়া একটি ঘর ছিল এবং শেষ প্রান্তে ছিল স্নানের ঘর। একদিন ভুলে কুকুরটি বাইরে আটকা পড়ে যায়। সে কত চেষ্টা, কত কৌশল অবলম্বন করল ভেতরে ঢুকতে। না পেরে হতাশ হয়ে বন্ধ জানালার সামনে বসে ভাবতে লাগল কি করে ঢোকা যায়। তার বসবার ভঙ্গী ও অন্যান্য লক্ষণ দেখে

পরিষ্কার বোঝা গেল যে সে ভাবছে। তারপর সে হঠাৎ উঠল যেন মনে পড়ল "তাইত, বাথরুমের দরজাটা চেষ্টা করে দেখি না কেন!" বলে সেদিকে ছুট দিল আর দেখল দরজাটা খোলাই রয়েছে। স্বচ্ছন্দে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

সাহেবরাই মানুষ আর পশুর মাঝে একটা ভেদের সৃষ্টি করে। তাদের মধ্যে এইমাত্র তফাৎ যে পশুর কোন মানসিক ধারণাশক্তি (concept) নেই। তারা লিখতে, পড়তে বা দার্শনিক চর্চা করতে পারে না।

নীরদ: যোগও করতে পারে না!

শ্রীঅরবিন্দ: তাও জোর করে বলা যায় না। একবার মা ও আমি যখন ধ্যান করছিলাম, একটি বিড়াল কি করে পাশে এসে বসে। কিছুক্ষণ পরে তার আচরণ একটু অদ্ভুত ঠেকতে লাগল, বোধ হল যেন তার সমাধি (trance) হচ্ছে, প্রায় মরে যাবার উপক্রম। কিন্তু সেরে উঠল। নিশ্চয়ই সে আমাদের ধ্যানের কোন ফল গ্রহণ করতে চেষ্টা করছিল।

সত্যেন্দ্র: রমণ মহর্ষির গাই লক্ষ্মী নাকি তাঁকে প্রণাম করত। গাইটির পূর্বজীবনে মহর্ষির সাথে নাকি কি একটা সম্পর্ক ছিল এবং তাঁর প্রতি খুব অনুরক্ত ছিল।

গাই সম্বন্ধে কথা উঠতেই সত্যেন্দ্র বলল "এই তামিল দেশী গাই-গুলির প্রতি কোন দয়া মমতার উদ্রেক হয় না। তারা যেমনি রোগা তেমনি আধপেটা থাকে। লোকগুলিও কী নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর! নকল বাছুর (dummy calf) দিয়ে মাকে ভুলিয়ে দুধ দোহন করে। কি করে বলি, স্যার, যে পশুরা খুব বুদ্ধিমান?"

শ্রীঅরবিন্দ: সব মানুষই কি বুদ্ধিমান?

নকল বাছুরের কথায় এল মহাত্মা গান্ধির কথা। তিনি এই দোহন-প্রথার ভয়ানক নিন্দা করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি এমনও বলেছেন যে গরুর দুধ পান করা আর গরুর রক্তপান করা একই কথা। কেননা তাতে গরুর বাছুরকে উপোস রাখা হয়।

পুরাণী: কিন্তু তিনি যে ছাগলের দুধ খান?

শ্রীঅরবিন্দ: ওটা হল তাঁর ট্রেনে মোটরে যাতায়াত করবার মত, ধর্তব্য নয়। অথচ সেগুলোর নিন্দা করতেও পিছ্পাও হন না।

সত্যেন্দ্র: বল্লভভাই তাঁকে বেশ চেনেন। সেজন্যে তিনি তাঁকে বার্দোলী সত্যাগ্রহের সময় সেখানে আসতে নিষেধ করেন। বল্লভভাইকে সে আন্দোলনের সম্পূর্ণ ভার দেওয়া হয়। ভয়ানক বিচক্ষণ লোক।

(?): বল্লভভাইএর ভয় ছিল বোধহয় যে গান্ধির নীতি হতে বিচ্যুত হলে তিনি আন্দোলন থামিয়ে দেবেন।

এখানে বল্লভভাই-এর রসিকতাবোধ সম্বন্ধে কিছু কথা হল এবং তাঁর দু'একটা হাসি-ঠাট্টারও দৃষ্টান্ত দেওয়া হল। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বললেন "ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে, বিজ্ঞ ছেলে তার পিতাকে চেনে। (A wise child knows his father.) শেলীর ছিল ভয়ানক অন্যমনস্ক স্বভাব। একবার তাঁর রুম থেকে বের হতেই তাঁর সমুখে পড়ল একটি ছেলে। 'ছেলেটি কে?' তিনি শুধালেন। মিসেস শেলী বললেন, 'কি? তোমার নিজের ছেলেকে চেননা তুমি?' শেলী উত্তর দিলেন, 'বিজ্ঞ পিতাই চেনে তার ছেলেকে।'

সত্যেন্দ্র: **Balzac** পড়তে পড়তে আমার ধাঁধাঁ লাগে ফরাসীরা আদৌ বিয়ে করে কেন।

শ্রীঅরবিন্দ: কেন বিয়ে করে? অন্যকে ভালবাসার জন্যে! তাদের বিয়ে ত প্রেমের বিয়ে নয়। বিয়েটা হল তাদের পারিবারিক সুবিধার ব্যবস্থা মাত্র।

সত্যেন্দ্র: কিন্তু ফরাসী মায়েরা নাকি অত্যন্ত স্নেহপ্রবণা, এমন মা ইউরোপে দেখা যায় না।

শ্রীঅবরবিন্দ: সত্যি কথা, ছেলেরা তাদের গূঢ়তম ব্যাপারও মার কাছে গোপন রাখে না।

পুরাণী আবার তার সাধের রাজকোটের বিষয় উত্থাপন করল। পেটেল ও ঠাকুরের (রাজা) মাঝে যেসব চিঠিপত্র আদান-প্রদান হয়েছে তার সারাংশ ও কি করে দেওয়ান ঠাকুরকে চুক্তিভঙ্গ করতে প্ররোচনা দিচেছ সব জ্ঞাপন করল। প্রসঙ্গক্রমে ভাইসরয়ের কাছে অপমানিত হয়ে রঞ্জিৎ সিং-এর আত্মহত্যার বিষয়ও উল্লেখ করল।

শ্রীঅরবিন্দ: সরকার ফেডারেশন কবে চালু করছে?

পুরাণী: ১৯৪০-এর প্রথমে। সেজন্যে কংগ্রেসের সাথে একটা রফা করতে ব্যস্ত হয়েছে।

শ্রীঅরবিন্দ: ১৯৪০ ত ভয়ানক কাছে। এক বছরও ত নেই। এই অল্প সময়ের মাঝে তাদের কংগ্রেসকে তুষ্ট করতে হবে এবং রাজাদের বাঁধতে হবে।

পুরাণী: বুলাভাই যে এতবার বিলেত গেলেন তাঁর স্বাস্থ্যের অজুহাতে, আসল উদ্দেশ্য নাকি ফেডারেশন সম্বন্ধে আলোচনা করা। কেবল তিনি থাকতে চান অন্তরালে।

শ্রীঅরবিন্দ : সেটা আমারও নীতি, কাজেই তাঁর সাথে আমার সহানুভূতি আছে। কিন্তু নিজাম কি সহজে রাজী হবে? বড় বড় রাজ্যগুলি যোগ দিলে ছোটগুলি আটকাবে না।

পুরাণী : বল্লভভাই গাইকোয়াড়কে রাজী করাতে চেষ্টা করছেন।

শ্রীঅরবিন্দ : গাইকোয়াড় যোগ দেবে কিনা ৩০ বছর ধরে ভাববে। তবে কিছুই বলা যায় না। যোগ দিতেও পারে। বুড়ো হয়েছে ত, গৌরবেব লোভে রাজী হতে পারে, পরে যত কষ্ট ভোগ উত্তরাধিকারীর মাথায় তুলে দেবে।

২৯।১।৩৯

শ্রীঅরবিন্দ পুরাণীকে সম্বোধন করে বললেন, "Sunday Times-এ হিটলারের সাথে Colonel Beck-এর সাক্ষাতের খবর পড়েছ?"

পুরাণী : না, কি বিষয় নিয়ে?

সত্যেন্দ্র : পরস্পরের প্রতি চীৎকার করছে ত?

শ্রীঅরবিন্দ : তাই। হিটলার যখন নাকি চীৎকার আরম্ভ করে তার চোখগুলি কাঁচের মত দেখায়; তখন বুঝতে হবে বিপদ আসন্ন। কিন্তু এই সাক্ষাতে হিটলার যত জোরে চীৎকার করে, Beck নাকি ততোধিক জোরে চীৎকার করতে থাকে। হিটলার এরকম অপ্রত্যাশিত পাল্টা জবাবে অবাক হল। আস্তে আস্তে তার স্বর নেমে গেল।

সত্যেন্দ্র : তার সমকক্ষ একজন পেয়েছে তা হলে।

শ্রীঅরবিন্দ : (পুরাণীর দিকে তাকিয়ে) ও'র ফতোয়া দেখেছ?

নীরদ : বড় দুঃখের বিষয় যে এ সময় কংগ্রেসে দালদলি সুরু হয়েছে।

শ্রীঅরবিন্দ : বটেই ত। যখনি সে নেতৃত্ব পেয়েছে তখনি গোলমাল উপস্থিত হয়েছে। তার সময়েই বাংলায় কংগ্রেসে দলাদলি দেখা দিল। তার ফতোয়ায় যুক্তির কোন বালাই নেই। মনে হচ্ছে সে বুদ্ধিজীবী মাত্র, বাস্তব জীবনের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। অমুক পর্যন্ত মাঝে মাঝে বড় বড় বুলি আওড়ায় : ভারতবর্ষের আন্তর্জাতিক অবদান, ভারতবর্ষের আন্তর্জাতিক প্রভাব ইত্যাদি অর্থহীন কথা। জাতিই হয়নি এখনও, দেখছে আন্তর্জাতিক স্বপ্ন ! আগে স্বাধীন জাতি হও, তারপর বলো সে সব কথা। সামান্য চীনজাপান ব্যাপারে যারা জাপানী জিনিষ বয়কট করতে পারল না, চীনে পাঠাল শুধু একটা **ambulance unit,** কি করে তারা এসব গালভরা কথা বলে ?

পুরাণী : অমুকের অ সম্বন্ধে ধারণা তেমন উঁচু নয়। বলছে যে অ ভাল লেফ্‌টেনান্ট হতে পারে, নেতা নয়।

শ্রীঅরবিন্দ : আমারও তাই মত।

নীরদ : অহং, ক্ষমতাপ্রিয়তা যেন তাঁকে চালাচ্ছে।

শ্রীঅরবিন্দ : কোন সন্দেহ নেই। সে মুখে বলছে বটে তার একটা উচ্চ আদর্শ আছে, কিন্তু ভিতরের ইচ্ছা 'আমায় ভোট দাও, আমায় ভোট দাও !'

নীরদ : কিন্তু তাঁর আন্তরিকতা ও সততা আছে।

পুরাণী : অনেক নেতার তা আছে।

নীরদ : বাংলা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।

শ্রীঅরবিন্দ : আন্তরিকতা ও সততা মানে কি ? আদর্শের জন্যে

দুঃখবরণ, ঘুষ বা অর্থ না নেওয়া, এই ত? আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের সময়ও যদিও আমাদের নেতারা অহঙ্কারী ও ঝগড়াটে ছিল, কিন্তু তাদের সততা ও আন্তরিকতা ছিল। আমাদের মাঝেও আদর্শ নিয়ে সংগ্রাম হয়েছে: সংস্কার চাই, না বিপ্লব, অথবা একজনের ভাষায়, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন, না স্বাধীনতা। কিন্তু তা বলে ব্যক্তিগত কারণে আমাদের বিবাদ হয়নি যেমন হচ্ছে এদের মাঝে। জান ত চিত্তরঞ্জনের উক্তি: রাজনীতিক্ষেত্রে সে বদলোকের যে রকম চরম নমুনা পেয়েছে তার সারা জীবনের আইনব্যবসায়ে সে রকম পরিচয় পায়নি। নিশ্চয়ই তার শিষ্যদের ভাল করেই চিনত সে।

নীরদ: কিন্তু অ যদি সত্যি সন্দেহ করেন যে ফেডারেশন উপলক্ষে কংগ্রেস ব্রিটিশরাজের সাথে একটা আপোষের চেষ্টা করছে, তাহলে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়বার তাঁর অধিকার নেই? সেটা কি অনুচিত হবে? তিনি বলছেন যে সন্দেহজনক কথাবার্তা চলছে দু'পক্ষের মাঝে। পুরাণীও বলল সে কথা।

শ্রীঅরবিন্দ: কথাবার্তায় দোষ কি? প্রত্যেক দেশের বড় পার্টির তা করতে হয়। যুদ্ধের আগে ও মধ্যে জার্মাণরা তা করেছে। কথাবার্তা মানে ত কোন কিছু স্বীকার বা গ্রহণ করা নয়। অন্য পার্টি কতখানি দাবী, সুযোগ সুবিধা ছেড়ে দেবে তা আলোচনা করায় ত কোন ক্ষতি নেই।

পুরাণী: **Nahash Pasha**-এর সাথে যখন ইজিপ্টে নেহেরুর সাক্ষাৎ হয়, **Nahash Pasha** তাঁকে বললেন যে শাসনভার নেওয়ার ফলে তাঁদের **Wafd Party** দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে গেছে; সেজন্যে তাঁদের পরাজয় হয়েছে। তিনি অবাক হয়েছেন যে কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব

ইত্যাদি গ্রহণ করেও কলুষিত হয়নি। নেহেরু উত্তরে বললেন যে **Parliamentary Board**-এর কৃপায় সেটা হতে পারেনি। **Board** মন্ত্রীদের শাসনে রাখে।

শ্রীঅরবিন্দ : **Wafd Party**-কে ভেঙে দেওয়া হয়েছে শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ভাবলাম কারণটা কি ; এটাই তাহলে কারণ? কামালের মত রাজাকে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া উচিত ছিল। বর্তমান রাজা তার পিতার নীতি অবলম্বন করছে। ক্ষমতা যখন হাতে পেয়েছে নিজেদের মাঝে ঝগড়া না করে তাদের উচিত ছিল জাতি-গঠনে মন দেওয়া : প্রথমতঃ সাধারণ ও শিল্পশিক্ষা বিস্তার করা, দ্বিতীয়, দেশের ধন বৃদ্ধি কবা এবং তৃতীয়, সামরিক শক্তি গঠন করা।

ঠিক এই জিনিষই কংগ্রেস-মন্ত্রীদের করা উচিত আমাদের দেশে।

নীরদ : কি রকম শিক্ষা? টেকনিক্যাল?

শ্রীঅরবিন্দ : টেকনিক্যাল, কৃষিবিদ্যা। যথার্থ জ্ঞান না থাকলে শিল্পের উন্নতি করবে কি করে? ভারতবর্ষ এত প্রকাণ্ড দেশ যে যদি তার প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন করা যায়, দেশের মাঝেই সেগুলি ব্যবহৃত হবে। বহির্বাণিজ্যের দরকার সুরুতে হবে না। আমেরিকা তাই করেছে। প্রথমে, তার দেশের প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্যে অন্তর্বাণিজ্য বৃদ্ধি করেছে ; তাতে যখন তার ধনাগম হল, বহির্বাণিজ্যে মন দিল। সমস্ত প্রদেশগুলির আর্থিক ক্ষমতা কি রকম দেখবার উদ্দেশ্যে সরকারের একটা প্ল্যান থাকা চাই, তাহলে বোঝা যাবে যে সারা ভারতবর্ষের কি কি দ্রব্য উৎপাদনের প্রয়োজন আছে।

পুরাণী : বোস একটা ভাল জিনিষ করেছেন, **Economic planning committee** গঠন করে।

শ্রীঅরবিন্দ : মাধ্যমিক শিক্ষা উপেক্ষা করলে চলবে না। শিক্ষা ছাড়া আজকাল উপযুক্ত ও সমর্থ লোক পাওয়া যায় না। শিক্ষাই পরস্পরকে বোঝার বনিয়াদ তৈরী করে আর একই স্বার্থে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু আমি বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির কথা বলছি না মোটেই। তা জাতিগঠনের পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়। তাকে আমূল পরিবর্তন করত হবে। ভারতীয় ছেলেরা ইংরেজ ছেলেদের চাইতে বেশি বুদ্ধিমান কিন্তু তাদের ৩/৪ অংশ শক্তি ও প্রতিভা নষ্ট হয়, অপর পক্ষে ইংরেজ ছেলেরা তাদের প্রতিভা ভারতীয় ছেলেদের চাইতে দশগুণ বেশি ব্যবহারে লাগায়।

পুরাণী : Dr. Kher ব্যবসায়ীদের অনুরোধ করছেন সরকারকে donation দিতে। মদ্য নিবারণ আইনের জন্যে সরকারের খাজনা অনেক হ্রাস পেয়েছে। তিনি শাসাচেছ্‌ন যে ব্যবসায়ীরা দান না করলে ইন্‌কামট্যাক্স বসান হবে।

শ্রীঅরবিন্দ : সোসিয়ালিষ্টদের মত ধনিকশ্রেণীর ধ্বংস করা উচিত হবে না। তারাই হল জাতির ধনভাণ্ডার। বরং তারা যাতে জাতির মঙ্গলের জন্যে অর্থ ব্যয় করে সেদিকে তাদের উৎসাহিত করা উচিত। ট্যাকস্‌ করতে পার, কিন্তু তার আগে উৎপাদনশক্তি, শিল্প ইত্যাদি বাড়াতে হবে, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা চাই। সেগুলো ছাড়া শুধু ট্যাক্‌স্‌ বাড়ালে দেশে একটা হতাশা চেপে বসে। অন্যান্য দেশে ট্যাক্‌স্‌ যত ইচ্ছা বাড়াতে পারে, কারণ তারা তেমনি উৎপাদনও বৃদ্ধি করছে।

পুরাণী : Kher এখন কৃষি স্কুল খুলছেন গ্রামে গ্রামে, ছোটখাট শিল্প স্কুলও অর্থাৎ Wardha Scheme অনুসারে।

শ্রীঅরবিন্দ : এসমস্ত ভাল কাজ ছেড়ে দিয়ে ফেডারেশন নিয়ে

আন্দোলন করা পরিতাপের বিষয় বটে। ফেডারেশন চালু হবার পরও তুমি তার বিরুদ্ধে লড়তে পার। যা পাওয়া গেছে তা নিয়ে, যা বাকী রইল তার জন্যে তৈরী হও। সরকার যদি প্রমাণ পায় যে ফেডারেশন বেশ সুন্দরভাবে চলছে, তাহলে আরও ক্ষমতা বাড়াতে রাজী হবে। তারা প্রত্যাশা করেছিল যে কতকগুলি হুজুকপ্রিয় বক্তার দল এসেমব্লিতে জড়ো হয়ে শুধু চীৎকার করবে। এমন শাসনক্ষম লোকের প্রত্যাশা করেনি। কিন্তু সোসিয়ালিজমের যদি আবির্ভাব হয়, তাহলে তারা ভয়ে পিছ্পাও হবে।

পুরাণী: বঙ্গের বর্তমান গভর্ণর যেন তাঁর মন্ত্রীপরিষদের প্রতি সদ্ভাবাপন্ন।

শ্রীঅরবিন্দ: ইংরেজ জাতের ধাতই হল নিয়মতান্ত্রিক, অবশ্য কার্জনের মত দু'চারজন স্বেচ্ছাচারী ছাড়া। তাদের লাথি মেরে বের করে দেবে, সেটা তারা কিছুতেই সহ্য করবে না কিন্তু আস্তে আস্তে তাদের কাঁধে তুলে বের করে দাও, তারা কোন আপত্তি করবে না, যেমন উপনিবেশগুলিতে হয়েছে। উপনিবেশগুলি কার্যতঃ স্বাধীনই। যুদ্ধ লাগলে যদি সরকার ভারতবর্ষের সাহায্য পায়, তাতেই তারা বর্তে যাবে কিন্তু এই সমস্ত সাম্রাজ্যবিরোধী নীতি ও 'আপোষ অসম্ভব' ইত্যাদি লম্বাচওড়া বুলি তাদের কঠোর করে তুলবে, সদ্ভাব নষ্ট করবে। গোড়াতেই তোমার পলিসি ঘোষণা করে বসবে কেন? দেশী রাজ্যগুলির বেলায়ও বেশি চাপ দেওয়া বুদ্ধির কাজ হবে না। প্রথম থেকেই যদি রাজাদের সাক্ষীগোপাল করে রাখতে চাও, তারা সেটা সহ্য করবে কেন?

সত্যেন্দ্র: বল্লভভাই খুব কার্যক্ষম লোক বটে, কিন্তু কেউ তাঁকে পছন্দ করে না, তাঁর সহযোগীরাও নয়।

শ্রীঅরবিন্দ : পছন্দ করবার মত লোক বলে ত মনে হয় না। তবে আন্তরিকতা ও সামর্থ্য থাকলেই হল।

পুরাণী : ওদের দুই ভাইকে একত্রে দেখতে হয়, ভারী মজার ব্যাপার। দুজনে কেবল ঝগড়া করছেন।

শ্রীঅরবিন্দ : বিঠলভাইকে মনে হয় বেশি অমায়িক ও রাজনীতি-বিদ। কাউনসিলে বেশ ভাল কাজ করছেন।

৩০।১।৩৯

শ্রীঅরবিন্দ আবার কথা সুরু করলেন। পুরাণীকে সম্বোধন করে বললেন "বোস নাকি জিতেছে? বেচারা Pattabhi তার জীবনের মহাসুযোগ হারাল।"

পুরাণী : হাঁ, কিন্তু সোসিয়ালিজম নিয়ে দু'দলের মাঝে হারজিত হয়েছে ভাবলে ভুল হবে। তামিল নাড়ু Pattabhiর বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে ঘরোয়া কারণে, বোসকে সমর্থন করে বলে নয়। বাংলা দেশের সমস্ত ভোট বোস পেয়েছে বাঙালী বলে।

শ্রীঅরবিন্দ : বাংলা, যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাব বোসকে ভোট দিয়েছে, তাদের অন্য কোন নেতা নেই বলে। আর বাঙালী হিন্দুরা Communal Awardএর বিপক্ষে, কাজেই তারা High Commandএর বিপক্ষে যাবেই। বাংলায় সত্যিকারের নেতা নেই। বাঙালীরা চক্রান্তে ভারী ওস্তাদ, কিন্তু কোন শক্তিমান লোক নেই, এমন কি আসামের Bardoloiএর মত লোকও নেই।

নীরদ: ডাক্তার বিধান রায়ের নাকি ক্ষমতা ও সামর্থ্য আছে, তেমনি নলিনী সরকারেরও, কিন্তু নলিনী সরকারের অনেক বদনাম রটেছে।

শ্রীঅরবিন্দ: সব financierই কি সাধু মহাত্মা? তার চরিত্র যাই হোক সে জনসাধারণের টাকা আত্মসাৎ করেছে কি না সেটাই বিবেচ্য।

নীরদ: ভাল কথা, কলকাতার কাগজ Statesman একটা লোভনীয় প্রস্তাব পাঠিয়েছে। দিলীপ রায়কে সম্পাদক Arthur Moore লিখেছে যে আপনি যদি আপনার যোগের অভিজ্ঞতার পরি-প্রেক্ষিতে বিশ্বঘটনা সম্বন্ধে তাদের কাগজে প্রবন্ধ লেখেন, তাহলে প্রবন্ধ প্রতি তারা ১০০ টাকা করে দেবে।

শ্রীঅরবিন্দ শুনে খুব হাসলেন এবং বললেন "যোগের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে! দিলীপ কি উত্তর দেবে?"

নীরদ: সেটা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে বলেছেন।

শ্রীঅরবিন্দ চুপ করে রইলেন। কে একজন বলল যে আর এক ভদ্রলোক দিলীপ ও অমলকে তার কাগজে লিখতে অনুরোধ করে অগ্রিম পারিশ্রমিক পর্যন্ত দিয়েছে। কাগজটি সম্বন্ধে আমাদের মাঝে সমালোচনা চলল, কেউ বলল ওটা সরকারেব কাগজ, কেউ বলল সরকার টাকা দিয়ে সাহায্য করে এবং কাগজটির সততা বলে কোন জিনিষ নেই।

পুরাণী: ভদ্রলোক গত দর্শনে এখানে এসেছিল।

শ্রীঅরবিন্দ: হাঁ। দেখলাম তার চোখটা চারদিকে ঘুরছে। এ কি সেই লোকটি যে যুবা বয়সে আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল? আর আমি রাজী হইনি? আমার সন্দেহ হয়েছিল যে সে স্পাই। বিশেষ

করে পুলিশ যখন ভয়ানক জানতে ব্যস্ত হল কেন আমি তার সাথে দেখা করিনি, তখন সন্দেহ বদ্ধমূল হল। প্রকৃতপক্ষে, ওটা সন্দেহ বা অনুভূতি ছিল না, একেবারে নিছক **intuition**। তারপর যখন শুনলাম যে সে সরকারেব **Executive Council**-এর এক বড় সদস্য হয়েছে, অবাক না হয়ে পারলাম না।

Mooreকেও স্পাই বলে সন্দেহ কবা হয়; সাধারণ স্পাই নয়, সরকারের গুপ্ত প্রতিনিধি (**agent**)। স্পাই হোক বা না হোক, লোকটি কিন্তু ধ্যান করতে জানে। মাব সঙ্গে ধ্যান কবেছিল সে।

পুবাণী : কিন্তু ভদ্রলোক কংগ্রেস মন্ত্রীত্বের স্বপক্ষে বলেছেন এবং মন্ত্রীদের প্রশংসা করেছেন।

শ্রীঅববিন্দ : লোকে বলবে, তাতে তার গুপ্তচর কার্যে সহায় হবে, লোকের সহানুভতি পাবে বলে।

এখন আমাদেব আশ্রমের রোগীদের নিয়ে আলোচনা চলল। তাদের মাঝে একজনের অবস্থা শোচনীয়, আমবা আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। হঠাৎ দেখা গেল তার অবস্থার অভাবনীয় পরিবর্তন হয়েছে।

শ্রীঅরবিন্দ : একসময় সে কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে শুধু অসুখের কথা ভাবত, আব ভয়ে কাবু হয়ে পড়ত। তাতে অসুখ আরও বেড়ে যায়। এই দুটি জিনিষ আরোগ্যের ভয়ানক পরিপন্থী। অমুক অত্যধিক অসুখের কথা ভাবত বলে তার অবস্থাও খারাপ হচ্ছিল।

নীরদ : এখন ত আগের রোগাটি যা তা খায়, আর দিব্যি হজম করে।

শ্রীঅরবিন্দ : সে আমাদের লিখত "আমি যা খুসী খাচ্ছি, আপনারা আমার হয়ে হজম করবেন।" (হাস্য)

পুরাণী : গাইকোয়াড় এখনও বম্বেতে। বহুদিন ধরে ভুগছেন।

শ্রীঅরবিন্দ : কি রোগে?

বেচারলাল : **Brain-এর thrombosis.**

পুরাণী : বয়স হয়েছে ত, ৭৬ বছর প্রায়, না?

শ্রীঅরবিন্দ : তাঁর মত শক্ত মজবুত লোকের পক্ষে এমন কি বয়স? এদেশে ৫০ বছর পার হলে লোককে বুড়ো ভাবা হয়, ৬০ বছর হলে মরবার উপযুক্ত বয়স মনে করে। ইংলণ্ডে ও চীনে ৬০।৭০ বছর হল পরিণত বয়স। ৮০ বছরের পরে আসে বার্ধক্য। এ সমস্ত জিনিষ নির্ভর করে পরিবেশের, আবহাওয়ার উপর, বাইরের আবহাওয়া নয়, অবশ্য।

সত্যেন্দ্র : সরকারী কর্মচারীদের ত ৫৫ বছর বয়সে অবসর নিতে হয়। তারপরে অন্য কিছু করবার শক্তিই থাকে না তাদের, বিশেষ করে সারা জীবনটা আরামে কাটিয়েছে বলে।

শ্রীঅরবিন্দ : উপযুক্ত কাজ খুঁজে পায় না বলে মরে যায়। তা না হলে ৫৫ বছর বয়সে নিশ্চয় নূতন কিছু করা সম্ভব।

পুরাণী : হিণ্ডেনবার্গের ত ৮৭ বছর পরমায়ু ছিল, চেম্বারলেন ৭৭ বছরে প্রধানমন্ত্রী হল।

শ্রীঅরবিন্দ : মা'র ভাই আফ্রিকার গভর্ণরগিরি থেকে অবসর নিয়ে এখন কত কাজ করছে, অমুক সোসাইটির প্রেসিডেন্ট, অমুকের মেম্বর ইত্যাদি। তাকে অবসর নিতে বাধ্য করা হয়। আফ্রিকায় কত ভাল কাজ করেছে কিন্তু অন্যরা পেল নাম। এই জাতীয় লোকই ফ্রান্সকে গড়ে তুলেছে।

পুরাণী : জ লিখছে যে, সে ক্রমশঃ তার স্থৈর্য হারিয়ে ফেলছে। সে এখন কোন এক **Students' Federation**-এর সম্পাদক।

শ্রীঅরবিন্দ : কম federate করে বেশি consolidate করতে বল। (হাস্য)

পুরাণী : প্রায় উন্মাদের অবস্থা !

শ্রীঅরবিন্দ : সেই পুরাণো ইতিহাস ! এগুলো হল এক ধরনের স্নায়ুবৈকল্য, তাতে স্থৈর্য ও সাম্য নষ্ট করে দেয়। তাকে হামবড়া ভাব পেয়ে বসেছে। দেখাতে চায় সে মস্ত কেউকেটা ; চমকপ্রদ বা অপ্রত্যাশিত কিছু না করলে চলবে না—এই ধরনের মানসিক রোগ। তার সামর্থ্য যে নেই তা নয়, কিন্তু সেই সামর্থ্যকে সংহত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ না করলে সবই পণ্ড হবে।

২।২।৩৯

দু'দিন ধরে আমাদের কোন কথা হয়নি। শ্রীঅরবিন্দের পায়ে একটু ফোলা দেখা দিয়েছে বলে আমরা দুশ্চিন্তায় ছিলাম। কারও কথা বলবার মত মনের অবস্থা ছিল না।

আজ শ্রীঅরবিন্দ নিজে কথা সুরু করলেন, কতকটা যেন আমাদের নিশ্চিন্ত করতে। আবার Congress election হল আমাদের আলোচ্য বিষয়। বোস ও কংগ্রেসের মাঝে বেশ রেষারেষি চলছে। বোস আগে তার ফতোয়া দিয়েছেন, পরে দিলেন গান্ধি। শ্রীঅরবিন্দ জিজ্ঞেস করলেন 'বোস এখন কি করবে ? গান্ধি ত কংগ্রেস নেতাদের পিছন থেকে সমর্থন করছে। আর কিনা বোস এসে ভোটে জিতে নিল ! ফতোয়ায় বোসকে পরিষ্কার সাবধান করে দেওয়া হয়েছে।

পুরাণী : সম্প্রতি সোসিয়ালিষ্টরা বলতে গেলে বেকার। যারা বল্লভভাই-এর হাতে নাজেহাল হয়েছে, তারা বোসের জয়ে খুব উৎফুল্ল। নরিম্যান বোসকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে যে ফ্যাসিজমের পালা এখন শেষ এবং খাঁটি ডিমোক্রেসির যুগ সুরু। 'আপনিই হবেন প্রকৃত প্রেসিডেন্ট।'

শ্রীঅরবিন্দ : অর্থাৎ সেই-ই প্রকৃত প্রেসিডেন্ট যে তার অনুচরদের অনুসরণ করবে! সেটাই আসল ডিমোক্রেসি! বোস তার অনুচরদের বেছে নিয়ে নিজে তাদের অনুচর হবে! অথবা নরিম্যান চায় যে বোস তার কথামত চলবে।

সত্যেন্দ্র : দক্ষিণপন্থীর ফ্যাসিজমের বদলে চায় বামপন্থীর ফ্যাসিজম।

পুরাণী : গান্ধিজী ও দক্ষিণপন্থীরা দেশীরাজ্য সংক্রান্ত সমস্যাটির উপর আবার জোর দিয়েছেন যেন।

শ্রীঅরবিন্দ : হাঁ। মহারাজাদের সাথে যদি কংগ্রেসের একটা মীমাংসা হয়—বোসের সাথে নয়, কারণ বোস আপোষ চায় না, গান্ধির সাথে—তাহলে বেশ ভাল হয়। আমার মত হল—কতকগুলি মহারাজাদের মতও তাই—Advisory Board গঠন করা, তাতে সব রকম স্বার্থের প্রতিনিধি থাকবে, যেমন ছিল আমাদের পুরোনো ডিমোক্রেসিতে। কিন্তু মুস্কিল হল নেতারা চায় 'দায়িত্বপূর্ণ গভর্ণমেন্ট, পার্লামেন্টারী গভর্ণমেন্ট'। যাই বল, এই পার্লামেন্টারী শাসন প্রথার দিন এখন শেষ। তার অধীনে ইউরোপের কী চরম দুর্গতি হয়েছে দেখ। ইউরোপে শুধু মাত্র কয়েকটা দেশে তার ফল ভাল হয়েছে: উত্তরে, স্কাণ্ডিনেভিয়ায় ও ইংলণ্ডে। তার কারণ তারা হল বস্তুবাদী

ও কর্মতৎপর (practical) জাত, চিন্তা বা মতবিলাসী নয়। ফ্রান্সে দেখতে পাবে ত্রিশটা দল ; নূতন নেতার অভ্যুদয় হলে সে আর একটি সৃষ্টি করবে কিন্তু পরস্পরের মাঝে কোথায় যে প্রভেদ বুঝবার জো নেই।

আমেরিকায়ও তথৈবচ। আমেরিকা ত দুর্নীতির ঘাঁটি। তার কংগ্রেস মেম্বরগণও তা' থেকে বাদ যায় না। এক আমেরিকান গল্প লিখেছে যে কোন গৃহকর্ত্রী একবার এক কংগ্রেস মেম্বরকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করে। ভদ্রমহিলা তার চাকরাণীকে বলল, "দেখ্ জিন, আমি এক কংগ্রেসমেম্বরকে নিমন্ত্রণ করেছি, আমার রূপোর চামচেগুলো সাবধানে রাখিস্ কিন্তু।" (হাস্য) এটা বানান গল্প নয়, আমেরিকানের লেখা।

পুরাণী : নরওয়ে আর সুইডেনে চমৎকার সুফল ফলছে। আমার এক বন্ধু বলছিল যে সোসিয়ালিষ্ট আর ভূস্বামীরা একজোট হয়ে একটা স্কিম তৈরী করেছে। যেমন শিল্পমালিকদেব লাভের হার কি পরিমাণ তা দেখে তারা মজুরদের মাহিনাও সে অনুপাতে বাড়ান যায় কি না, সেটা স্থির করে।

শ্রীঅরবিন্দ : তাতেই বুঝতে পারছ্ যে তারা practical জাত। অন্যান্য দেশে দেখবে সোসিয়ালিষ্ট আর ভূস্বামীদের মাঝে আদা-কাঁচকলার সম্বন্ধ। সোসিয়ালিজম সমাদর লাভ করতে পারে ওই পথ অবলম্বন ক'রে। সোসিয়ালিষ্টদের একমাত্র দাবী হল শ্রমিকদের মাইনে বাড়াতে হবে, কারখানার লাভ হোক কি না হোক এবং মালিকরা বাঁচল কি মরল সেটা বিবেচনা করা তাদের দায় নয়। যদি তারা মরে যায়, ভালই, আপদ সরে যাবে।

পুরাণী : হার্বার্ট কি ইউরোপের কোন খবর এনেছেন ?

শ্রীঅরবিন্দ : সে বলছে যে ফ্রান্সের কোন আশা নেই। তার কোন বন্ধু নেই। Czekদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার পর কেউ তাকে বিশ্বাস করেনা। ফরাসীরা ইংলণ্ডের কাছে কোন কিছু প্রত্যাশা করে না, কারণ সবাই জানে ইংরাজেরা শুধু স্বার্থ খোঁজে। তা ছাড়া তারা কোন প্রতিশ্রুতি দেয়নি কিন্তু ফ্রান্স প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা ভঙ্গ করেছে। আরও বলছে যে ফ্রান্স তার মিত্রশক্তিদের হারিয়ে এখন সেকেণ্ড ক্লাস শক্তি হয়ে গেছে। ইংরাজের পেছনে পেছনে চলা ছাড়া তার উপায় নেই ; তবে শেষ পর্যন্ত তারাও হয়ত তাকে পথে বসাবে। তার মতে, ডিকটেটারদ্বয় যদি চতুর হয়, তারা চাপ দিয়ে ফ্রান্স থেকে যা চায় তাই আদায় করতে পারবে, কারণ মিত্রহীন ফ্রান্সের একা যুদ্ধ করবার সঙ্গতি নেই।

পুরাণী : কেন ? ফ্রান্স ও ইংলণ্ড মিললে যুদ্ধ করতে পারবে না এদের বিরুদ্ধে ?

শ্রীঅরবিন্দ : না। তারা ডিকটেটারদের সমকক্ষই নয়। তা ছাড়া এই যে বললাম ইংলণ্ড যে তাকে পথে বসাবে না কে বলতে পারে ? Blum আর Daladier সর্বনাশা ভুল করেছে, একজন স্পেনে নিরপেক্ষ নীতি (non-intervention) অবলম্বন করে ; অন্যজন চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। Franco-র জয় ফ্রান্সের পক্ষে মারাত্মক।

পুরাণী : কিন্তু ডিকটেটারদ্বয় যেমন একজোটে দাঁড়াতে পারে, এরা কেন তা পারবে না ?

শ্রীঅরবিন্দ : এই জন্যে যে ডিকটেটাররা তাদের স্বার্থ কিসে পরিষ্কার বোঝে, তাদের দেশেও তাদের বাধা দেবার কেউ নেই।

তাদের বিচ্ছিন্ন করাও সাধ্যাতীত। ইংবাজ সে খেলা খেলে দেখেছে ইটালীর সাথে মিতালীর চেষ্টা করে, ফ্রান্স জার্মানীকে তুষ্ট করে, কিন্তু পাবেনি। ইটালি ও জার্মানী যে পরস্পরকে ভালবাসে তা নয়। বরং দুইদেশ পবস্পরকে ঘৃণাই করে। কিন্তু তাদের স্বার্থ কোথায় সেটা তারা জানে। পক্ষান্তবে, যতদিন সেই দুষ্টবুদ্ধি চেম্বাবলেন ক্ষমতা অধিকাব করে আছে, ততদিন ইংলণ্ড একেবারে নির্ভরযোগ্য নয়। সে কী যে করে বসবে কেউ জানে না। আর একটা সম্ভাবনা হল ডিকটেটারদের মৃত্যু। সূর্যকুমাবীর এক বন্ধু নাকি ভবিষ্যৎ দেখতে পারেন। ভদ্রমহিলা বলেছেন যে মুসোলিনীর রক্তাক্ত শরীর যেন তিনি দেখতে পেয়েছেন। হিটলার সম্বন্ধে জ্যোতিষ গণনা হল ডিসেম্বর পর্যন্ত তাব নক্ষত্রের শুভ লগ্ন, তার পরে শনির প্রকোপ আবম্ভ হবে। কিন্তু এসব জিনিষের উপর পুরোপুরি নির্ভর ত করা যায়না। তবে তারা যদি সরে যায়, তাহলে তাদের স্থান নেবাব মত পরবর্তী নেতা কেউ থাকবে না বোধ হয়।

পুরাণী: সামরিক শক্তির কথা বাদ দিয়ে জার্মানীর আর্থিক অবস্থা নাকি খুব সুবিধার নয়।

শ্রীঅরবিন্দ: হাঁ, তাই! ওটাই হল তাদের দুর্বল জায়গা। কিন্তু তেমনি আছে তাদের সামরিক শ্রেষ্ঠতা। এখন দেখতে হবে এই শ্রেষ্ঠতা তাদের আর্থিক অব্যবস্থাকে সামলিয়ে নিতে পারবে কি না। তারা যদি একবার তাড়াতাড়ি জিততে আরম্ভ করে তাহলে জিততেই থাকবে। ডিকটেটাররা সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। দেশে তাদের কোন প্রতিপক্ষ নেই, কেউ টুঁ শব্দ করবে না তাদের বিরুদ্ধে। একবার দেশ যুদ্ধে নেমে গেলে আর্থিক সমস্যার কথা কেউ ভাবে না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ ইটালি। ইটালির আবিসিনিয়া যুদ্ধে, **League of Nations** তার বিরুদ্ধে **Sanction** ঘোষণা করল। কিন্তু ইটালি দমল না, যুদ্ধ জয় করে নিল।

পুরাণী: কিন্তু ফ্রান্সের সামরিক শক্তির কি হল? তারা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত বলে আমরা শুনে আসছি।

শ্রীঅরবিন্দ: ফ্রান্স বোকার মত এরোপ্লেন বানান কমিয়ে দিয়ে মাসে মাত্র ২৫০ খানা তৈরী করছিল। অন্যদিকে জার্মাণী করেছে ১০০০, আর ইংলণ্ড ৫০০। এখন চৈতন্য হয়েছে কিন্তু এদের সমান হতে অনেক সময় নেবে। কিন্তু প্রস্তুতি থাকলেই সব সময় যুদ্ধ জয় হয় না। জেনারেল **Gamelin** যেমন বলেছে 'আমরা তৈরী না হলেও জিতব!' চেকোশ্লোভাকিয়াকে সাহায্য করতে সে প্রস্তুত ছিল, কারণ যুদ্ধের সময় কোন কিছুর অভাব হয় না, তুমি যদি যা চাও তা পলকে করিয়ে নিতে পার। যদি ফরাসীরা **Djibouti, Tunis** ইত্যাদি ছেড়ে দেয়, তাহলে ফ্রান্সে অন্তর্বিপ্লব হবে। তখন হয়ত কোন প্রবল ডিকটেটারদের উদয় হবে এই ধ্বংসের কবল থেকে উদ্ধার করবার জন্যে। পৃথিবীতে যদি তোমার পদ ও মান রাখতে চাও, তোমার প্রতিশ্রুতি, দায়িত্ব পালন করতে হবে।

এখন দারুণ সমস্যা হল পৃথিবীকে এই আসুরিক শক্তির দখল থেকে কি উপায়ে রক্ষা করা যায়। নাৎসি ও ফ্যাসিষ্ট শাসন কি সাংঘাতিক হবে জান না। তাদের আধিপত্যে যাকে বলা হয় 'নরকের চারটি শক্তিকে (**Four Powers of Hell**) মানবজাতির উপর তাণ্ডব নৃত্য করতে ছেড়ে দেওয়া হবে; **obscurantism**, মিথ্যাচার, যন্ত্রণা ও মৃত্যু। যন্ত্রণা ও মৃত্যু মানে যুদ্ধ ও রক্তপাতের ভয়াবহ বিভীষিকা।

হার্বার্ট আরও বলছে জার্মাণ জনসাধারণ তাদের সম্বন্ধে পৃথিবীর লোকের কি মতামত কিছুই জানে না। সে জার্মাণী দেখে এসে একথা বলছে। Goebbels তাদের যতটুকু জানতে দেয়, ততটুকই তারা জানে। ইটালিতেও কোন বিদেশী কাগজ ঢুকতে পারে না।

পুরাণী: জ্বলন্তী বলত যে যদি ইটালিতে কেউ রাজনীতি চর্চা করে বা মুসোলিনীর সমালোচনা করে, তাকে আগে দরজা জানালা বন্ধ করতে হবে যাতে ঘুণাক্ষরেও কেউ টের না পায়।

শ্রীঅরবিন্দ: এগুলিই হল obscurantism ও মিথ্যাচার—

পুরাণী: স্পেনে ফ্যাসিষ্ট সাফল্যে আমেরিকা ভয় পেয়েছে এবং Latin America-তে গোলমালের আশঙ্কা করছে।

শ্রীঅরবিন্দ: রুজভেল্ট-এর উক্তি দেখেছ? ফরাসী কাগজে বের হয়েছে, ইংরেজী কাগজে নয়। বলছে যে ডিকটেটারগণ যদি ইউরোপে প্রবল হয়ে ওঠে, আর জাপান এশিয়ায়, তা হলে আমেরিকার দফা শেষ। প্রশান্ত ও আটলান্টিক—দুই দিক থেকেই তার উপর আক্রমণ আসবে। প্রথম লাটিন আমেরিকা, পরে উত্তর আমেরিকায় দেখা দেবে গোলমাল ও অশান্তি। সেখানে প্রচুর জার্মাণ ও ইটালিয়ান রয়েছে, তারা নাৎসি প্রোপাগাণ্ডা সুরু করবে।

রুজভেল্ট সমস্ত ব্যাপারটা আঁচ করে নিয়েছে এবং ডিমোক্রেসিদের সাহায্য করতে দৃঢ় সংকল্প হয়েছে, কিন্তু সারা জাতির সমর্থন পাবে কি? হিটলার যদি আমেরিকানদের আক্রমণ না করে, তারা যুদ্ধে যোগ দেবে না; আর হিটলার তা করবে না। আবার, তারা যদি সাক্ষীগোপালের মত দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে কাকে হিটলার আগে গলাধঃকরণ করবে সেটাই হবে প্রশ্ন। প্রথমে ফ্রান্স, পরে ইংলণ্ড,

শেষে আমেরিকা। ওয়াশিংটনের তিনটি স্বপ্নের কথা জান ত? (১) স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ, (২) অন্তর্যুদ্ধ, (৩) নানা জাতের ও হলদে জাতের আমেরিকা আক্রমণ ও তার নগরসমূহ ধ্বংস এবং অমানুষিক প্রয়াসের পর তার মুক্তি। তৃতীয় স্বপ্নটাই যেন এবার ফলতে চলেছে। যদি এই ত্রয়ী একত্রে দাঁড়ায় তাহলে জিতবার আশা আছে, কারণ আমেরিকার আছে বৃহত্তম যুদ্ধ জাহাজ, অফুরন্ত জনশক্তি ও অশেষ আর্থিক উপকরণ। কেবল স্থলে তাদের সামরিক শক্তি তেমন প্রবল না হতে পারে কিন্তু তাদের জনশক্তি ও আর্থিক প্রাচুর্য সেটা পুষিয়ে নেবে।

পুরাণী: রুজভেল্টও ফ্রান্সকে অস্ত্রশস্ত্র দিচেছ্ন; যুদ্ধে যোগ না দিয়েও তা করতে পারেন ত?

শ্রীঅরবিন্দ: তা পারে, কিন্তু তাতে যুদ্ধে নামবার ভয় আছে বলে আমেরিকানরা আপত্তি করতে পারে।

পুরাণী: জ্বলন্তী মুসোলিনীর খুব প্রশংসা করছিল। ইটালির নাকি অনেক উন্নতি করেছে। তার আন্তর্জাতিক পলিসি কিন্তু জ্বলন্তী মোটেই পছন্দ করে না।

শ্রীঅরবিন্দ: সত্যি, ইটালির উন্নতির জন্যে সে যা করেছে বিশেষ করে গোড়ার দিকে, তা অদ্ভুত বটে। **Lybia**-তে সে কি কি সংস্কার করেছে সে সম্বন্ধে **Brailsford** একটা প্রবন্ধ লিখেছে, পড় নি? দেশবাসীর অসাধারণ কর্মদক্ষতা বাড়িয়েছে—অবশ্য স্বাধীনতার বালাই নেই—তাদের জন্যে একই ধরনের নূতন নূতন ঘরবাড়ী ইত্যাদি তৈরী করেছে। কিন্তু সব কিছু কড়া নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ।

আমরা বোস ও নেহেরুকে ডিকটেটারদের বিরুদ্ধে খাড়া করতে পারি।

পুরাণী: তারা ত **light weight champion** হবারও যোগ্য নয়। আলীভাইদের কিছু ওজন ছিল বটে।

শ্রীঅরবিন্দ: (কিছুক্ষণ পরে) **Wazir Hussein** কে ?

পুরাণী: উনি হলেন **U. P.**-র ভূতপূর্ব জজ, সিয়া (**Shia**) সম্প্রদায়ের নেতা ও কংগ্রেস মেম্বর। তাঁর ছেলে হল সোসিয়ালিষ্ট।

শ্রীঅরবিন্দ: আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় কি জাতীযতাভাবাপন্ন ?

পুরাণী: হাঁ, কিন্তু দারার মতে সে জাতীয়তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কতকটা আলীভাইদের মত। যতদিন গান্ধিজী খিলাফত নিয়ে মেতেছিলেন, ততদিন আলীভাইদের সহযোগ পেয়েছেন।

শ্রীঅরবিন্দ: কিন্তু এখন মুসলমানদের মাঝে জাতীয়তাভাব বাড়ছে। যুক্তপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি জায়গায় তাদের সংখ্যা এখন ঢের বেশি।

পুরাণী আবার দেশা রাজ্যের প্রসঙ্গ তুলল: দেশারাজ্যগুলির মধ্যে কোন প্রগতির লক্ষণ দেখা যাচেছ না। বিকানীর ও উদয়পুর জাতীয় আন্দোলন দমন করতে চাচেছ।

শ্রীঅরবিন্দ: উদযপুরের কথা বোঝা যায়, মহারাজা সেকেলে কিন্তু বিকানীরেব মহারাজা ত নানাদেশ ঘুরেছে। **Chamber of Princes** যদি কিছু শাসন সংস্কার প্রবর্তন করে, তাহলে পেটেল তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের সুযোগ পাবে না। তারা গ্রামে পঞ্চায়েত প্রথা নিয়ে সুরু করে ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠতে পারে। পঞ্চায়েত আর গিল্ড বেশি প্রতিনিধিমূলক এবং তাতে সাধারণের সাথে প্রাণের যোগাযোগও হয় নিবিড়। প্রতিনিধিরা সাধারণ লোকদের সাথে একাত্ম বলে তাদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য হয়। অপর পক্ষে,

পার্লামেন্ট প্রথায় যে ম্যুনিসিপাল কাউনসিল ইত্যাদি আছে, সেগুলো তেমন কার্যকরী নয়, লোকের সাথে কোন প্রাণের যোগ নেই। প্রতিনিধিরা শুধু লম্বা লম্বা বক্তৃতা দেয়, ৩।৪ বছর ধরে তারা কি কাজ যে করে কেউ জানে না। যখন বিদায় নেবার সময় আসে, কোন মতে জোড়াতাড়া দিয়ে একটা চলনসই ব্যবস্থা খাড়া করে তারা সরে পড়ে,— দুটি পকেট ভর্তি করে। পুরোনো ব্রিটিশ পার্লামেন্ট প্রথা ঢের বেশি প্রতিনিধিমূলক ছিল। প্রতিনিধি ছিল গ্রামেব লোক, সাধাবণেরই একজন। ফ্রান্সে নির্বাচকমণ্ডলী প্রত্যাশা করে যে তাদের মনোনীত ডেপুটি তাদের নানা খাতির দেখাবে, দাবী দাওয়া পূর্ণ করবে।

৩।২।৩৯

শ্রীঅরবিন্দের কাছে এক মহিলা সাধিকার চিঠি পড়া হল। সাধিকা লিখেছেন যে তাঁর নানা রকমের অভিজ্ঞতা হচ্ছে: বাহ্যিক চেতনা লোপ পাওয়া এবং মনের যেন ভেসে বেড়ান; মাথায় বিদ্যুতের আঘাত, কোন শক্তির উপস্থিতি ইত্যাদি। কিন্তু এ সমস্ত অভিজ্ঞতা তাঁর মাঝে ভয়ের সঞ্চার করে, স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি হয়। যোগের প্রারম্ভেই নাকি এই অভিজ্ঞতাগুলি দেখা দেয়।

শ্রীঅরবিন্দ: তাকে বলবে যে বাহ্য চেতনা লোপ পাওয়া মানে চেতনা অন্তর্মুখী হওয়া অর্থাৎ সমাধি। আরম্ভেই এসমস্ত অভিজ্ঞতা হওয়া আশ্চর্যের বিষয় বটে। সাধারণত মনকে শান্ত করতে বহু বছর চলে যায়; সে বলছে যে ধ্যানে বসতে না বসতেই মন শান্ত হয়।

বিদ্যুতের আঘাত মানে উচ্চতর বা যোগশক্তির ক্রিয়া চলছে আধারকে উপযুক্ত করবার জন্যে। এসব থেকে প্রমাণ হয় যে তার ক্ষমতা রয়েছে এবং যোগ করতে পারবে সে। কিন্তু ভয় দূর না করলে চলবে না। নতুবা সমস্ত অভিজ্ঞতা বন্ধ হয়ে যাবে। এতে আরও বোঝা যাচ্ছে যে তার অন্তর্মন (Inner mind) তৈরী, কিন্তু প্রাণ ও দেহ দুর্বল : একটি হল ভয়ে ভর্তি, অন্যটি অসুখেবিসুখে ভুগছে। তার ফলে সত্তায় একটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। সেটা মোটেই অভিপ্রেত নয়। এ অবস্থায় শরীরটা সম্পূর্ণ সারিয়ে নিয়ে তার পরে যোগে মন দিলে ভাল হবে বোধ হয়। কিন্তু প্রধান জিনিষ হল ভয় তাড়ান।

নীরদ : কি করে ?

শ্রীঅরবিন্দ: অনেকের মুখে এই প্রশ্নটা শোনা যায়। যোগের আরম্ভে নানা ধবনের অভিজ্ঞতা আসতে থাকে যেগুলোর সাথে আমাদের সাধারণ চেতনার কোন পরিচয় নেই। তখন ভয় করলে যোগ করা সম্ভব হয় না। মন, ইচ্ছাশক্তি ও মানসিক শিক্ষার সাহায্যে ভয়কে তাড়াতে হবে। মানুষমাত্রেরই একটা ইচ্ছাশক্তি আছে। সেই ইচ্ছাশক্তিকে ব্যবহার করতে হবে, বাড়াতে হবে। বিবেকানন্দ যেমন জোর দিয়ে বলেছেন 'অভী'। যোগীর ভয় কেন ? তাকে বলবে নিজেকে ভগবানের হাতে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতে, তাঁর কাছে বিপদে আপদে সাহায্য চাইতে, তিনি যেন সব সময় রক্ষা করেন।

আমার অভিজ্ঞতার কথা তোমাদের বলেছি কি না মনে নেই। লেলের সাথে সাক্ষাতের পর কলকাতায় একদিন ধ্যান করছিলাম। বিশাল নিশ্চলতা (Calm) নেমে এল, বোধ হল যেন শ্বাসপ্রশ্বাস থেমে যাবে। কোত্থেকে একটা অর্থহীন ভয় বা সেরকম আশঙ্কা আমায় চেপে

ধরল, আর বললাম "যদি নিশ্বাস বন্ধ হয়, তাহলে বাঁচব কি করে?' আর সঙ্গে সঙ্গেই অভিজ্ঞতা উধাও হল: দ্বিতীয়বার ফিরে আসেনি।

কত রকমের অভিজ্ঞতা হয় বলছিলাম: ধর, তোমার মাথা যেন ড্রিল করা হচ্ছে পেরেক দিয়ে, তখন কি করবে? অথবা যদি মাথাটা ফেটে যাচ্ছে বা দুখণ্ড হচ্ছে?

নীরদ: কেন, অভিজ্ঞতাগুলি শান্তভাবে আসতে পারে না?

শ্রীঅরবিন্দ: পারে বৈকি। কিন্তু এখন তোমাদের জানা উচিত যে এসমস্ত অভিজ্ঞতা হয় সূক্ষ্মশরীরে, স্থূল দেহে নয়। যদি তোমার স্থূল দেহ বা মাথা ভেঙে যেত, তাহলে আপত্তি করতে পারতে।

নীরদ: আমিও এরকম দুএকবার ভয় পেয়েছি। রাত্রে ধ্যান করতে বসতেই মনে হত সব কিছু শান্ত স্তব্ধ এবং কেউ সেখানে এসেছে। তাতেই ভয় পেতাম।

শ্রীঅরবিন্দ: কেন? তুমি ভাবতে বুঝি যে শয়তানই এই স্তব্ধতা এনেছে? কিন্তু শয়তান ত সাধারণত গোলমালই এনে থাকে। যোগে দুটো জিনিষ চাই: একটা হল ভয় তাড়ান, অন্যটা সাধারণ প্রতীকের (Symbol) অর্থ জানা।

পুরাণীকে সম্বোধন করে শ্রীঅরবিন্দ বললেন, অমুককে চেন? একবার ধ্যানে সে দেখতে পায় যে সোনার দেহ দেবতারা নেমে আসছে এবং তাকে বলছে, 'আমরা তোমার শরীর কেটে আবার নূতন শরীর গড়ব।" সে তারস্বরে বলল, 'কখ্খনো না, কখ্খনো না!' সে ভেবেছে যে তার স্থূল দেহ বুঝি কাটা হবে। কিন্তু এখানে প্রতীক ত একেবারে পরিষ্কার। এর অর্থ হল তার পুরোনো প্রকৃতি বদলিয়ে সম্পূর্ণ নূতন প্রকৃতি তৈরী করা হবে।

পুরাণী : আমি শুনে আশ্চর্য হয়েছি যে সে আবার জৈনধর্মে ফিরে গেছে।

শ্রীঅরবিন্দ : সে কি জন্মসূত্রেই জৈন ?

পুরাণী : হাঁ।

শ্রীঅরবিন্দ : তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এরকম প্রায় ঘটে থাকে। প্রাণ ও দেহ-প্রকৃতিতে বংশের ধর্মের ছাপ থেকে যায়। কোন না কোন সময় সেটা প্রকাশ পায়। খৃষ্টানেরা সাধারণত ক্যাথলিক দিকে ফেরে। কোন এক ফরাসী—তার নামটি মনে পড়ছে না—নানা কিছু চেষ্টা করে দেখল : Mysticism, তিব্বতী Occultism ইত্যাদি। শেষে প'এর সংস্পর্শে আসে। প তাকে লেখে যে যোগের সাথে এসব জিনিষের কোন সম্বন্ধ নেই। তখন লোকটি তার ক্যাথলিক ধর্মের দিকেই ফিরে গেল। সে একটা বই লিখেছে, তাতে প-এর চিঠি থেকে অনেক জিনিষ নিয়েছে তার Catholicism-এর সমর্থন করবার উদ্দেশ্যে।

আমার দাদামশায়ও প্রথমে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিয়ে শেষে বই লিখলেন হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে। আর বললেন কিনা, হিন্দুধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেশ ভয় হয়েছিল যে দাদামশায় একটু বাড়াবাড়ি করছিলেন।

৪।২।৩৯

পুরাণী লাজপৎ রায়ের একখানা চিঠি পড়ল। চিঠিটা তাঁর মৃত্যুর কিছু পূর্বে বিরলাকে লেখা। জীবন, কর্ম, ভগবান ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর অন্তরের ভাবগুলি প্রকাশ করেছেন। তিনি বলছেন : আমার

মতামত অনেক বদলে গেছে। পৃথিবীর নানা দুঃখ-যন্ত্রণা দারিদ্র্য দেখে এই প্রশ্ন জেগেছে যে ভগবান যদি সর্বশক্তিময় ও করুণাময় হন, এই দুঃখের জগৎ সৃষ্টি করলেন কেন? আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব—তারা কতখানি সত্যি ও স্থায়ী, কোন ভিত্তির উপরে তাদের সাথে এই সম্বন্ধ দাঁড়িয়ে আছে? সারাজীবন ধরে আমি যে প্রচার করে এসেছি জীবন সত্য, বাস্তব, মনে হচ্ছে তা ভুল;. জীবন মিথ্যা, মায়া। জীবনের সেই মূল্যবোধ আর নেই।

আমি কাজ করি, কেননা কাজ না করে উপায় নেই, ভোগ বাসনায় শান্তি নেই। দেশের জন্য কাজ করি বলা ভুল, দেশেব চাইতে আমার নিজের জন্যেই কাজ করি, এটাই সত্যি। ইত্যাদি—

শ্রীঅরবিন্দ সব শুনে বললেন, 'হুঁ! ভগবান সর্বশক্তিমান ও করুণাময় হলে এই দুঃখের জগৎ সৃষ্টি করতেন না? কিন্তু আমার একটা ধাঁধাঁ লাগে যে মানুষ অন্তিমকালে লাজপৎ রায়ের মত ভাবতে আরম্ভ করে কেন। প্রায় সবাই মনে করে এই বিশ্ব ও জীবন মায়ার খেলা। এটা কি পূর্বপুরুষের রক্তের গুণ না দেশের আবহাওয়া, না ব্যক্তিগত কিছু মানসিক পরিবর্তন? বোধহয় তার রক্তেই এই বীজটি রয়েছে।

খৃষ্টানদের মাঝেও এই ভাবটি দেখা যায় যখন তারা বলে সবই বৃথা—vanity of vanities! all is vanity and vexation of the spirit.

পুরাণী: লাজপৎ রায় ত জৈন; কাজেই এরকম সিদ্ধান্ত অস্বাভাবিক নয়।

শ্রীঅরবিন্দ: সেটাই বোধহয় হেতু, কিন্তু জৈনরা কি সৃষ্টিকে মায়া মনে করে?

পুরাণী : ঠিক তা নয়। তাদের মতে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত চিৎসত্তা বা আত্মাই হ'ল সত্যবস্তু। সে সত্তা অচিৎ বা পুদ্‌গল থেকে স্বতন্ত্র, এই সত্তাকে পুদ্‌গলের আবরণ বা কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত করলে তবে আত্মার চিরন্তন চিৎস্বরূপ লাভ হয়। আভ্যন্তর বা বাহ্য কৃচ্ছ্‌-সাধনের দ্বারা মিথ্যার হাত থেকে নিষ্কৃতি হলেই নির্বাণ বা মুক্তি।

শ্রীঅরবিন্দ : মিথ্যা? তার মানে মায়া? কিন্তু উপোসের দ্বারা কি করে আত্মার মুক্তি সম্ভব?

পুরাণী : আত্মিক শক্তিতে কর্মের আবরণ যত পাতলা বা সূক্ষ্ম হতে থাকে পুদ্‌গলও চিৎজ্যোতির প্রতিফলনে তত স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। এরই পরাকাষ্ঠাকে জৈনরা চারিত্র বলে।

শ্রীঅরবিন্দ : কিন্তু আত্মা বন্ধনের মাঝে আসে কি করে?

পুরাণী : জৈনরা অবশ্য কোন সৃষ্টিকর্তা মানে না, বিশ্বগত কোন অদ্বয় অনাদি চেতনায়ও বিশ্বাস করে না। কিন্তু প্রত্যেক আত্মা সাংখ্যের পুরুষের মত চিন্ময় ও শাশ্বত। অনাদি কাল থেকে চিদাত্মা অচিতের বা পুদ্‌গলের আবরণে আচ্ছন্ন। এই আবরণ মুক্ত হয়ে স্বরূপে ফিরে যাওয়াই নির্বাণ বা মোক্ষ।

শ্রীঅরবিন্দ : তাদের মতে আত্মা চিরমুক্ত কিনা?

পুরাণী : প্রত্যেক আত্মা স্বরূপে মুক্ত, কিন্তু সংসারে কর্মপাশে বদ্ধ।

শ্রীঅরবিন্দ : তা হলে দেখছি তারা সাংখ্যের পুরুষ প্রকৃতির দ্বৈতভাবের কাছাকাছি।

কিছুক্ষণ পরে শ্রীঅরবিন্দ বললেন, "দান্তে একটি পদ লিখেছেন, 'ভগবানের প্রেমই অনন্ত নরক সৃষ্টি করেছে।' লাজপৎ রায় এ সম্বন্ধে কি বলবেন? আর, দান্তেই বা কি বলতে চান? আমি নিজে

কিছু ত বুঝতে পারছি না। কেউ নরকে নিক্ষিপ্ত হল পরে স্বর্গে ওঠার জন্যে, সেটা বোঝা যায় কিন্তু ভগবানের প্রেম কি করে অনন্ত নরক স্বষ্টি করবে?

পুরাণী: দান্তের উল্লেখে Abercrombie-এর কথা মনে পড়ল। তাঁর মতে মহাকাব্যের গুণ হল প্রাণপ্রাচুর্য, অভিজ্ঞতা ও প্রকাশের গাঢ়তা, বৈচিত্র্য ও প্রসারতা (range)। দান্তের নাকি প্রসারতা নেই। শেলীর Prometheus-এ মিল্টনের প্রসারতা নেই।

শ্রীঅরবিন্দ: প্রসারতা? তার মানে কি? যদি বল দৃষ্টির (vision) বিশালতা, শেলীর তা নেই। রামায়ণ, মহাভারত, হোমার, সেক্সপিয়ারের তা আছে। ভার্জিল মিল্টনে ততখানি নয়। দান্তের মাঝে দেখা যায় আংশিকভাবে।

পুরাণী: গ্যয়টের মাঝে আছে বলছেন, কিন্তু তাঁর নায়ক ফাউষ্ট নাকি ব্যক্তিচরিত্র হিসাবে স্বরু হয়ে শেষ হল আইডিয়াতে।

শ্রীঅরবিন্দ: ঠিক তা নয়। প্রথম বইটিতে ফাউষ্ট সম্পূর্ণ একটি চরিত্রই। দ্বিতীয় বইতে তাকে পাওয়া যায় আইডিয়ারূপে; বস্তুতঃ এরা দুটো বই। তাঁর বৃদ্ধ বয়সে তিনি দ্বিতীয় বইটি লেখেন। মিল্টনের Paradise Lost আর Paradise Regained-এর মত দুটো স্বতন্ত্র বই। কীটসেও দেখবে Hyperion শেষে আইডিয়াতে পরিণতি নিয়েছে।

পুরাণী: Abercrombie বলছেন Paradise Lost-এ শয়তান হল অদৃষ্টের সাথে যুদ্ধরত মানব ইচ্ছাশক্তির প্রতীক।

শ্রীঅরবিন্দ: মানব ইচ্ছাশক্তি? আমি ত ভেবেছিলাম মানবাতীত (Superhuman) ইচ্ছাশক্তি!

৫।২।৩৯

গত দুদিন আমাদের কথাবার্তা তেমন দীর্ঘ হযনি। মা এখন বেশ শীঘ্র আসছেন এবং অনেকক্ষণ ধরে শ্রীঅরবিন্দের সাথে ধ্যান কবছেন, কাজেই কথা বলবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাচেছ্ না।

আজ পুরাণী কথা সুরু করল; বলল যে হার্বার্টের স্ত্রী নিবেদিতার পুবাতন চিঠিপত্র সংগ্রহ করছেন ছাপাবার জন্যে। একটা চিঠিতে নাকি নিবেদিতা বলছেন যে শ্রীঅববিন্দ কলকাতা ত্যাগকালে নিবেদিতাকে বন্দেমাতবমের ভার দিয়ে যান।

শ্রীঅববিন্দ: বন্দেমাতবম ত নয, কর্মযোগীন। তুমি তাকে সেটা বলো, এখন এসব খবব প্রকাশ কবায কোন ক্ষতি নেই। চন্দননগর যাবার পূর্বে তাঁব সাথে আমাব দেখা হয এবং তাঁকে আমি ভার নিতে বললে তিনি রাজী হন। তাঁব কাছ্ থেকেই আমাকে গ্রেপ্তার করবার অভিসন্ধিটা জানতে পাই। সবকার মহলে তাঁর অনেক বন্ধু ছিল। তখন আমি 'আমার বাজনৈতিক উইল' প্রবন্ধটা লিখি। তাতে গ্রেপ্তারের মতলবটা স্থগিত হয়।

পুরাণী: আর একটি চিঠিতে পাওয়া যায় যে বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে শিবের নিকট উৎসর্গ করতে চান কিন্তু দেখা গেল যে নিবেদিতা তার জন্যে তৈরী নন?

শ্রীঅরবিন্দ: কি রকম তৈরী নন? তৈরী নন অর্থ হল হয় ইচছা নেই, নয় সর্ত পালনের জন্যে প্রস্তুত হয়নি।

পুরাণী: হয়ত ইচছা নেই।

*

শ্রীঅরবিন্দ : কাল যে আমরা জৈনধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম, জৈনদের কঠোর তপস্যা কি প্রকৃতিকে জয় করবার উদ্দেশ্যে নয় ? না, সংসারটা মায়া বলে ?

পুরাণী: না, জয় করবার জন্যে।

শ্রীঅরবিন্দ: তাহলে তাদের ও আমাদের উদ্দেশ্য এক, কেবল পথ আলাদা।

পুরাণী: কিন্তু তাতে ত লাজপৎ রায়ের মায়ার সমাধান হচেছ না।

শ্রীঅরবিন্দ: না! সেটা হয়ত তার রক্তে রয়েছে অথবা পরিবেশের জন্যে। লণ্ডনে Maxmuller-এর বেদান্তের অনুবাদ পড়বার সময় আমি আত্মার কথা জানতে পাই। পড়েই আমার মনে হল আত্মাই একমাত্র সদবস্তু, তার উপলব্ধি চাই। তার আগে আমি ছিলাম এক ধরণের নাস্তিক বা সংশয়বাদী। এটার ব্যাখ্যা কি ? নিশ্চয়ই পরিবেশ তার জন্যে দায়ী নয়, তাহলে রক্তের প্রভাব না পূর্ব জীবনের প্রবাহ ? আরও অদ্ভুত ব্যাপার হল, যেই আমি এপোলো বন্দরে নামলাম আত্মার অভিজ্ঞতা সুরু হল, যদিও অবশ্য আমি জানতামই না যে ওটা আত্মার অভিজ্ঞতা। সর্বত্র দেখলাম একটা শান্তি ও বিশালতা।

কোন বিশেষ জায়গার সংস্পর্শও অভিজ্ঞতা দিতে পারে এবং অভিজ্ঞতাটি পরিবেশের ঠিক অনুকূল দেখা যায়। যেমন কাশ্মীরে শঙ্করাচার্য পাহাড়ে অথবা পুণায় পার্বতী পাহাড়ে অসীমের উপলব্ধি, এবং কার্ণালী মন্দিরে দেবতাদের বাস্তব অস্তিত্ব বোধ করলাম।

পুরাণী: (কিছুক্ষণ পরে) আমি হার্বার্টকে জিজ্ঞাসা করলাম জার্মাণীতে ইহুদীদের উপর এত অত্যাচার হবার কারণ কি। আপনি যা বলেছিলেন তিনিও তাই বললেন। ইহুদীরা হল স্বল্পসংখ্যক

ধনী জাত, সুতরাং তাদের **Scapegoat** করা হচ্ছে। ঠিক ফরাসী বিদ্রোহের সময় ফ্রান্সে এবং স্পেনে অভিজাত বংশের যে রকম করা হয়েছে।

শ্রীঅরবিন্দ: ফ্রান্স ও স্পেন সম্বন্ধে সে কথা মোটেই বলা চলে না। ফ্রান্সে কেবল অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ত নয়; সেটা হল সমস্ত অতীতের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, আর স্পেনে হল ধর্মযাজকদের অতীত অত্যাচারের বিরুদ্ধে।

পুরাণী: হার্বার্টের স্ত্রী বলছেন যে সুইজাবল্যাণ্ডের অবস্থা সঙ্কট-জনক। তিনি সুইস্। তাঁর ভয় যে যুদ্ধ বাধলে তাদের দেশের ভেতর দিয়ে হয়ত রাস্তা হবে। গত যুদ্ধেও তাদের সেই ভয় ছিল।

শ্রীঅরবিন্দ: তাই। ডিকটেটারেরা যদি যুদ্ধে নামে, সে সম্ভাবনা রয়েছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার সীমান্ত নাকি এমন সুরক্ষিত ছিল যে জার্মাণদের তা দখল করতে দস্তরমত বেগ পেতে হত।

পুরাণী: অথচ বিনা যুদ্ধে তারা হার মানল! হিটলার এখন সমানে উপনিবেশ দাবী করছে।

শ্রীঅরবিন্দ: কোথেকে?

পুরাণী: বেলজিয়ম হল্যাণ্ড বা পর্তুগালের।

শ্রীঅরবিন্দ: হল্যাণ্ডের উপনিবেশ কোথায়? পর্তুগালের উপনিবেশ এত ছোট যে হিটলার তাতে মোটেই তুষ্ট হবে না। বেলজিয়ম কংগো বড় বটে, কিন্তু ইংলণ্ড তার কথা তুলতে সাহসই করবে না। বেল-জিয়ম অগ্নিকাণ্ড বাধাবে এবং শেষে জার্মাণীর সাথে যোগ দেবে। তাতে ইংলণ্ড পড়বে বিপদে, কেননা জার্মাণী যদি **Antwerp** দখল করে নেয়, তাহলে ইংলণ্ডের বুকে পিস্তলের গুলী এসে লাগবে। ফ্রান্স

সম্বন্ধে একই কথা। দেখেছ, Roosevelt কি রকম সরে পড়ল? কংগ্রেসের বক্তৃতায় ডিমোক্রেসিদের পক্ষ নেবে ভেবেছিলাম, এখন বলছে ইউরোপের এ সমস্ত ব্যাপারে আমেরিকার কোন হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই।

বিষয়-সূচী

অ

বিষয়-সূচী

আ

ই

উ

বিষয়-সূচী

উ

এ

ও

ক

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

ব

বিষয়-সূচী

য

র

ল

বিষয়-সূচী

শ

ষ

স

বিষয়-সূচী